বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা ঃ বাঙালীর শিক্ষা চিন্তা

(১৮৩৫-১৯০৬)

সুখময় সেনগুপ্ত

পরিবেশক
নাথ ব্রাদার্স : ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট : কলকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
পৌষ ১৩৬৭
জানুয়ারী ১৯৬০

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং হাউস
২৬বি, পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা-২৯

প্রচ্ছদ
গৌতম রায়

মুদ্রক
হরিপদ পাত্র
সত্যনারায়ণ প্রেস
১, রমাপ্রসাদ রায় লেন
কলকাতা-৬

প্রসঙ্গ-কথা

উনবিংশ শতকের বাঙালী মনীষা প্রায় সর্ববিষয়েই চিন্তা করেছে। অধ্যাপক প্রবোধ চন্দ্র সেন বাঙালীর ইতিহাস চিন্তা সম্পর্কে লিখেছেন 'বাংলার ইতিহাস সাধনা'—নামক গ্রন্থ। বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা নিয়ে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার লিখেছেন **'Political thoughts from Rammohan to Dayanand'** গ্রন্থ এবং শ্রীযুক্ত সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন 'বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা।'

শিক্ষিত বাঙালীর অর্থনৈতিক চিন্তা নিয়ে বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ কোন গ্রন্থ এখনও রচিত হয়নি। অর্থশাস্ত্রী ভবতোষ দত্ত, রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথের অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন। শ্রীযুক্ত সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রামমোহনের অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে 'ভারতের শিল্প বিপ্লব ও রামমোহন'-নামক গ্রন্থ লিখেছেন। কিন্তু উক্ত শতকের বাঙালীর শিক্ষাচিন্তা নিয়ে পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ এখনও রচিত হয়েছে বলে জানা নেই।

এই সূত্রে অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা,' অধ্যাপক ভুজঙ্গ ভূষণ ভট্টাচার্যের 'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন' এবং অধ্যাপক সুনীল চন্দ্র সরকারের 'রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন ও সাধনা' গ্রন্থগুলি খুবই উল্লেখযোগ্য। এছাড়া যোগেশ চন্দ্র বাগলের 'বাংলার নবজাগরণ,' বাংলার জনশিক্ষা,' স্ত্রী-শিক্ষার কথা,' বাংলার উচ্চশিক্ষা,' এডুকেশন অব্ উইমেন ইন ইষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া' প্রভৃতি গ্রন্থও প্রশংসনীয় প্রচেষ্টার পরিচয়। কিন্তু তা সত্বেও ১৮৩৫ সনে মেকলের 'মিনিটস্' ঘোষিত হওয়ার পর থেকে ১৯০৫ সনের বঙ্গ-ভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন বা স্বদেশী আন্দোলন পর্যন্ত (এই আন্দোলনের ফলেই বাঙালীর চিত্তে স্বদেশী শিক্ষা প্রচলনের আকাঙ্খা জেগে ওঠে এবং তা পরিণতি লাভ করে 'ন্যাশনাল কাউন্সিল অব্ এডুকেশন' বা 'জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ' প্রতিষ্ঠায়) বঙ্গদেশে শিক্ষার ইতিহাস বিচিত্রভাবে অগ্রসর হয়েছে এবং এই প্রায় শতবর্ষ কালের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তন ও প্রসারের পটভূমিকায় মনীষী বাঙালী শিক্ষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে কিভাবে চিন্তা করেছেন তার কোন ক্রমবিন্যস্ত, তথ্যনির্ভর, সম্পূর্ণাঙ্গ, ইতিহাস বাংলা ভাষায় পাওয়া যায় না। বাংলা ভাষায় উপরোক্ত কালে বাঙালীর শিক্ষা-চিন্তার একটি ক্রমবিন্যস্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা এই গ্রন্থ রচনার প্রধান

উদ্দেশ্য। এছাড়া আরও একটি বিশেষ কারণ বর্তমান গ্রন্থ রচনায় আমাকে প্রবৃত্ত করেছে। উনবিংশ শতকের বঙ্গদেশে বাঙালী মনীষার বিস্ময়কর প্রাচুর্য। এই মনীষীরা প্রায় সকলেই শিক্ষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে চিন্তা করেছেন। শিক্ষা প্রসারেও অনেকেই সক্রিয়ভাবে লিপ্ত হয়েছেন। তবু আজও এই বঙ্গভূমিতে শতকরা প্রায় সত্তর জন নিরক্ষর। এই বিপর্যয়ের কারণ অনুসন্ধান করবার বিনীত প্রয়াস করেছি আমার গ্রন্থে। অনুসন্ধান করতে গিয়ে যা দেখেছি তা নিম্নরূপঃ

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে বঙ্গবাসী তথা ভারতবাসীর শিক্ষা সম্পর্কে চিন্তা করেছেন প্রথম আধুনিক ভারত-পুরুষ রামমোহন (১৭৭২-১৮৩৩), আর কিছু চিন্তা করেছেন রামমোহনেব সমসাময়িক বয়ঃকনিষ্ঠ দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব ও রামকমল সেন। অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদে জন্মগ্রহণ করে এঁরা সকলেই রূপান্তরিত কলকাতার মানুষ, এঁদের যুগের প্রথম সারির 'এলিট্'। এঁরা কোম্পানীর অধীনে চাকরী নিয়ে হোক্ (রামকমল ও দ্বারকানাথ) বা নতুন নতুন শিল্প-বাণিজ্যের উদ্যোগ করে হোক্ (দ্বারকানাথ) ইংরেজের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন। এঁরা সকলেই বুঝেছিলেন ইংরেজীর মারফৎ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাগ্রহণ প্রয়োজন; বুঝেছিলেন, সংস্কৃত ও ফার্সী নিয়ে আত্মতৃপ্ত থাকলে আর চলবে না।

এঁদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ রামমোহন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এঁদের চেয়ে বেশি তলিয়ে ভেবেছেন। রামমোহনই প্রথম বাঙালী যিনি বাঙালীর শিক্ষায় শুধু পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য নয়, পাশ্চাত্ত্যের বিজ্ঞান শাস্ত্র-গুলির অন্তর্ভুক্তির আবশ্যকীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন।

১৮৩৫ সালে মেকলে ও বেন্টিঙ্ক এদেশে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার ব্যবস্থা পাকা করলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে হিন্দু কলেজের আনুকূল্যে দেশের প্রথম সারির মানুষ জেনে গিয়েছে পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদের দেশে নবযুগের বাণী বয়ে এনেছে। বহু চিন্তাশীল, প্রতিভাবান বাঙালী তখন পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণগানে মুখর এবং ঐ শিক্ষার মাধ্যমে নবযুগের আবির্ভাব ত্বরান্বিত করবার প্রচেষ্টায় অনুপ্রাণিত। এই সব কথা ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে।

অতঃপর সমগ্র শতাব্দী ব্যেপে বহু বঙ্গমনীষী শিক্ষা সম্পর্কে চিন্তা

করেছেন, তাঁদের (একজন দুজন ছাড়া) কেউই মেকলে-বেন্টিঙ্কের শিক্ষা-নীতির সরাসরি বিরোধিতা করেননি। তাঁরা বিশ্বাস করেছিলেন যে ইংরেজের শিক্ষানীতি এদেশের উচ্চশ্রেণীকে উদার শিক্ষায় শিক্ষিত করবে এবং এই উপরতলার শিক্ষা ক্রমে পরিশ্রুত হয়ে নিচুতলা পর্যন্ত পৌঁছবে। এই বিশ্বাসেই তাঁরা শিক্ষাকে নিচের দিক থেকে উপরে নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবেননি। অর্থাৎ দেশের অগণিত জনসাধারণের জন্য কোন ফলপ্রসূ শিক্ষার কথা সক্রিয়ভাবে চিন্তা করেন নি।

এদিকে, ইংরেজের শাসন যন্ত্রও ইংরেজী শিক্ষাকে জনগণের মধ্যে সার্থকভাবে প্রসারিত করার ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় রইল।

বম্বে, আগ্রা প্রভৃতি স্থানে মাতৃভাষার মাধ্যমে জনগণের যথাযথ শিক্ষা সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হল, ফলও আশানুরূপ হল কিন্তু 'জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকসন' সেই পরীক্ষালব্ধ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগালেন না বা লাগাতে পারলেন না। দেশের সাধারণ মানুষের যে-শিক্ষা প্রয়োজন সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে শিক্ষাকর্তারা ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে দেশের মুষ্টিমেয় লোকের উচ্চাকাঙ্খার দাবী (ইংরেজ সরকারের অধীনে বিভিন্ন স্তরের চাকরী লাভ) মিটাতে ব্যস্ত রইলেন। ফলে দেশের জনসাধারণ স্বদেশী-বিদেশী দু'রকম শিক্ষা থেকেই বঞ্চিত থেকে নিরক্ষর রয়ে গেল।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে দেশব্যাপী ইংরেজী শিক্ষার জন্য আগ্রহ এবং এ-শিক্ষার প্রভাব লক্ষ্য করে তিনজন বঙ্গ-মনীষী উপলব্ধি করেছিলেন যে ভারতবাসীর জীবনের কেন্দ্রে যে উদার ধর্মবোধ, যে ধর্মীয় আদর্শ বিদ্যমান পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করে ভারতবাসী সেই আদর্শ থেকে অতি দ্রুত বিচ্যুত হচ্ছে এবং তাদের যুগ যুগ ধরে অনুসৃত সাংস্কৃতিক তথা সমাজিক উত্তরাধিকারের সঙ্গে যোগসূত্র হারিয়ে ফেলছে। এই তিনজন মনীষী হচ্ছেন স্বামী বিবেকানন্দ, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং রবীন্দ্রনাথ।

ইংরেজ-প্রবর্তিত শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিহার করে এঁরা তিনজনেই জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের কথা ভেবেছেন।

এঁদের মধ্যে বিবেকানন্দ তাঁর চিঠিপত্রে, বক্তৃতায়, প্রবন্ধে শিক্ষার যে খসড়া দিয়েছেন তা অনুধাবন করে দেখা যায় যে প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাদর্শকে নবীন ভারতে নবরূপে পুনঃ প্রবর্তনই তাঁর উদ্দেশ্য।

আবার, সতীশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ—দুজনের শিক্ষাচিন্তায় গোড়ার দিকে আশ্চর্য মিল লক্ষ্য করা যায়। সতীশচন্দ্র তাঁর 'ভাগবত চতুষ্পাঠী' এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ব্রহ্মবিদ্যালয়'-এর মাধ্যমে প্রাচীন ভারতীয় জীবনাদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সতীশচন্দ্রের শিক্ষা-প্রচেষ্টা নগরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। গ্রামময় ভারতবর্ষে নিরক্ষর ভারতবাসীদের সাক্ষর ক'রে তাদের মনুষত্বে উন্নীত করার কোন সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য বা কার্যক্রম সতীশচন্দ্রের ছিল না। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আশ্রমবিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও চিন্তার পথ বেয়ে দেশের জনসাধারণের জন্য 'স্বাধীন শিক্ষার' সন্ধানে এসে পৌঁছে ছিলেন এবং সেই শিক্ষার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছিলেন এবং এই শিক্ষার মাধ্যমে নিরক্ষর দেশবাসীকে সাক্ষর ক'রে, তাদের উৎপাদন-উদ্যমকে সংঘবদ্ধ করে, তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক হিতসাধন করে তাদের মনুষত্বে সম্মানিত করা যায়—একথা সপ্রমান করেছিলেন।

এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে বিপ্লবোত্তর রাশিয়া যে-ধরণের শিক্ষার প্রবর্তন ক'রে কোটি কোটি দেশবাসীকে মনুষত্বের গৌরব দিতে পেরেছিল, রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ার পূর্বেই সেই শিক্ষার সন্ধান সীমিত ক্ষেত্রে পেয়েছিলেন। 'রাশিয়ার চিঠি'-তে এ-সম্পর্কে তাঁর নিজের বক্তব্য আছে। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এই শিক্ষাসন্ধান সম্ভব হয়েছিল তার কারণ তিনি কোনভাবেই ইংরেজ সরকার প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা-প্রসূত ছিলেন না। এবং স্কুল-কলেজের নিয়ম-নীতির বেড়াজাল ঘেরা শিক্ষাপ্রণালীর প্রতি তাঁর জন্মগত ঘোর বিরাগ ছিল। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে স্বাধীনতার পরও দেশবাসী রবীন্দ্রনাথের এই শিক্ষাচিন্তার প্রয়োগে আগ্রহী হল না, বরং একেবারে উদাসীন রইল। ফলে সংস্কৃতির এক মহান ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হয়েও এই উপমহাদেশের অগণিত জনসাধারণ আজও নিরক্ষরতার অন্ধকারে রয়ে গেল।

সুখময় সেনগুপ্ত

মুখবন্ধ

এই গ্রন্থ রচনায় প্রখ্যাত অধ্যাপক ডক্টর দেবীপদ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক বিমলা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক ডক্টর তুলসীচরণ ঘোষাল মহাশয়দের কাছে প্রচুর উৎসাহ ও উপদেশ পেয়েছি। এঁদের কাছে আমার ঋণ অপরিসীম।

জাতীয় গ্রন্থাগার এবং পশ্চিমবঙ্গের কতগুলি সুপ্রাচীন গ্রন্থাগার থেকে নানা তথ্যসংগ্রহের ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করেছেন শ্রীমতী অপর্ণা সেনগুপ্ত, অধ্যাপক ডক্টর মণিময় সেন ও শ্রী চিন্ময় সেনগুপ্ত। গ্রন্থটি প্রকাশের সময় এদের নিষ্ঠার কথা মনে পড়ছে।

সুখময় সেনগুপ্ত

সূচীপত্র

বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা : বাঙালীর শিক্ষাচিন্তা

ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসার

(১৮৩৫ পর্যন্ত)

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে ব্যবসা সংক্রান্ত কথাবার্তা চালানোর জন্য প্রথমে অল্প সংখ্যক বাঙ্গালী ইংরেজী শেখার প্রয়োজন বোধ করেন। কোম্পানী শাসন প্রবর্তনের ফলে এ প্রয়োজন বোধ আরও বেড়ে যায়। খ্রীষ্টান মিশনারীরাও ধর্মপ্রচারের স্বার্থে এদেশে এসে নিজেরা বাংলা শেখেন এবং বাঙালীদের ইংরেজী শেখানোর চেষ্টা করেন। প্রধানতঃ এঁদের উদ্যমেই সর্বপ্রথম এদেশে ইংরেজী ও পাশ্চাত্যবিদ্যা শেখানোর ব্যবস্থা হয়।

তবে এ সময়েও কয়েকজন সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী নিজ অধ্যবসায়ের ফলে এবং ইংরেজ ও ইংরেজী জানা ব্যক্তিদের সাহচর্যে ও সহায়তায় ইংরেজী শিখেছিলেন। রমেশ চন্দ্র দত্তের পিতামহ নীলমণি দত্ত, দ্বারকানাথ ঠাকুর, কেশব চন্দ্র সেনের পিতামহ দেওয়ান রামকমল সেন কোনও স্কুলে না পড়েই ভালোরকম ইংরেজী শিখেছিলেন।

১৭৭৩ সনে কলকাতায় সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে ইংরেজী শিক্ষার অর্থকরী শক্তি বেড়ে যায়। এ কারণে ইংরেজী শেখার কোনও ভাল প্রতিষ্ঠান না থাকলেও আঠারো শতকের শেষে এবং উনিশের শতকের প্রথম দিকে অনেক বাঙালী মোটামুটি ভাবে ইংরেজী শেখার চেষ্টা করেন ও যথেষ্ট কৃতকার্য হন।

ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁদের অনুসৃত নীতি অনুসারে এদেশবাসীর ধর্ম সমাজ শিক্ষার ব্যাপারে কোন রকম হস্তক্ষেপ করেননি। তাই প্রথমদিকে এ দেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের কোনও চেষ্টা তাঁরা করেননি। প্রাচ্য-বিদ্যা চর্চা ও প্রসারের মধ্যেই তাঁদের শিক্ষা প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ ছিল। ১৭৮১ সনে ওয়ারেন হেস্টিংস কলকাতায় মাদ্রাসা স্থাপন করেন এবং বোধ হয় সাম্প্রদায়িক ভারসাম্য রক্ষার জন্য ১৭৯২ সনে জোনাথন্ ডানকান কাশীতে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

কোম্পানী নিষ্ক্রিয় থাকলেও দেশীয় প্রচেষ্টা এবং মিশনারীদের উদ্যোগে ইংরেজী স্কুল দু'একটা করে বঙ্গদেশে স্থাপিত হতে লাগল। ১৮০০ সনে বা তার কাছাকাছি সময়ে কলকাতার ভবানীপুরে জগমোহন বসু একটি ১

এবং মধ্য কলকাতায় ড্রামন্ড সাহেব একটি ইংরেজী স্কুল স্থাপন করেন। ১৮১৩ সনের সনদে পার্লামেণ্ট ভারতীয় সাহিত্যের উন্নতি, ভারতীয় পণ্ডিত লেখকদের উৎসাহদান এবং ভারতের ইংরেজ অধিকৃত অঞ্চলের অধিবাসী-দের মধ্যে বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রবর্তন ও উন্নয়নের জন্য প্রতিবছর এক লক্ষ টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করলেন। ১৮২৩ পর্যন্ত এ প্রস্তাব কাজে পরিণত করা হল না। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষা-বিস্তারে মিশনারী ও দেশীয় প্রচেষ্টা চলতে লাগল। কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড—এই মিশনারীত্রয়, লণ্ডন মিশনারী সোসাইটির পাদ্রী ররার্ট মে এবং চার্চ মিশনারী সোসাইটির পাদ্রীরা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই অনেকগুলি প্রাথমিক স্কুল স্থাপন করেছিলেন। এই সব মিশ-নারী স্কুলের কয়েকটিতে ইংরেজী শেখানো হত।

এই সময়ে কলকাতার সম্ভ্রান্ত ও ধনী বাঙালী হিন্দুদের মধ্যেও ইংরেজী শেখার বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়। এই আগ্রহের ফলেই ১৮১৭ সনে কলকাতায় 'হিন্দু কলেজ' এবং 'কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের ইতিহাসে এ-দুটি প্রতিষ্ঠানের প্রবর্তন বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। ১৮১৮ সনের ১১ই জুলাই স্কুল বুক্ সোসাইটির প্রথম বার্ষিক অধিবেশন হয়। সোসাইটি প্রধানতঃ স্কুলপাঠ্য বাংলা বই প্রকাশ করতেন এবং সেই সঙ্গে কিছু সংস্কৃত, আরবী ও ইংরেজী বইও প্রকাশ করতেন। সোসাইটির বই বিক্রির হিসেব দেখলে বোঝা যায় ইংরেজী শেখার আগ্রহ বাংলাদেশে কিভাবে বেড়ে চলেছিল। দেখা যায় ১৮৩০ সনে সোসাইটি ৯,৬:৬ খানা ইংরেজী বই এবং ১০,০৭৪ খানা বাংলা বই বিক্রি করেছেন।[৩]

১৮৩৫ সনেও দেখা যায় প্রতি দু'খানা ইংরেজী বইয়ের স্থলে একখানা বাংলা বই বিক্রি হয়েছে।[৪]

১৮১৮ সনের ১লা সেপ্টেম্বর 'কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি'র উদ্যোগে 'কলিকাতা স্কুল সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হল। স্কুল সোসাইটির কাজ হল জনশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্কার সাধন করে ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার (ইংরেজী শিক্ষার) জন্য প্রস্তুত করে দেওয়া। স্কুল সোসাইটির "আদর্শ বিদ্যালয়গুলিতে" ইংরেজী শিখে ছেলেরা হিন্দু কলেজে ভর্তি হত। পটল-ডাঙ্গায় সোসাইটির একটি ইংরেজী স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। এই ইংরেজী স্কুলে পড়বার সুযোগকে, ছাত্ররা পরম সৌভাগ্য বলে মনে করত। ১৮৩৩এ

আর্থিক বিপর্যয়ের ফলে যখন সোসাইটির স্কুলগুলি বন্ধ হয়ে গেল, তখন পটলডাঙ্গার ইংরেজী স্কুলটিই টিঁকে রইল। এটি পরবর্তীকালের বিখ্যাত 'হেয়ার স্কুল'।

বাংলাদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রসারে তথা বাংলার নবজাগরণে হিন্দু কলেজ যে সহায়তা করেছিল, আর কোনও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান দ্বারা তার শতাংশও সাধিত হয়নি। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হল,—the tution of the sons of respectable Hindus in English and Indian languages and in the literature and science of Europe and Asia.[4] অর্থাৎ সম্ভ্রান্ত হিন্দু সন্তানদের ভারতীয় ও ইংরেজী ভাষা শিক্ষা এবং এশিয়া ও ইউরোপের সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বাংলাদেশে ইংরেজী স্কুলের সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকে।

১৮২২ সনে রামমোহন নিজে একটি ইংরেজী স্কুল স্থাপন করেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রামমোহনের এই 'অ্যাংলো হিন্দু স্কুলের' ছাত্র। স্কচ মিশনারীরা ডাফ্‌ সাহেবের নামে একটি স্কুল করেন। ডাফ্‌ নিজেও রামমোহনের সহায়তায় ১৮৩০ সনে একটি ইংরেজী স্কুল স্থাপন করেন। এই স্কুলটি পরে 'জেনারেল এসেমব্লীজ ইনস্টিটিউশন' নামে খ্যাত হয়। ১৮২৯ সনের ১লা মার্চ কলকাতায় গৌর মোহন আঢ্য 'ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও শিক্ষাবিদ্ হোরেস্ হেম্যান্ উইলসন্ ১৮৩৬ সনে স্বদেশ-যাত্রার প্রাক্কালে লিখেছেন যে তখন বঙ্গদেশে প্রায় দুহাজার যুবক ইংরেজী শিক্ষালাভ করত। কলকাতার বাইরেও অনেক নূতন স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। কলকাতার কাছে আন্দুল, চানক, পানিহাটি, সুখচর, বরাহনগর, বারাসাত, শ্রীরামপুর, চন্দননগর, এবং দূর মফঃস্বলে টাকী, বর্ধমান, শান্তিপুর, মুর্শিদাবাদ, কৃষ্ণনগর ও ঢাকা প্রভৃতি স্থানেও স্কুল প্রতিষ্ঠার কথা জানা যায়।[5]

ইতিমধ্যে ১৮২৩ সনে জেনারেল কমিটি অব্ পাবলিক্ ইনস্ট্রাকশান গঠিত হল এবং কোম্পানী শিক্ষা খাতের টাকা ও শিক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্ব এই জেনারেল কমিটির হাতে তুলে দিলেন। জেনারেল কমিটি প্রাচ্যবিদ্যা প্রসারে মনোযোগী হলেন। নদীয়া ও কলকাতায় (১৮২৪) সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হল।

কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে রামমোহন ১১ই ডিসেম্বর, ১৮২৩ সনে বড়লাট লর্ড আমহার্স্ট'কে যে বিখ্যাত পত্রটি লিখেছিলেন তার সারমর্ম হল :

সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার দ্বারা দেশের ছাত্ররা নতুন কিছুই শিখবে না। সুপ্রাচীনকাল থেকে যে ব্যাকরণ, ন্যায়, দর্শন, মীমাংসা এবং বেদবেদান্তের পঠন-পাঠন ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে, তাই নিয়েই প্রস্তাবিত সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা বারো বছর অতিবাহিত করবে। অল্পকথায়, লর্ড বেকনের পূর্বে পাশ্চাত্যে যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তারই পুনরাবৃত্তি হবে। লর্ড-বেকনের পরেই নূতন প্রণালীতে সাহিত্য ও জ্ঞান বিজ্ঞানের যে শিক্ষা পাশ্চাত্যে যুগান্তর এনেছে তার সঙ্গে তুলনা করলে বেকন-পূর্ব যুগের শিক্ষা এবং বর্তমানে সরকার প্রস্তাবিত সংস্কৃত শিক্ষা সহজেই অসার বলে প্রতিপন্ন হবে। ইংরেজ জাতিকে অজ্ঞানের অন্ধকারে নিমজ্জিত রাখা অভিপ্রেত হলে সে দেশে মধ্যযুগীয় স্কুলম্যানদের শিক্ষাব্যবস্থার সম্পূর্ণ অবসান ঘটিয়ে বেকনের দর্শন চর্চার প্রবর্তন করা হত না। তেমনি ইংরেজ সরকার যদি ভারতবাসীকে অজ্ঞানের অন্ধকারে রাখতে চান, তবে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করলে সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সাধিত হবে। 'The Sanskrit system of education would be best calculated to keep this country in darkness.' পত্রের উপসংহারে তিনি লিখলেন—But as the improvement of the native population is the object of the Government, it will consequently promote a more liberal and enlightened system of instruction embracing Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry and Anatomy with other useful sciences.[6]—অর্থাৎ সরকারের যখন লক্ষ্য এদেশবাসীর উন্নতি সাধন, তখন গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, শারীর-সংস্থান বিদ্যা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে এক উদার উন্নত শিক্ষার ব্যবস্থা সরকারকে করতে হবে। পত্রে তিনি একথাও দেখালেন যে এজন্য কলেজ প্রতিষ্ঠা করে কয়েকজন ইউরোপে শিক্ষাপ্রাপ্ত ধীমান্ ব্যক্তিকে অধ্যাপক নিযুক্ত করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় গ্রন্থাগার ও যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করতে হবে।

রামমোহনের প্রস্তাবে সরকার কর্ণপাত না করলেও রামমোহন যে শিক্ষাদর্শের কথা আমহার্স্ট'কে জানিয়েছেন, শিক্ষার সেই আদর্শ বাংলাদেশে

সর্বসাধারণের মধ্যে ধীরে ধীরে কিভাবে বিস্তার লাভ করেছিল, 'সুধাকর' নামে একটি বাংলা পত্রিকায় বাংলা ১২৪০ সালের ২০ শে ভাদ্র (১৮৩৩ সনের ৭ই সেপ্টেম্বর) সংখ্যায় প্রকাশিত একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধে তার পরিচয় পাওয়া যাবে। প্রবন্ধকার লিখছেন:

'ভারতবর্ষের মধ্যে বিস্তীর্ণরূপে বিদ্যাপ্রচারের নিমিত্তে সমাচার পত্র সম্পাদকেরা যতই লিখেন বোধ হয় গভর্ণমেণ্ট তাহাতে শ্রুতিপাতই করেন না।...যে বিদ্যার খরচ করা উচিত বুঝেন তদর্থেই খরচ করিতেছেন। কিন্তু এইমাত্র কহিতে পারি ঐ খরচের দ্বারা ভারতবর্ষের সর্বসাধারণের কি উপকার দর্শিতেছে আমরা এ পর্যন্ত তাহার কিছু জানিতে পারি নাই।....সংস্কৃত বিদ্যালয়তে গভর্ণমেণ্টের খরচ সত্য বটে কিন্তু তদ্দারা সর্বসাধারণের বিশেষ উপকার নাই, কেননা সেখানে কেবল ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির বিদ্যাভ্যাস হয় না। যখন গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপিত না করিয়াছিলেন তখনও স্থানে স্থানে চতুষ্পাঠী ছিল এবং তাহাতেই ব্রাহ্মণ সন্তানের বিদ্যাভ্যাস নির্বাহ হইত। আর এখনও দেশে সংস্কৃত বিদ্যাভ্যাসের চতুষ্পাঠী আছে। অতএব গভর্ণমেণ্টের আনুকূল্য ব্যতিরেকেও সংস্কৃত বিদ্যাভ্যাসের বড় ক্ষতি হয় না এবং সে বিদ্যাদ্বারা কেবল ব্যবস্থাদি দান ভিন্ন শাসনাদি কর্মেরও কোন উপকার নাই। অতএব যে বিদ্যাশিক্ষাতে লোকের অন্ধকার দূর হইয়া রাজ্যশাসনাদিতে নৈপুণ্য জন্মে তাবদ্দেশ ব্যাপিয়া সেই বিদ্যার বীজ রোপন করাই ধার্মিক দয়ালু রাজার উচিত কর্ম...কিন্তু গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন না করিলেও তাহা দূর হইবেক না।

* * *

গভর্ণমেণ্ট যদ্যপি অনুগ্রহ পূর্বক তাঁহার অধিকারের প্রতি গ্রামের প্রজাদের উপর যোত্রানুসারে চাঁদার আজ্ঞা করেন তবে তাঁহার আজ্ঞাবোধ কোন প্রকার হইবেক না। সুতরাং যাঁহার যেমত সাধ্য তদনুসারে ঐ চাঁদা অবশ্যই দিবেন.... অবশিষ্ট খরচ এডুকেশন কমিটি হইতে দিলেই স্বচ্ছন্দে সর্বত্র বিদ্যালয় চলিতে পারিবেক...[7],

ইংরেজী তথা পাশ্চাত্ত্য বিদ্যা শেখার জন্য দেশবাসীর এই আগ্রহ সত্ত্বেও জেনারেল কমিটি এই আগ্রহকে স্বীকৃতি দিচ্ছিলেন নেহাৎ কৃপণের মত, একটু একটু করে। তাঁরা ১৮২৪ সনে কলকাতা মাদ্রাসায় ইংরেজী ক্লাস খুলেছিলেন, তারপর ১৮২৭ সনে কলকাতা সংস্কৃত কলেজে ইংরেজী ক্লাস জুড়ে দিলেন।

জনসাধারণের প্রবল আগ্রহ সত্ত্বেও ক্রমাগত প্রাচ্যবিদ্যা প্রসারে সহায়তা করায় একদিন কমিটিতে ভাঙ্গন ধরল। ১৮৩১ সনে দেখা গেল দশজন সদস্যের মধ্যে পাঁচজন প্রাচ্যশিক্ষার পক্ষে, অপর পাঁচজন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার পক্ষে। কমিটির সাধারণ কাজকর্ম পরিচালনা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। প্রাচ্যবাদীরা প্রাচ্যশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলির শ্রীবৃদ্ধিসাধন, প্রাচ্যভাষার গ্রন্থগুলির প্রকাশ এবং পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের বইগুলি প্রাচ্যভাষায় অনূদিত করে প্রকাশ করার জন্য সব সময় চেষ্টিত ছিলেন। তাছাড়া ফারসী ও সংস্কৃতকে শিক্ষার মাধ্যম করার পক্ষে তাঁরা মত পোষণ করছিলেন। পাশ্চাত্ত্যবাদীদের মত হল যে ভারতবাসীর জন্য পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের অবশ্য প্রয়োজন এবং সে জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ করতে হবে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে।

ভাঙ্গন চরমে পৌঁছল ১৮১৩-এর সনন্দ আইনের ৪৩ নং ধারার ব্যাখ্যা নিয়ে। প্রাচ্যবাদীরা বললেন, যে ঐ ধারায় উল্লিখিত লিটারেচার কথার অর্থ হচ্ছে, আরবী ও সংস্কৃত সাহিত্য এবং লার্নেড্ নেটিভ-এর অর্থ হচ্ছে, উপরোক্ত দুটি ভাষার যে কোন একটিতে পারদর্শী ভারতীয় পণ্ডিত। পাশ্চাত্ত্য বাদীরা বললেন, যে লিটারেচার বলতে ইংরেজী সাহিত্য বোঝাচ্ছে এবং ইংরেজী ভাষায় পণ্ডিত ভারতীয়কেই লার্নেড নেটিভ বলা হয়েছে।

দু-পক্ষের কেউই প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য ভাষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমন্বয়ের কথা ভাবলেন না, ভাবলে শিক্ষা-ব্যবস্থায় উভয়েরই যথাযথ স্থান নির্দেশ সম্ভব হত।

উভয় পক্ষের মত বিরোধ ১৮৩৪ সনের শেষ পর্যন্ত সমানে চলতে লাগল। প্রকৃত পক্ষে ১৮৩১-৩৪ এই তিন বছর শিক্ষা সংক্রান্ত কোন কাজই কমিটি করতে পারেন নি।

মেকলে ভারতবর্ষে এলেন ১৮৩৪ সনের ১০ই জুন এবং সঙ্গে সঙ্গে জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের সভাপতি নিযুক্ত হলেন। উভয়পক্ষের যুক্তি মেকলের কাছে পেশ করা হল ১৮৩৫ সনের ২রা ফেব্রুয়ারী। তিনি এক সুদীর্ঘ মন্তব্যলিপি সভায় পেশ করলেন। তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় তিনি খুব জোরের সঙ্গে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা প্রবর্ত্তনের সুপারিশ করলেন। এই সমর্থন পেয়ে ১৮৩৫ সনের ৭ই মার্চ বড়লাট লর্ড বেন্টিঙ্ক সরকারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। এ সিদ্ধান্তের মর্ম হচ্ছে যে অতঃপর এদেশে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার

প্রসারই সরকারী শিক্ষানীতি বলে গৃহীত হবে এবং শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট টাকা এই উদ্দেশ্যেই ব্যয়িত হবে। এতদিনে সরকারী উদ্যোগে ইংরেজী শিক্ষা এদেশে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হল।

মেকলের সুদীর্ঘ মন্তব্য একটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ দলিল। এই মন্তব্যলিপিতে ইংরেজী তথা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা যে ভাবে ও যে ভাষায় সমর্থিত হয়েছে, তা অভূতপূর্ব। তবু একথা ভাবা ঠিক নয় যে মেকলেই এদেশে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রচলন করেন। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার ক্ষেত্র রচনা করে রেখেছিলেন রামমোহন রায়, ডেভিড হেয়ার ও তাঁদের সহকর্মিগণ, আর করেছিলেন গ্রাণ্ট সাহেব এবং পাশ্চাত্ত্যের মিশনারীগণ। তাছাড়া জন-সাধারণের একটি বিশিষ্ট অংশ বহুকাল থেকেই পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার দাবী জানিয়ে আসছিল। ভূমি প্রস্তুত ছিল, বীজ বপন করাও হয়েছিল, মেকলে উত্তম সার প্রয়োগ করে ফলন ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করেছিলেন।

তবে মেকলের এই চিন্তাধারায় মারাত্মক ত্রুটিও ছিল। ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রবর্তনের ব্যবস্থা করে তিনি ভারতবাসীকে তার অতীত ঐতিহ্য থেকে ছিন্ন করতে জ্ঞাতসারেই চেষ্টা করেছিলেন। এ বোধ তাঁর ছিল না যে ভারতবাসীর জীবনে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের আমদানি করে হাজার হাজার বছরের সনাতন প্রাচ্য সংস্কৃতির প্রভাব মুছে ফেলা যাবে না।

মেকলে প্রবর্তিত শিক্ষানীতি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার সর্বোত্তম উপাদানগুলির সমন্বয় সাধন করতে পারত। প্রাচ্যের শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে যে অভাব ছিল, মেকলের শিক্ষা নীতির মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্যশিক্ষা সে-অভাব এ দেশে পূরণ করতে পারত। ফলে এ দেশবাসীর মধ্যে একটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি, একটা বিজ্ঞান-চেতনার আমদানি হত। কিন্তু মেকলে শুধু পাশ্চাত্ত্যের শিক্ষা-সংস্কৃতির বৈভবই দেখালেন, এবং প্রাচ্য শিক্ষা সংস্কৃতিকে ধূলিসাৎ করতে গিয়ে উত্তরকালে এ দেশবাসীর মধ্যে পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষার প্রতি একটা উগ্র বিতৃষ্ণার বীজ বপন করে গেলেন।

মেকলে ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থায় যে নীতি প্রবর্তন করে গেলেন তাকে বলা হয় ডাউন ওয়ার্ড ফিলট্রেসন্' বা নিম্ন পরিস্রাবণ। মেকলে তাঁর মিনিট-এ বলেছিলেন ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান ও সাহিত্য শিক্ষার ব্যবস্থা করলে ভারতবর্ষে একটা শ্রেণীর উদ্ভব হবে যারা 'Indian in blood

and colour but English in taste, in opinions, in morals and in intellect এবং education was to filter down from them to the masses.' (অর্থাৎ জন্মসূত্রে এবং চেহারায় ভারতীয় থাকবে, কিন্তু যাদের রুচি, মতবাদ, নীতিজ্ঞান, বুদ্ধি-শুদ্ধি সবই হবে ইংরেজের মত এবং যাদের শিক্ষা চুঁইয়ে জনসাধারণের উপর পড়বে।)

মেকলের এই নিম্ন পরিস্রাবন নীতির বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোর্ট অব ডাইরেকটারস্ ১৮৩০ সনের ২৯শে সেপ্টেম্বর মাদ্রাজ সরকারকে যেপত্র দিয়েছিলেন, সেই পত্রের ব্যাখ্যাটি—

'The improvements in education, however, which most effectually contribute to elevate the moral and intellectual condition of a people are those which concern the education of the higher classes of the persons possesing leisure and natural influence over the minds of their country men.

By raising the standard of education among those classes you would eventually produce much greater and more beneficial change in the ideas and feelings of the community than you can hope to produce by acting directly on the more numerous class.[8]

অর্থাৎ সমাজের উচ্চশ্রেণীর যে সব মানুষের অবসর আছে এবং জনগণের উপর প্রভাব আছে, তাদের শিক্ষার উন্নতি হলেই জনগণের নৈতিক ও বৌদ্ধিক উন্নতি হবে। এদের শিক্ষার মান বাড়িয়ে জনগণের চিন্তা ও মনোভাব যত বেশী এবং শুভ পরিবর্তন আনা যেতে পারে, জনগণের শিক্ষার সরাসরি ব্যবস্থা করে ততটা সম্ভব নয়।

বেন্টিঙ্কের শিক্ষানীতি ঘোষণার পর থেকেই কলকাতা এবং মফঃস্বলে ইংরেজী শেখানোর জন্য প্রচুর স্কুল স্থাপিত হল। ১৮৩৫-৪০এর মধ্যে বঙ্গদেশের বিভিন্ন পত্রিকায় এ-ধরনের স্কুল প্রতিষ্ঠার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। এমন কি ফরাসী উপনিবেশ চন্দননগরের অধিবাসীরাও পণ্ডিচেরীর কর্তৃপক্ষ শিক্ষার জন্য যা বরাদ্দ করেছিলেন সেই বরাদ্দ টাকার সঙ্গে নিজেদের সংগৃহীত অর্থ যোগ দিয়ে ইংরেজী শিক্ষার জন্য ব্যাকুলতা জানাল। মেকলে নিজেও স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার কাজে লেগে গেলেন। মেডিকেল কলেজ ছাড়া

আরও ছয়টি নতুন স্কুল সরকার স্থাপন করলেন। হাজী মহম্মদ মহসীনের বদান্যতায় হুগলী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হল ১৮৩৬ সনে। কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রথম বছরেই সেখানে ১৫০০ ছাত্র ভর্তির জন্য আবেদন করেছিল। এবং ১৮৩৭ সনে যখন প্রাথমিক ব্যাকুলতার অবসান হয়েছে, তখনও ইংরেজী বিভাগের ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৫০।[৫]

এদেশের শিক্ষানীতি সম্পর্কে বেন্টিঙ্কের ঘোষণা ছাড়াও পরপর কতগুলি আইন পাশ হল যার ফলে বঙ্গদেশে ইংরেজী শেখার সুযোগ ও ব্যগ্রতা বহুগুণ বেড়ে গেল। ১৮৩৫ সনে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কিত আইন পাশ হওয়ার ফলে ইংরেজী বই সস্তা এবং সহজলভ্য হল। তাছাড়া ১৮৩৬-৪৭ এর মধ্যে পর পর আরও কতগুলি আইন পাশ হল। এই সব আইনের ফলে ভারতীয় বিচার বিভাগে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালীর কর্ম সংস্থানের পথ প্রশস্ত হল। ১৮৩৭ সনের ২৯ আইন অনুসারে ফারসীর পরিবর্তে আদালতের ভাষা হিসাবে ইংরেজী ও তৎসহ মাতৃভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়া হল। বাংলার হিন্দুরা ফারসী ছেড়ে সাগ্রহে ইংরেজী শিখতে আরম্ভ করলেন।

ইংরেজ শিক্ষাবিদ্ আর্থার মে হিউ তাঁর সুবিখ্যাত 'দ্য এডুকেসন অব্ ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে মেকলে প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনা করেছেন। এই শিক্ষানীতি সম্পর্কে মে হিউ সাহেবের দুটি মূল্যবান মন্তব্য উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি বলছেন 'From the West we wanted science, rather than literature or philosophy, not only nor mainly for its results, but in order that its methods might be applied to the speculative and emotional side of our curriculum'[৬a] অর্থাৎ পাশ্চাত্যের কাছে আমাদের গ্রহণীয় ছিল বিজ্ঞান-শিক্ষা, সাহিত্য বা দর্শনের শিক্ষা নয়। আর, এ বিজ্ঞানশিক্ষা শুধু বিজ্ঞান চর্চার বাস্তব ফললাভের জন্য নয়। বিজ্ঞান শিক্ষার পদ্ধতি যাতে দর্শন সাহিত্য বিষয়ক শিক্ষায় প্রযুক্ত হতে পারে তার জন্য।

আর এক জায়গায় তিনি বলছেন, 'That the identification of a necessarily neutral Government with a system of education has robbed the system of religious warmth, colour and

significance and that the want of this has made the education unreal and unconvincing among peoples whose life......is fundamentally religious has already been emphasised.[৩৮]

অর্থাৎ—ধর্মনিরপেক্ষ সরকার যে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করলেন তাতে ধর্মের কোন আন্তরিক স্পর্শ, বৈশিষ্ট্য বা গুরুত্ব রইল না এবং এরই অভাবে এই শিক্ষা এদেশের মানুষের কাছে—যাদের জীবনের ভিত্তি হল ধর্ম, সত্য ও বাস্তব হয়ে উঠতে পারেনি।

প্রাথমিক শিক্ষা

(১৮৩৫ পর্যন্ত)

উনবিংশ শতকের প্রথম দিকেও এদেশে পাঠশালার শিক্ষাই ছিল শিক্ষার ভিত্তি। তখন বাংলাদেশে পাঠশালার অভাবও ছিল না। ১৮০৩ সনে ওয়ার্ড লিখছেন 'বাংলার প্রায় সব গ্রামেই লেখা, পড়া এবং অঙ্ক শেখানোর জন্ম বিদ্যালয় (পাঠশালা) ছিল।[10] খড়-ছাওয়া মাটির ঘরে অথবা ছায়াযুক্ত গাছের তলায় এই সব পাঠশালা বসতো এবং দরিদ্র জনগণের শিক্ষার বাস্তব প্রয়োজন এই পাঠশালার শিক্ষা বহুকাল ধরে মিটিয়ে আসছিল। এই পাঠশালার শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে বাড়িতে কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত এবং মধ্যযুগীয় নানা কাব্য পাঠের প্রচলন ছিল। তাছাড়া যাত্রা, কথকতা, কবিগান, রামায়ণ গান, পদাবলী কীর্তন প্রভৃতি গ্রামে গ্রামে অনুষ্ঠিত হত। এইভাবে বাঙালীর সংস্কৃতির ধারা মুসলমান আমলে এবং ইংরেজী আমলের গোড়ার দিকেও অব্যাহত গতিতে প্রবাহিত ছিল। পাঠশালা শিক্ষার সঙ্গে লোকশিক্ষা যুক্ত হয়ে জনগণকে একটা সাধারণ শিক্ষা দিতে সমর্থ হয়েছিল।

ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি ১৮১৩ সনের সনন্দে ভারতবাসীদের প্রাচ্যবিদ্যা এবং বিজ্ঞান শিক্ষার জন্ম এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেন, কিন্তু ঐ সনন্দে জনশিক্ষা সম্পর্কে কিছু বলা হয় নি। সে সময় ভারতের বড়লাট ছিলেন লর্ড ময়রা। তিনি জনশিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন।

তিনি ১৮১৫ সনের ২রা অক্টোবর একটি মন্তব্য লিপিতে লেখেন—দেশীয় পাঠশালার শিক্ষকগণ ছেলেদের লেখা, পড়া ও অঙ্কক্যা শেখান। এঁরা যে সামান্ত বেতন নেন, গ্রামের কারো পক্ষেই তা দেওয়া কঠিন নয়, এবং এঁরা ছাত্রদের যেটুকু বিদ্যা শেখান তা গ্রামের জমিদার সেরেস্তার কাজ, হিসাব-রক্ষকের কাজ এবং দোকানদারির কাজের পক্ষে যথেষ্ট।[11]

লর্ড ময়রা দেশীয় পাঠশালাগুলির উপযোগিতা উপলব্ধি করেছিলেন এবং এগুলির উন্নতি ও প্রসারের জন্ম সরকারের অর্থব্যয় করা উচিৎ একথাও বলেছিলেন। কিন্তু সরকার লর্ড ময়রার কথায় কর্ণপাত করেন নি। এই

সময়ে কলকাতা এবং অন্যান্য অঞ্চলে শিক্ষা প্রসারের জন্য খ্রীষ্টান পাদ্রীগণ উদ্যোগী হলেন। তাঁরা কোথাও ব্যক্তিগত, কোথাওবা সমষ্টিগতভাবে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করে শিক্ষাদানের কাজ শুরু করেছিলেন।

পাদ্রী উইলিয়াম কেরী ছিলেন এ বিষয়ে অগ্রণী। তিনি মালদা জেলার মদনাবাটিতে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। তারপর ১৮০০ সনে তিনি শ্রীরামপুরে চলে আসেন। এখানে জোশুয়া মার্শম্যান ও উইলিয়াম ওয়ার্ড নামে আরও দুজন পাদ্রী তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। এঁরা বহু পাঠশালা স্থাপন করেছিলেন। ১৮১৭ সনের মধ্যেই শ্রীরামপুরের চারদিকে কমপক্ষে পঁয়তাল্লিশটি পাঠশালা স্থাপিত হয়েছিল। সবশুদ্ধ দু'হাজার ছাত্র এই সব পাঠশালায় পড়তো।[12]

শ্রীরামপুর মিশনের পরেই রবার্ট মে' র নাম করতে হয়। পাদ্রী রবার্ট মে ১৮১৪ সনের জুলাই মাসে চুঁচুড়ায় নিজের বাটীতে 'বেল্' পদ্ধতিতে শিক্ষা দেবার জন্য একটি অবৈতনিক পাঠশালা স্থাপন করেন। ক্রমে মে সাহেব আরও অনেকগুলি পাঠশালা স্থাপন করেছিলেন। ১৮১৮ সনে মে সাহেব যখন মারা গেলেন, তখন তাঁর পাঠশালার সংখ্যা ছিল ৩৬ এবং হিন্দু মুসলমান মিলিয়ে ছাত্র সংখ্যা ছিল প্রায় তিন হাজার।[13]

১৮৩৬ সনে হুগলি কলেজ ও ব্রাঞ্চ স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলে পাঠশালাগুলি অপ্রয়োজনীয় বোধে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

কলকাতা শহরে জনশিক্ষা

কলকাতায় জনশিক্ষার উদ্যোগ, আয়োজন ও পরিচালনা করেছিলেন 'কলকাতা স্কুল সোসাইটি'। ১৮১৮ সনের ২৪ শে জুলাই স্কুলবুক সোসাইটি স্থাপিত হয়েছিল। সোসাইটির কর্তৃসভায় ২৪ জন সদস্য ছিলেন। তারমধ্যে ১৬ জন ইউরোপীয় ও ৮ জন ভারতীয়।

সোসাইটির উদ্দেশ্য হল—

(১) কলকাতার দেশীয় পাঠশালাগুলির উন্নতি বিধান।

(২) আর্দশ ইংরেজী ও বাংলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।

(৩) উৎকৃষ্ট ছাত্রদের জন্য উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করা।

সোসাইটির ভারতীয় সম্পাদক ছিলেন রাজা রাধাকান্ত দেব। তিনি কলকাতাকে চারভাগে ভাগ করে প্রত্যেক বিভাগের অন্তর্গত বিভিন্ন পল্লীর নাম এবং সেখানে অবস্থিত পাঠশালার সংখ্যা স্থির করেন।

প্রতিটি বিভাগের জন্য একজন সুপারিণ্টেডেণ্ট বা তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হলেন। সোসাইটির পণ্ডিতগণ পাঠশালা পরিদর্শন করতেন, এবং ছাত্রছাত্রী ও গুরুজনের সম্মুখে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করতেন।

মেধাবী ছাত্রদের জন্য উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থাও সোসাইটি করলেন। সোসাইটির সহায়তায় প্রতিবছর প্রায় ত্রিশজন ছাত্র কলেজে পড়বার সুবিধা পেয়েছিল। এই সঙ্গে সোসাইটি আর একটি কাজও করেছিলেন। তা' হল বাংলা স্কুল বা প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির শিক্ষকদের শিক্ষণ ব্যবস্থা।

কিন্তু প্রতিবছর হাজার হাজার বই কিনে বিলি করা, পাঠশালাগুলিকে অর্থ সাহায্য, আদর্শ বিদ্যালয় পরিচালন এবং কলেজের কিছু ছাত্রদের ব্যয়ভার বহন—এর প্রত্যেকটিতেই প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। সোসাইটি প্রথম পাঁচ বছর সদস্য ও শুভার্থীদের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত দানের উপর নির্ভর করেই কাজ চালিয়েছেন। কিন্তু ধীরে ধীরে আয় কমতে লাগল এবং ১৮২৩ সনের এপ্রিল মাসে সোসাইটি সরকারের কাছে অর্থের জন্য আবেদন করলেন। সরকার পরবর্তী মে মাস থেকে সোসাইটিকে মাসিক পাঁচশত টাকা হিসাবে সাহায্য করতে লাগলেন।

১৮২৫ সনে ইংলণ্ডের কোর্ট অব ডাইরেকটরস্ সরকারের এই অর্থ সাহায্য অনুমোদন করে ভারতবর্ষের জনগণের শিক্ষা বিষয়টিকে প্রথম স্বীকৃতি দিলেন।

সোসাইটি পাঠশালার ছাত্রদের ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করে ছিলেন। ত্রৈমাসিক পরীক্ষাগুলি বিভাগীয় তত্ত্বাবধায়কদের ঘরেই হত। বার্ষিক পরীক্ষা বরাবর শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেবের ভবনে অনুষ্ঠিত হত।

স্কুল সোসাইটি স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে অগ্রণী হন নি। কারণ তখনও মেয়েদের প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে পাঠাতে অভিভাবকদের আপত্তি ছিল। তবে সোসাইটি প্রকারান্তরে বালিকা শিক্ষায় সহায়তা করতেন। মিশনারী বিদ্যালয় থেকে বালিকারা এসে রাধাকান্ত দেবের বাড়িতে সোসাইটির বার্ষিক পরীক্ষায় যোগ দিত।

১৮২৮ সনের ১লা জানুয়ারি সোসাইটির রিপোর্টে দেখা যায়, সোসাইটির তত্ত্বাবধানে পাঠশালার সংখ্যা ১৪৮ এবং ছাত্র সংখ্যা ৬,১২৬। নানা অসুবিধার ভিতর দিয়ে চলতে চলতে ১৮৩৩ সনে সোসাইটির কাজ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। কলকাতা স্কুল সোসাইটি বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে কি করেছেন তা জানতে পারা যায় অ্যাডাম সাহেবের প্রথম শিক্ষা রিপোর্ট (১লা জুলাই ১৮৩৫) থেকে।

অ্যাডাম্ ব্যাপটিষ্ট মিশনের পাদ্রী হয়ে কলকাতায় আসেন। পরে পাদ্রীদের সংস্রব ত্যাগ করে তিনি সাংবাদিকতায় মন দেন। অ্যাডাম এদেশবাসীর শিক্ষা সম্পর্কে চিন্তা করতেন। ১৮৩৫ এর ২রা জানুয়ারি অ্যাডাম এদেশে বেসরকারী শিক্ষা সম্পর্কে অনুসন্ধান করবেন বলে বড়লাট বেন্টিঙ্কের কাছে লিখিত প্রস্তাব করেন। বেন্টিঙ্ক তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করে তাঁকে শিক্ষা সম্পর্কে রিপোর্ট দেবার জন্য কমিশনার নিযুক্ত করেন। অ্যাডাম ১৮৩৫ সনের ১লা জুলাই, ২০শে ডিসেম্বর এবং ১৮৩৮ সনের ২৮শে এপ্রিল তিন খণ্ডে তাঁর রিপোর্ট সরকারের কাছে পেশ করলেন।*

*অ্যাডাম্ তাঁর শেষ রিপোর্টে বলেছিলেন যে দেশে উচ্চতম থেকে নিম্নতম পর্যন্ত যে সব দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে সেগুলিকে অবলম্বন করে এদেশবাসীদের শিক্ষা ব্যবস্থা করাই হবে সবচেয়ে সোজা, নিরাপদ, জনপ্রিয়, স্বল্প ব্যয়সাপেক্ষ এবং কার্যকর এবং সরকারের এই শিক্ষাপ্রচেষ্টার সঙ্গে দেশবাসীর প্রচেষ্টাও আদায় করতে হবে। কিন্তু সরকার তখন নিম্ন পরিস্রাবণ নীতির কল্পিত মহিমায় আচ্ছন্ন। তাই অ্যাডামের রিপোর্ট চিরকালের জন্য সরকারের নথিভুক্ত হয়ে রইল।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাবে যে আলোচ্য সময়ে বঙ্গ প্রধানদের মধ্যে একমাত্র রাজা রাধাকান্ত দেবই এদেশে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি ও প্রসারে সক্রিয় ভাবে লিপ্ত ছিলেন। স্কুল সোসাইটির দেশীয় সম্পাদক হিসাবে তিনি কলকাতার পাঠশালাগুলিতে নিয়ম শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা করেন। পাঠশালার শিক্ষাকে সুবিন্যস্ত ও সুপরিচালিত করেন। শুধু তাই নয়, পাঠশালার ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বই লিখে ও লিখিয়ে বিনামূল্যে বিতরণ করেন। রাধাকান্তের অপরাপর শিক্ষা প্রচেষ্টা আমরা ভুলে গেলেও, ইংরেজী শিক্ষার বন্যার মুখে তিনি যে দেশীয় পাঠশালার শিক্ষা অর্থাৎ বাংলা শিক্ষাকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছিলেন, একথা চিরকাল স্মরণীয়।

কলকাতার সমকালীন প্রধানরা নিজ নিজ সন্তানের উচ্চ শিক্ষার জন্য ১৮১৭ তে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, জনশিক্ষার জন্য পাঠশালাগুলির সংরক্ষণ ও উন্নতি বিধানের কথা ভাবেন নি।[১৪৮]

স্ত্রী শিক্ষা

(১৮৩৫ পর্যন্ত)

রামমোহন রায়কে বলা হয় আধুনিক ভারতের নির্মাতা। আধুনিক বাংলার তথা ভারতের যে কোনও প্রগতিশীল চিন্তার প্রথম সূচনা দেখতে পাই রামমোহনের মধ্যে। বাঙালী জাতিকে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তীর্ণ হতে রামমোহনই প্রথম শিখিয়েছেন। যে কুসংস্কার সমাজে নারীদের হীন অবস্থার জন্য দায়ী তার বিরুদ্ধে তাঁর প্রথম প্রতিবাদ পাই ১৮২২ সনে **Modern Encroachments on the Ancient Rights of Females** নামক পুস্তিকায়। ১৮১৮-১৯ সনে লেখা তাঁর সহমরণ বিষয়ক 'প্রবর্তক-নিবর্তক সম্বাদ' পুস্তিকায় তিনি লিখেছেন—

নিবর্তক..........প্রথমত বুদ্ধির বিষয়ে, স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন্ কালে লইয়াছেন। যে অনায়াসেই তাহারদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন? কারণ বিদ্যা শিক্ষা এবং জ্ঞান শিক্ষা দিলে পরে ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে, তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হয়। আপনারা বিদ্যা শিক্ষা-জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন? বরঞ্চ লীলাবতী, ভানুমতী, কর্ণাট রাজার পত্নী, কালীদাসের পত্নী প্রভৃতি যাহাকে যাহাকে বিদ্যাভ্যাস করাইয়াছিলেন তাহারা সর্বশাস্ত্রের পরাগরূপে বিখ্যাতা আছে, বিশেষত বৃহদারণ্যক উপনিষদে ব্যক্তই প্রমাণ আছে, যে অত্যন্ত দুরূহ ব্রহ্মজ্ঞান তাহা যাজ্ঞবল্ক্য আপন স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ করিয়াছেন। মৈত্রেয়ীও তাহার গ্রহণ পূর্বক কৃতার্থ হয়েন।[14]

রাজা রাধাকান্ত দেব স্ত্রী শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে বহু নজির সংগ্রহ করে গৌরমোহন বিদ্যালংকারকে দিয়ে 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক' পুস্তকটি রচনা করান (১৮২২)। শোভাবাজার রাজবাড়ী, জোড়াসাঁকো ও পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর পরিবার বর্ধমানের রাজপরিবার এবং পোস্তার রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের পরিবারে স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন ছিল।

প্যারীচাঁদ মিত্র জন্মেছিলেন ১৮১৪ সালে। তিনি যখন পাঠশালার ছাত্র

তখন মা, ঠাকুরমা প্রভৃতিকে বাংলা বই পড়তে দেখেছেন। তাঁরা বাংলা লিখতে এবং হিসাব রাখতে পারতেন। সে সময় দেশে মেয়েদের কোন স্কুল ছিল না। প্যারীচাঁদের নিজ পরিবার সম্পর্কে এ উক্তি সত্ত্বেও এ কথা সত্য যে সেযুগে বাংলা দেশে সাধারণ ঘরের মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার কোন প্রচলন ছিল না। তখনকার সমাজ ছিল স্ত্রীশিক্ষার ঘোর বিরোধী। বাল্য-বিবাহ, কৌলীন্যপ্রথা, পর্দাপ্রথা তখন উৎকট ভাবে প্রচলিত ছিল। তাছাড়া এমনকি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যুগেও হিন্দু সাধারণের বিশ্বাস ছিল যে, মেয়েদের জীবনে শিক্ষার অনিবার্য ফল হল বৈধব্য।

বাঙালী মেয়েদের জন্য প্রথম এদেশে স্কুল স্থাপন করেন, 'ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি' নামে এক নারী সমিতি। ১৮১৯ সনের মাঝামাঝি কলকাতার কয়েকজন ইউরোপীয় মহিলা কলকাতা ব্যাপটিস্ট মিশনের আনুকূল্যে এই সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন এবং ঐ সময়েই এই সমিতি কলকাতার গৌরী-বাড়ীতে বাঙ্গালী মেয়েদের জন্য প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। প্রথমে এদেশীয় শিক্ষিকা না পাওয়ার জন্য বিদ্যালয়ের কাজ অত্যন্ত ধীরে অগ্রসর হতে থাকে। বছরের শেষ পর্যন্ত মাত্র ৮টি ছাত্রী এখানে পড়াশুনা করতে আসে। গৌরমোহন বিদ্যালংকারের 'স্ত্রী শিক্ষা বিধায়ক' পুস্তকটির অনেক অংশ জুভেনাইল সোসাইটির বিদ্যালয়ে পাঠ্য বলে নির্দিষ্ট হয়। সোসাইটির একাদশ বিবরণীতে প্রকাশ যে সোসাইটির পরিচালিত স্কুল কাটোয়া এবং বীরভূমেও স্থাপিত হয়েছিল এবং ছাত্রী সংখ্যা হয়েছিল ৫০০ জন। সোসাইটির স্কুলগুলিতে ছাত্রীদের বিনা বেতনে বাংলার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হত। এসব স্কুলে ইংরাজী শিক্ষা আদৌ দেওয়া হত না। ক্রমে খ্রীষ্টধর্মের নানা কথা শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হলে উচ্চবর্ণের হিন্দুমেয়েরা এসব স্কুলে পড়া ছেড়ে দেয়। হিন্দুসমাজের নিম্নবর্ণের ছাত্রীরাই তখন থেকে এসব স্কুলে ভীড় করতে থাকে। এর পরেই উল্লেখ করতে হয় সোসাইটি ফর নেটিভ্ ফিমেল্ এডুকেসন ইন্ ক্যালকাটা অ্যাণ্ড ইটস ভিসিনিটি। এই সোসাইটি ১৮২৪ সালে চার্চ মিশনারী সোসাইটির আনুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত হয়।

রাজা রাধাকান্ত দেবের পরামর্শে সোসাইটি কুমারী কুক্-এর সহায়তা গ্রহণ করলেন। কুমারী কুক্ ঠনঠনিয়া, মির্জাপুর, শোভাবাজার, কৃষ্ণবাজার, মল্লিকবাজার ও কুমারটুলিতেও নূতন অবৈতনিক স্ত্রীবিদ্যালয় স্থাপন

করলেন। এই সোসাইটি প্রতিষ্ঠার একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কলকাতায় একটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপন। সোসাইটি এই উদ্দেশ্যে কলকাতা, বোম্বাই লণ্ডনপ্রভৃতি স্থান থেকে চাঁদা তুলবার ব্যবস্থা করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুলে প্রতিষ্ঠার জন্য ২০,০০০ টাকা দান করেন।

সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুলে শিক্ষয়িত্রীদের শিক্ষণ ব্যবস্থার জন্য একটি নতুন শ্রেণী খোলা হয়। ১৮২৮ সনে তাঁরা প্রথম পরীক্ষা দেন। এই শ্রেণীটিতেই পরবর্তীকালে স্ত্রী নর্মাল বিদ্যালয়ের গোড়াপত্তন হয়। লেডিজ সোসাইটির আনুকূল্যে বর্ধমান; কালনা, পাটনা, বারানসী এবং এলাহাবাদেও স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। এসব স্কুলে পাঁচশ'র উপরে ছাত্রী পড়াশুনায় লিপ্ত ছিল। লেডিজ সোসাইটির স্কুলগুলিতে খ্রীষ্টতত্ত্বের পঠন-পাঠন আবশ্যিক ছিল। ধীরে ধীরে সোসাইটির এই মনোগত অভিপ্রায় জানতে পেরে সম্ভ্রান্ত হিন্দুরা এর উপর বিরূপ হয়ে ওঠেন এবং সর্বপ্রকার সহায়তা প্রায় বন্ধ করে দেন।

মিস কুক্ (মিসেস উইলসন) ১৮৩৬ সনের অক্টোবর মাস পর্যন্ত সোসাইটির কাজে লিপ্ত ছিলেন। তারপর সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুলের তত্ত্বাবধানের ভার পড়ে মিসেস্ টমসন্ ও মিসেস হোয়াইটের উপর। ১৮৪০ সনে লেডিজ সোসাইটি সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুল ছাড়াও মির্জাপুর স্কুল, সারকুলার রোড স্কুল এবং হাওড়া স্কুল পরিচালনা করতেন। মোট এই চারটি স্কুলের ছাত্রীসংখ্যা ছিল পাঁচশ। দেশীয় খৃষ্টানদের কন্যারাই এসব বিদ্যালয়ে বেশী পড়ত। লেডিজ সোসাইটির কাজ ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আসে। ১৮৫২ সনে কলকাতায় এই সোসাইটির 'সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুলটি' মাত্র ছিল। তবে কৃষ্ণনগর কেন্দ্রে এরদ্বারা আরও ছ'টি স্কুল পরিচালিত হত।

পূর্বোক্ত দুটি সোসাইটির মত 'ক্যালকাটা লেডিজ অ্যাসোসিয়েশান ফর্ নেটিভ ফিমেল এডুকেশন' এদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে সহায়তা করেছিল। ১৮২৫ সনের ১৪ই জানুয়ারি কয়েকজন ইউরোপীয় মহিলা এই সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। দুটিমাত্র উদ্দেশ্য নিয়ে এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়: (১) লেডিজ সোসাইটির আনুকূল্যে প্রস্তাবিত সেণ্ট্রাল ফিমেল স্কুলের জন্য অর্থ সংগ্রহ এবং (২) লেডিজ সোসাইটির স্কুল যে যে অঞ্চলে নেই সেসব অঞ্চলে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। এজন্য এই অ্যাসোসিয়েশনকে লেডিজ সোসাইটির সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠানও বলা যায়। মিসেস্ উইলসন এই সভার অধিনেত্রী

হলেন।

মিশনারীরা এদেশে স্ত্রীশিক্ষার জন্য নানা চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ভদ্রঘরের মেয়েরা ওঁদের স্কুলে পড়তে যেতেন না। ১৮৩৮ সালে অ্যাডাম্ বলছেন—দীনতম এবং নিম্নতম শ্রেণীর সন্তানরাই এই সব বিদ্যালয়ে পড়ছে এবং তাদের দৈনিক হাজিরার জন্য নগদ অর্থ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে।[14]

হিন্দু সমাজের যাঁরা প্রধান তাঁরা নীতির দিক দিয়ে নারীশিক্ষার বিরোধী ছিলেন না। কিন্তু খ্রীষ্টান মহিলাদের হাতে লেখাপড়ার জন্য মেয়েদের ছেড়ে দিতে তাঁদের দ্বিধা সংশয়ের অন্ত ছিল না। ১৮৩১ সনে বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যে বাদানুবাদ চলেছে তার পরিচয় পাওয়া যাবে সে সময়ের সংবাদপত্র গুলিতে। ঐ সনের ২৫শে জুন জনৈক স্ত্রীশিক্ষা বিরোধী ব্যক্তি লিখছেন—'বঙ্গদূতে' অঙ্গনাগনের বঙ্গভাষা লিখন পঠনের প্রসঙ্গ হইয়াছে তৎসঙ্গতি মতে কিঞ্চিৎ লিখিতেছি সঙ্গতাসঙ্গতা বিবেচক মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন।

এই আন্দোলন অনেকদিন পর্যন্ত হইতেছে কিন্তু ইহার ইষ্টানিষ্ট বিবেচনা ব্যতিরেকে প্রবৃত্তি কি নিবৃত্তির উপদেশকরণ অনুপযুক্ত তৎপ্রযুক্ত অস্মাদাদির যুক্তিযুক্ত যাহা তাহা লিখি—'স্ত্রীলোকের লেখাপড়া করাওনের প্রয়োজন কি। যদি বল তাহারদের লিখন পঠন শিক্ষা বিনা কিতাব জ্ঞান কি তাবৎ জ্ঞান জন্মিতে পারে না' উত্তর সে প্রকৃত বটে কিন্তু এমনি কোন পুংবর্জিত দেশ বিশ্বনির্মাতা নির্মান করেন নাই যে যেখানে পাটোয়ারিগিরি ও মহুরিগিরি ও নাজীরী ও জমিদারী ও জমাদারী ও আমীরী নারীবিনা সম্পন্ন না হওনের সম্ভাবনা হয়। এবং কেবল বাংলা ক খ ফলাবানান আঙ্ক আঙ্কসিদ্ধি লিখিলেই যে তাবৎ জ্ঞান অর্থাৎ পারমার্থিক ও নীতি ও পূর্ববৃত্তান্ত জ্ঞান অথবা ইহলৌকিক জ্ঞান জন্মে এ উন্মত্ত প্রলাপ মাত্র। যেহেতু বাঙ্গলা ভাষাতে এমন কোন গ্রন্থ নাই যে তাহাতে প্রাগুক্ত কোন জ্ঞানোদয় হয়। তবে বিদ্যাসুন্দর ও রসমঞ্জরী প্রভৃতি যে ভাষা গ্রন্থ আছে তাহা পাঠ করিয়া যে বিদ্যাবৃদ্ধি হয় স্ত্রীলোকের সে বিদ্যার অপ্রাচুর্য প্রায় নাই বরং প্রার্থনা করা কর্তব্য সে বিদ্যার লোপ হয়।[16]

২০শে আগস্ট ১৮৩১ সমাচার দর্পনের এক হিন্দু পাঠক লিখছেন—"সম্প্রতি স্ত্রীবিদ্যাবিষয়ক কএক সপ্তাহ অবধি বাদানুবাদ যাইতেছে তাহাতে মহাশয়ের ৬৮৪ সংখ্যক দর্পনের প্রতি মনোরম যুক্তি লিখিয়াছেন তৎপর

২৪ আষাঢ়ীয় চন্দ্রিকাতে ও ২৫ আষাঢ় প্রভাকরেতে তদ্বিরুদ্ধে যে উত্তর উভ পত্রদ্বয় সম্পাদক মহাশয়েরা লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম......।

* * *

চন্দ্রিকা প্রকাশক স্ত্রীদিগের বিদ্যাভ্যাসে শাস্ত্রে কোন প্রমান নাহি বরং নিষেধবোধ হইতেছে এমত লিখিয়াছেন।

দীক্ষা বিষয়ে তন্ত্রে লেখে যে,—

মিত্রয়োর্দীক্ষা শুভাপ্রোক্তা মাতুশ্চাষ্ট গুণাঃ স্মৃতাঃ
মন্ত্রতন্ত্রার্থ পাঠজ্ঞা সধবা পূজনেরতা।

অতএব চন্দ্রিকা প্রকাশকের প্রতি আমার জিজ্ঞাস্য যে স্ত্রীলোক যদ্যপি শাস্ত্রাভ্যাস না করিবেক তবে কিরূপে মন্ত্রতন্ত্রার্থ, পাঠজ্ঞা হইতে পারে আর আমাদের হিন্দুর ধর্মে (সস্ত্রীকো ধর্মমাচারেৎ) ইত্যাদি রচনানুসারেই সমুদয় যাগযজ্ঞ ক্রিয়া ধর্মপত্নী ব্যতিরেকে হয় না সেই স্ত্রী যদ্যপি মূর্খা হয় তবে কিরূপ শ্রৌতস্মার্ত্ত যাজ্ঞিকী ক্রিয়া নির্ব্বাহ হয়।

প্রভাকর প্রকাশক মহাশয়ও কোন প্রমান না দিয়া কেবল উন্মত্ত প্রলাপের ন্যায় কতকগুলিন বকিয়াছেন অর্থাৎ কেবল আমার দিগের রীতি নাই করিব না এই মাত্র। অপর মহাশয়দ্বয় লেখেন যে রানীভবানী প্রভৃতি যে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন সে অকর্ত্তব্য কর্ম করিয়াছিলেন এমত বলা যায় বলিহারি যাই উক্ত মহারানী ও অহল্যাবাই প্রভৃতির নিকট বুঝি এরূপ বিবেচক না থাকাতেই এমত অকর্তব্য কর্ম হইয়াছে।[17]

১৮১৩ সনের ১৪ই ডিসেম্বর প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাঁর 'রিফর্মার' পত্রিকায় লেডিজ সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত সেন্ট্রাল ফিমেল স্কুল সম্পর্কে যে অভিমত প্রকাশ করেন, তাতে মিশনারী পরিচালিত নারীশিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে সে যুগের শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত বাঙালীর অভিমতই ব্যক্ত হয়েছে। প্রসন্ন কুমার লিখছেন—প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য হচ্ছে ছাত্রীদের এভাবে শিক্ষিত করা যাতে ভদ্রপরিবারে গিয়ে তারা অন্তঃপুরচারিকাদের শিক্ষা দিতে পারে। কিন্তু আমাদের আশঙ্কা, যে পদ্ধতি এ প্রতিষ্ঠান অনুসারণ করছে, তাতে ঐ শুভফল লাভ সম্ভব নয়। এ প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীরা বেশীরভাগই অতি নিম্ন শ্রেণীর, এদের ভদ্রপরিবারে গতায়তিতে যথেষ্ট বাধা আছে। তাছাড়া যখন জানা গেছে যে এদের শিক্ষা মুখ্যতঃ খ্রীষ্টধর্ম সম্পর্কিত ; তখন ভদ্র পরিবারে প্রবেশাধিকার

পাওয়া এদের পক্ষে সত্যই কঠিন হবে। আমাদের অভিমত হচ্ছে সেণ্ট্রাল স্কুলে আরও উদার শিক্ষা ব্যবস্থা হোক এবং পরিচালকমণ্ডলী যাদের শিক্ষা দিতে চান (অর্থাৎ এদেশের মহিলাদের) তাদের বিভিন্ন সংস্কার সম্পর্কে বিশেষ ভাবে অবহিত হোন।[১৪]

উপরের মন্তব্য ও বিতর্কগুলি থেকে জানা যাচ্ছে যে ১৮৩৫ সনের পূর্বে বাঙালীদের মধ্যে রাজা রাধাকান্ত দেব, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর এবং 'বঙ্গদূত' পত্রিকার সম্পাদক নীলরত্ন হালদার স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে বিশেষ চিন্তা বা প্রচেষ্টা করেছিলেন। এঁদের মধ্যে আবার রাজা রাধাকান্তেরই এ সম্পর্কে সক্রিয় ভূমিকা ছিল।

পাদটীকা

ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসার

1. ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—সংবাদ পত্রে সেকালের কথা ১/৪১।
2. A. N. Bose—*Indian Education in Parliamentary Papers. P. 91.*
3. N. K. Sinha—*History of Bengal (1757-1905) (University of Calcutta), P. 436.*
4. *Presidency College Register Part I 1927, compiled by Prof.* S. N. Majumdar.
5. রমেশ চন্দ্র মজুমদার—বাংলাদেশের ইতিহাস ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১২৮ (জেনারেল প্রিণ্টার্স এণ্ড পাবলিশার্স)
   'হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত'—রাজনারায়ণ বসু (অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত)।
6. ব্রজেন্দ্র বন্দোপাধ্যায়—কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস, ১/৭০, (সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা)
7. ব্রজেন্দ্র বন্দোপাধ্যায়—স. সে. ক ২/১৩১-১৩২ (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ)
8. *Selections from Educational Records Vol. I. P. 179* (Nurulla Naik—*History of Education in India P. 83-84)*
9. K. Zacharia—*History of the Hooghly College, P. 18.*

9a. Arthur Mayhew, *Education of India, P. 59*

9b. ঐ পৃঃ ৬১।

প্রাথমিক শিক্ষা

10. Ward—*Views of the Hindus Vol. I. P. 160.*
11. *Selections from Educational Records, Part I (1781-1839)* Sharp, *P. 24.*
    [যোগেশ বাগল—বাংলার জনশিক্ষা পৃঃ ৪ দ্রঃ]

12. *The life and times of Carrey, Marshman and Ward by* **J. C. Marshman,** *Vol. 2, 1841* (যোগেশ চন্দ্র বাগল—বাংলার জনশিক্ষা পৃঃ ১৪ দ্রঃ)

13. যোগেশ চন্দ্র বাগল—বাংলার জনশিক্ষা, পৃঃ ৯।
'বেল পদ্ধতিটি' আমাদের দেশীয় পাঠশালার 'সর্দার পোড়ো'-র প্রায় অনুরূপ। সর্দার পোড়ো যেমন অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিয়ে গুরুমহাশয়ের শ্রমের লাঘব করতেন, তেমনি ইংলণ্ডের কিছু কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই প্রথা ল্যাংকেষ্টার এবং বেল সাহেব ভারতীয় পদ্ধতির অনুকরণে প্রবর্তিত করেছিলেন। এই বেল সাহেবের নামানুসারেই এই পদ্ধতির নামকরণ হয়।

13a. *Reports on the state of education in Bengal, 1835 & 1838, edited by* A. N Basu, *P 358 418*

13b. যোগেশ চন্দ্র বাগল—বাংলার জনশিক্ষা ; পৃঃ ১৩-২৯।

স্ত্রী শিক্ষা

14. রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দ চন্দ্র বেদান্ত বাগীশ সম্পাদিত রাজা রামমোহন প্রণীত গ্রন্থাবলী, পৃঃ ২০৫-২০৬।

15. Adam's Report, *1838, P. 311* (*Third Report*)

16. ব্রজেন্দ্র বন্দোপাধ্যায়—স. সে. ক ২। ৯০-৯২।

17. ঐ পৃঃ ৯৩-৯৮

18. Jogesh Chandra Bagal—*Women's Education in Eastern India P. 38.*

ইংরেজী (পাশ্চাত্য) শিক্ষার প্রসার

(১৮৩৬-১৮৫৩)

[বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে ডিরোজিও ও ডিরোজিয়োনদের অবদান।]

ইংরেজীর মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষালাভের ফলে বাংলাদেশে ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, রাজনীতি ও সংস্কৃতির অন্যান্য বিভাগে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটেছিল। এ পরিবর্তন যে কেন্দ্র থেকে উৎসারিত হয়েছিল সে কেন্দ্র হচ্ছে হিন্দু কলেজ (প্রতিষ্ঠা বর্ষ ১৮১৭)

এই হিন্দু কলেজের তরুণ অধ্যাপক ছিলেন লুই হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-৩১)। ১৮২৬ সনের মে মাসে তিনি হিন্দু কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং সেখানে পাঁচ বছর শিক্ষকতা করেন। ডিরোজিও ছিলেন ড্রুমণ্ড সাহেবের ছাত্র। তাঁর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি পুরোপুরি একটি সংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদী মনের অধিকারী এবং স্বাধীন চিন্তার উপাসক হয়েছিলেন।

ছাত্রদের উপর ডিরোজিওর অভাবিত প্রভাব ছিল। ডিরোজিওর জীবনীকার লিখেছেন—'**Neither before nor since his day has any teacher within the walls of any native educational establishment in India, ever exercised such an influence over his pupils.**'[1]

ছাত্রদের উপর ডিরোজিওর এই অভাবিত প্রভাব দেখে একদল হিন্দু বিশেষ সন্ত্রস্ত হন এবং তাঁদের চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত ডিরোজিওকে পদত্যাগ করতে হয়। এরই কয়েক মাস পরে ১৮৩১ সনের ২৬শে ডিসেম্বর তিনি কলেরা আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

২৫শে এপ্রিল, ১৮৩১ ডিরোজিও তাঁর পদত্যাগপত্র কর্তৃপক্ষকে পাঠিয়ে দেন। সে পত্রে তিনি বলেন,—'**unexamined and unheard, you resolve to dismiss me without even the mockery of a trial**'[2] অর্থাৎ আমাকে জেরা করা হল না, আমার বক্তব্য শোনা হল না, বিচারের প্রহসন পর্যন্ত প্রয়োজন হল না, অথচ আপনারা আমাকে পদচ্যুত করার সিদ্ধান্ত করলেন।

ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের ঈশ্বর বিশ্বাসে আঘাত করেছেন—এই অপবাদের যে উত্তর তিনি দিয়েছিলেন, বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে তা বিখ্যাত হয়ে আছে। উত্তরে তিনি বলেছিলেন—'If it be wrong to speak of all upon such a subject, I am guilty: for I am neither afraid nor ashamed to confess having stated the doubts of philosophers upon the head, beacause I have also stated the solution of those doubts. Is it forbidden anywhere to agree upon such a question? If so it must be equally wrong to adduce an argument upon either side, or is it consistent with an enlightened notion of truth to wed ourselves to only one view of so important a subject, resolving to close our eyes and ears against all impressions that oppose themselves to it?

.......Entrusted as I was for some time with the education of youth, peculiarly circumstanced, was it for me to have made them part and ignorant dogmatists.......I therefore thought it my duty to acquaint several of the college students with the substance of Hume's celebrated dialogue between Cleanthes and Philo, in which the most subtle and refined arguments against theism are adduced. But I have also furnished them with Dr. Reid's and Dugald Stewart's more acute replies to Hume, replies which to this day continue unrefuted. This is the head and front of my offending ....

.......that I should be called a sceptic and infidel is not surprising, as these names are already given to persons who think for themselves in religion.[8]

অর্থাৎ এ জাতীয় বিষয় (ঈশ্বরবাদ, আস্তিকতা) সম্পর্কে কিছু বলা যদি দোষের হয়, তবে আমি দোষী। এ বিষয়ে আমি দার্শনিকদের সন্দেহের কথা বলেছি, আবার সন্দেহ নিরসনের কথাও বলেছি—তাই একথা স্বীকার করতে আমি ভীত বা লজ্জিত নই। এ জাতীয় বিষয় সম্পর্কে যুক্তিসহ আলোচনা

কি কোনো দেশে নিষিদ্ধ? তাই যদি হয়, তবে কোন পক্ষেরই এ বিষয়ে কোন যুক্তি প্রদর্শন সমীচীন নয়। সত্য সম্বন্ধে সুসভ্য মানুষের যে ধারণা তাতে কি এ ধরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে একপক্ষের অনুবর্তী হয়ে বিরোধীপক্ষের মতের প্রতি চোখকান বন্ধ করে থাকা উচিত?

……আমি যুবকদের শিক্ষাদানে কিছুকাল নিযুক্ত ছিলাম। আমার পক্ষে কি তাদের অজ্ঞ, প্রগল্‌ভ অযুক্তিসিদ্ধ মতবাদে বিশ্বাসী করে গড়ে তোলা উচিত? ….আমি আমার কয়েকজন ছাত্রকে হিউম রচিত ক্লিনথিস্ এবং ফিলোর বিখ্যাত কথোপকথনের সঙ্গে পরিচিত করানো কর্তব্য বলে মনে করেছি। এই কথোপকথনে আস্তিকতাবাদের বিরুদ্ধে অতি সূক্ষ্ম সব যুক্তি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে ডঃ রীড্ ও স্টুয়ার্ট উক্ত হিউম্‌কে যে উত্তর দিয়েছেন তাও দেখিয়েছি। সেসব উত্তরের আজও খণ্ডন হয়নি।

…আমাকে নাস্তিক বলা হয়েছে। এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। কারণ এ পর্যন্ত ধর্ম সম্বন্ধে যাঁরাই স্বাধীনভাবে চিন্তা করেছেন, তাঁদেরই এ অপবাদ দেওয়া হয়েছে।

ডিরোজিও অতি স্বল্পকাল মাত্র হিন্দু কলেজে অধ্যাপক ছিলেন। কিন্তু এই অল্প সময়ে তিনি তাঁর ছাত্রদের যে ভাবে অনুপ্রাণিত করেছিলেন তাঁর ফলে তিনি বাংলা দেশে মুক্তচিন্তা প্রবর্তনের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে রইলেন। বাংলাদেশে এই মুক্তচিন্তা বা **free thinking** প্রবর্তনই ডিরোজিওর প্রধানতম দান। ডিরোজিওর বহু শিষ্য উত্তরকালে বঙ্গ সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে ছিলেন।[4]

হিন্দু কলেজে অধ্যাপক থাকা কালে ডিরোজিও কলেজের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদের নিয়ে ১৮২৮ সনে "অ্যাকাডেমিক এসোসিয়েশন"—নামে বিতর্ক সভা স্থাপন করেছিলেন। এ সভার বিতর্কের প্রধান লক্ষণ ছিল যুক্তি। যা যুক্তিসিদ্ধ নয়, এমন কোন আলোচনার অবতারনা এসভায় করা হত না। এ সভা চলেছিল ১৮৩৯ সন পর্যন্ত।

শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখছেন, 'ডিরোজিও নিজে উক্ত সভার সভাপতি এবং উমাচরন বসু নামক একজন যুবক প্রথম সম্পাদক ছিলেন। রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, দক্ষিণা রঞ্জন মুখোপাধ্যায়, হরচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি উক্ত সভার প্রধান প্রধান বক্তা এবং রামতনু লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি অপরাপর

উৎসাহী সভ্য শ্রোতারূপে উপস্থিত থাকিতেন। এই সভা অল্পদিনের মধ্যে লোকের দৃষ্টিকে এতদূর আকর্ষণ করিয়েছিল যে, উহার অধিবেশনে এক-একদিন ডেভিড্ হেয়ার, লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক এর প্রাইভেট সেক্রেটারী কর্ণেল বেনসন্ পরবর্তী সময়ের এড্‌জুটেণ্ট জেনারেল কর্ণেল বীটসন্, বিশপ্ কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ মিল্‌স্ প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগন উপস্থিত থাকিতেন এবং বক্তৃতা শুনিয়া বিস্ময় ও আনন্দ প্রকাশ করিতেন।[৫]

এই অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েসনে মুখ্যত যে সব বিষয় নিয়ে বিতর্ক হত সেগুলি হচ্ছে, স্বাধীন ইচ্ছা, অদৃষ্টবাদ, পাপপুণ্যতত্ত্ব, দেশপ্রেম, ঈশ্বরের অস্তিত্ব, নাস্তিকতা, মূর্তিপূজার অসারতা এবং পুরোহিত তন্ত্রের গ্লানি ইত্যাদি।[৬]

অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েসনের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল একটি পত্রালাপ সমিতি। ডিরোজিয়ানরা নবযুগের মানবতাবাদের সঙ্গে সংগতি রেখে নিজেদের মধ্যে এই সমিতির মাধ্যমে পত্রালাপের দ্বারা মত বিনিময় করতেন।

অ্যাকাডেমিক অ্যাসেসিয়েসন্ প্রতিষ্ঠার দশবছর পরে ১৮৩৮ সনের ২০শে ফেব্রুয়ারী ডিরোজিয়ানরা "সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা" (সোসাইটি ফর দি অ্যাকুইজিসন অব জেনারেল নলেজ) স্থাপন করেন। এই সভার সভাপতি হলেন তারাচাঁদ চক্রবর্তী, সহ-সভাপতি রামগোপাল ঘোষ এবং দুজন সম্পাদক হলেন প্যারীচাঁদ মিত্র ও রামতনু লাহিড়ী। "সাধারণ জ্ঞানোপোর্জিকা সভায়" যেসব প্রবন্ধ পড়া হয়েছিল তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে--'Nature and importance of Historical Studies' (কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়), On Poetry (রাজনারায়ন দত্ত), State of Hindoostan Under the Hindoos (প্যারীচাঁদ মিত্র), Reform : Civil and Social (কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়), On Native Female Education (প্যারীচাঁদ মিত্র), On the Physiology of Digestion (প্রসন্ন কুমার ঠাকুর), 'এতদ্দেশীয় লোকদের বাংলাভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করণের আবশ্যকতা বিষয়ক প্রস্তাব' (উদয়চন্দ্র আঢ্য) ইত্যাদি।[7]

লক্ষ্য করলে দেখা যায় ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য শিক্ষা, সামাজিক সমস্যা, বিজ্ঞান প্রভৃতি সর্বপ্রকার বিষয় এই সভায় আলোচিত হত। "সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়"-এর তৎকালীন সম্পাদক উদয়চন্দ্র আঢ্যের প্রবন্ধটি সত্যই

উল্লেখযোগ্য। ১৮৩৮ এর ১৩ই জুন তিনি এই প্রবন্ধ পাঠ করেন। উদয়চন্দ্রই বোধহয় প্রথম বাঙালী যিনি বাংলা সাহিত্যের অনুশীলনের অত্যাবশ্যকতা এবং বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের কথা দেশবাসীকে স্মরণ করিয়ে দেন।

ডিরোজিয়ানদের উদ্যোগে ১৮৩৯ সনের গোড়ার দিকে 'মেকানিকস্ ইনস্‌টিটিউট্' স্থাপিত হয়েছিল। স্বল্পকাল স্থায়ী হলেও যে-কালে বাংলা-দেশে কোন যন্ত্রচালিত শিল্প ছিল না, সে কালে বাঙালী এধরনের প্রতিষ্ঠানের কথা ভেবেছিল—এটা বিস্ময়ের বিষয়। এ ব্যাপারে পথিকৃতের সম্মান ডিরোজিয়ানদেরই প্রাপ্য। প্রখ্যাত ডিরোজিয়ান প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর 'লাইফ্ অব্ কোল্‌সওয়ার্দি গ্রাণ্ট' পুস্তকে লিখছেন—প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই মেকানিকস্ ইনস্‌টিটিউট কলকতাবাসীদের মনে যেভাবে সাড়া এনে দিয়েছিল, রাজধানীর অন্য কোন প্রতিষ্ঠান তা পারেনি।[৪]

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৮৪২ সনে তারাচাঁদ চক্রবর্তী সরকার পরিচালিত কারিগরী শিক্ষার দাবী জানিয়েছিলেন।[৫]

ডিরোজিও এবং তাঁর শিষ্যবর্গ ছিলেন মুক্ত চিন্তার উপাসক। স্বদেশের বহু কুসংস্কার ও কুপ্রথা সম্বন্ধে তাঁরা তাঁদের সভায় খোলাখুলি বিরূপ আলোচনা করতেন এজন্য দেশবাসী এঁদের উগ্রপাশ্চাত্যভাবাপন্ন বিজাতীয়-বৃত্তি দেশদ্রোহী প্রভৃতি আখ্যা দিয়েছিল। কিন্তু এসব অপবাদ অনেকটাই অসত্য। পাশ্চাত্ত্যের নতুন চিন্তার ঐশ্বর্য এঁদের গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল সত্য, কিন্তু তাই বলে স্বদেশ এবং স্বদেশবাসীদের এঁরা পরিহার করেন নি। ডিরোজিও নিজে ছিলেন পরম স্বদেশভক্ত। তাঁর স্বদেশপ্রীতি তাঁর শিষ্যদের মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছিল। দেশকে ভালবাসতেন বলেই দেশের সমাজ ও শাসনের গ্লানি, ধর্মের গোঁড়ামি, দেশব্যাপী অশিক্ষা এবং কুসংস্কার—সবই এঁদের পীড়িত করত।

অন্যদিকে, স্বদেশের প্রাচীন শাস্ত্র, স্বদেশের ভাষা এঁদের শ্রদ্ধার বস্তু ছিল। খৃষ্টান কৃষ্ণমোহন গভীর শ্রদ্ধার সহিত হিন্দুশাস্ত্র ও দর্শন পড়েছিলেন, তারাচাঁদ চক্রবর্তী মনুসংহিতার অনুবাদ করেছিলেন, কৃষ্ণমোহন তাঁর 'ইন্‌কোয়ারার' পত্রিকা প্রকাশ করে হিন্দু ধর্মের গোঁড়ামি প্রতিরোধ করবার চেষ্টা করেছিলেন। রসিককৃষ্ণ মল্লিক 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা আংশিকভাবে বাংলায় প্রকাশ করেছিলেন। প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার স্ত্রীপাঠ্য 'মাসিক পত্রিকা' (প্রথম প্রকাশকাল ১৮৫৪) প্রকাশ করে এদেশের অন্তঃ

পুরবাসিনীদের শিক্ষার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। প্যারীচাঁদ 'টেকচাঁদ ঠাকুর' ছদ্মনামে 'আলালের ঘরের দুলাল' নামক উপন্যাস লিখে বাংলার গদ্যে চলিত রীতির প্রবর্তন করেছিলেন।[৩৪]

আবার ডিরোজিয়ানদের 'হিন্দু পাইওনীয়র' পত্রিকায় 'ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড করেনার্স' শীর্ষক প্রবন্ধে দেশবাসীর উপর বিশাল করের বোঝা চাপান এবং দেশবাসীকে শাসন ব্যাপারে উচ্চপদথেকে বঞ্চিত রাখা সম্পর্কে তীব্র অভিযোগও প্রকাশ করা হয়েছিল।[৩৫]

আসল কথা ডিরোজিয়ানদের আচার ব্যবহারে, ভাবে-ভাষায় একটা উগ্র আতিশয্য ও উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা যায়। সমকালীন দেশবাসীরা সেগুলিকেই তাঁদের শিক্ষা ও স্বভাব-বৈশিষ্ট্য বলে ধরেছিলেন। ডিরোজিও এবং ডিরো-জিয়ানদের তাঁরা পুরোপুরি চিনতে পারে নি। 'ইয়ংবেঙ্গল' ভুক্ত যুবকদল তাঁদের নতুন চিন্তা ও বিবিধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে যে বাংলাদেশে নূতন যুগের সূচনা করতে চেয়েছিলেন, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। এঁরাই প্রথম পাশ্চাত্ত্যের নতুন চিন্তাকে সর্বান্তঃকরনে স্বাগত জানিয়েছিলেন। দেশের মধ্যযুগীয় কুসংস্কার ও অজ্ঞতা দূর করে এঁরা দেশবাসীর চিত্তে মানবতাবাদ, নির্ভয় যুক্তিবাদ, চিন্তার স্বাধীনতা প্রভৃতি নবযুগের প্রগতিধারা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। নতুন শিক্ষায় আলোকে উদ্দীপ্ত ডিরোজিয়ানরাই দেশবাসীদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ এনে দিয়েছিলেন। তাঁদের সম্বন্ধে যে অপবাদ ও বিরূপ সমালোচনা হয়েছে তার মূল কারণ তাঁদের অনেকের অসংযত ভাবভঙ্গী ও আচরণ।

কিন্তু ডিরোজিয়ানদের প্রভাব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নি। দেশের চিরাচরিত বিশ্বাস, ধর্মান্ধতা ধর্মীয় পুনরভ্যুত্থান প্রভৃতির মধ্যে এঁদের চিন্তাধারার বলিষ্ঠতা অনেকটাই হারিয়ে গিয়েছিল। তা ছাড়া, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে তাঁদের বিক্ষিপ্ত ধারনাগুলি একটি সুসংবদ্ধ দার্শনিকতা অর্জন করেনি, কোনও পরিকল্পনায় রূপায়িত হতেও পারেনি।

পূর্বেই বলা হয়েছে উনিশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে ইংরেজী শিক্ষা তথা পাশ্চাত্য ভাবধারা বিকিরণের ব্যাপারে হিন্দু কলেজের ভূমিকা সর্বাগ্রগণ্য।[৩৬]

ডিরোজিয়ানরা সে যুগে যে সব সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গড়েছিলেন বা পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন তার বিবরণ উপরে দেওয়া হয়েছে। অতঃপর আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান বা সমিতি সম্পর্কে আলোচনা করা

প্রয়োজন। এগুলি হচ্ছে তত্ত্ববোধিনীসভা, বেথুন সোসাইটি, বিদ্যোৎসাহিনী সভা, সুহৃৎ সমিতি ও বেঙ্গল সোসাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েসন। সে যুগে বাংলা দেশে শিক্ষা সংস্কৃতি প্রসারে এগুলির ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এই সব সমিতি বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে দেখা যাবে হিন্দু কলেজের ছাত্ররাই এগুলির প্রতিষ্ঠায় মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করছেন এবং প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই একাধিক ডিরোজিয়ান এঁদের সঙ্গে আছেন।

এই সব সভাসমিতির কালানুক্রমিক আলোচনায় প্রথমেই **তত্ত্ববোধিনী সভার (১৮৪৩)** কথা বলতে হয়। তত্ত্ববোধিনী সভার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বাংলা দেশে ইতিপূর্বে প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় সমাজ (১৮২০), সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা (১৮৩২), বঙ্গভাষা প্রবেশিকা সভা (১৮৩৬) প্রভৃতির আদর্শ এবং অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েসন জাতীয় প্রতিষ্ঠানের আদর্শ এই সভায় একসঙ্গে মিলিত হয়েছিল। এখানে দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়চন্দ্রের সঙ্গে নব্য শিক্ষিতরাও হাত মিলিয়েছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখছেন, তাঁহার (দেবেন্দ্রনাথের) প্রকৃতির বিশেষত্ব ও মহত্ব এই যে যখন দেশের শিক্ষিতদলের মধ্যে প্রতীচ্যানুরাগ প্রবল, সকলেই পশ্চিমদিকে চাহিয়া রহিয়াছে, তখন তিনি এদেশের প্রাচীন জ্ঞান সম্পত্তির প্রতি মুখ ফিরাইলেন, বেদবেদান্তের আলোচনার জন্য তিনি তত্ত্ববোধিনী সভা ও তত্ত্ববোধনী পাঠশালা স্থাপন করিলেন। তিনি ধর্ম সংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু আপনার কার্যকে জাতীয়তারূপ ভিত্তির উপর স্থাপিত রাখিতে ব্যগ্র হইলেন। এই বিশেষত্ব তিনি চিরদিন রক্ষণ করিয়াছেন।[10]

বেথুন সোসাইটি : ১৮৫১ সনে কাউনসিল অব্ এডুকেসন এর সম্পাদক এফ. জি. মোয়াট-এর প্রস্তাব অনুসারে 'বেথুন সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হল। এর উদ্দেশ্য স্থির হল 'সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্পর্কিত নানা বিষয়ের আলোচনা'। এই সোসাইটিতে প্রাথমিক সদস্য ছিলেন ২৪ জন। তার মধ্যে ৫ জন ইংরেজ এবং ১৯ জন বাঙ্গালী। ১৯ জন বাঙ্গালী হচ্ছেন ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কৃষ্ণ মোহন বন্দোপাধ্যায়, ডাঃ সূর্য্য কুমার, গুডিব চক্রবর্তী, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, রামচন্দ্র মিত্র, কৈলাস চন্দ্র বসু, হরমোহন চট্টোপাধ্যায়, জগদীশ নাথ রায়, নবীন চন্দ্র মিত্র, জ্ঞানেন্দ্র মোহন ঠাকুর, প্যারী চরন সরকার, প্যারীচাঁদ মিত্র, প্রসন্ন কুমার মিত্র, গোপাল চন্দ্র দত্ত, হরচন্দ্র দত্ত এবং দক্ষিনারঞ্জন মুখোপাধ্যায়।[11]

এটা সত্যি লক্ষ্য করবার বিষয় যে যখন ইউরোপেও সমাজ বিদ্যার পঠন পাঠনের একেবারে শৈশব অবস্থা, তখন বেথুন সোসাইটিতে সমাজ বিজ্ঞান শাখা ছিল। এই সঙ্গে অন্য শাখা গুলি হচ্ছে শিক্ষা, সাহিত্য ও দর্শন, বিজ্ঞান এবং কলা, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য এবং স্ত্রী জাতির উন্নতি। বেথুন সোসাইটি যেন একাধারে সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার একটি সম্প্রসারিত সংস্করণ, আবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্থক অগ্রদূত। এখানে ইংরেজ ও বাঙ্গালী একত্র মিলিত হয়েছিলেন জ্ঞানচর্চার আন্তরিক অভিপ্রায় নিয়ে। এবং রাজনীতি ও ধর্ম এই দুইটি স্পর্শকাতর বিষয় ছাড়া জ্ঞানের সর্বক্ষেত্রেই এঁরা বিচরণ করবার অধিকার মেনে নিয়েছিলেন।

বিদ্যোৎসাহিনী সভা ঃ বেথুন সোসাইটির পর ১৮৫৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হল, 'বিদ্যোৎসাহিনী' সভা। বিখ্যাত প্যারীচাঁদ মিত্র, কৃষ্ণ কমল ভট্টাচার্য প্রভৃতি সুধী বাঙালী বিদ্যোৎসাহিনী সভার সভ্য ছিলেন এবং সে যুগের বহু বিখ্যাত ইংরেজ শিক্ষা ব্রতীরাও আহূত হয়ে এ-সভায় ইংরেজী সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেন। বিদ্যোৎসাহিনী সভার মুখপত্র ছিল 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা।' এ পত্রিকায় উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখকদের পুরস্কার দানের ব্যবস্থা ছিল। বিদ্যোৎসাহিনী সভাই কবি মাইকেলকে 'মেঘনাদ বধ' মহাকাব্য রচনার জন্য অভিনন্দিত করেছিলেন ১৮৬১, ১২ই ফেব্রুয়ারী একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বিদ্যোৎসাহিনী সভার নেতৃত্বে কলকাতায় বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয়। এই রঙ্গালয়ে প্রকাশ্য ভাবে দ্বার উদ্ঘাটন করা হয় ১৮৫৭ সালের ১১ই এপ্রিল। এই সময় থেকেই কলিকাতায় নব্য শিক্ষিত ধনীরা নিজ নিজ ভবনে নাট্যশালা প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হন। আশুতোষ দেবের বাড়িতে, পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুরবাড়িতে নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর ক্রমে পাইকপাড়ায় সিংহদের বেলগেছিয়া নাট্যশালা, জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীর জোড়াসাঁকো নাট্যশালা, বৌবাজার নাট্যশালা প্রভৃতি স্থাপিত হয়। বিদ্যোৎসাহিনী সভা বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনে নববল সঞ্চারের উদ্দেশ্য নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত করে এক অভূতপূর্ব দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে গেছেন।

সমাজসেবাও ছিল এ সভার একটি অঙ্গ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমাজ সেবার আন্দোলনকে এ সভাই শুরু থেকে আন্তরিকভাবে সাহায্য করেন। এই সভার পক্ষ থেকে প্রথম যাঁরা বিধবা বিবাহ করবেন, তাঁদের এক সহস্র টাকার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়।[12]

সুহৃৎ সমিতি : ১৮৫৪ সনের ১৫ই ডিসেম্বর সামাজিক উন্নতির উদ্দেশ্যে সুহৃৎ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সুহৃৎসমিতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর, কিশোরী চাঁদ মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, অক্ষয় কুমার দত্ত, হরিশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গৌরদাস বসাক প্রভৃতি সে যুগের প্রখ্যাত বঙ্গ সন্তানরা। সমিতির প্রথম দিনের সভায় এর উদ্দেশ্য স্থির হয়েছিল—স্ত্রী শিক্ষার প্রবর্তন হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহ, বাল্য বিবাহ বর্জন ও বহুবিবাহ রোধ।

এইসব সংস্থা বা সমিতির চেয়ে, এমনকি বেথুন সোসাইটির চেয়েও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ১৮৬৬ সালের ১৭ই ডিসেম্বর **'বেঙ্গল সোস্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েসান্'**-এর প্রতিষ্ঠা।

এই অ্যাসোসিয়েসন্-এর প্রতিষ্ঠায় ছিল রামমোহনের জীবনী রচয়িত্রী কুমারী মেরী কার্পেন্টারের উদ্যোগ এবং তার সঙ্গে সক্রিয় সহায়তা করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্যারীচাঁদ মিত্র, কেশব চন্দ্র সেন, মনোমোহন ঘোষ, রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং রেভারেণ্ড লঙ্, বিচার পতি নরম্যান, বিচারপতি ফিয়ার, বিচারপতি সাট্‌নকার, মিঃ ই. সি. বেইলি, মিঃ অ্যাটকিন্‌সান এবং মিঃ ম্যাকেন্‌জি প্রভৃতি বিদগ্ধ ইংরাজ। এই সমাজ বিজ্ঞান সভার উদ্দেশ্য ছিল 'ইউরোপীয় এবং সকল শ্রেণীর দেশীয় ব্যক্তিদের সমবেত প্রচেষ্টায় বাংলার জনগনের সামাজিক, বৌদ্ধিক ও নৈতিক অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও তথ্যের শ্রেণী-বিন্যাসের মাধ্যমে বাংলা প্রেসিডেন্সীতে সামাজিক উন্নতির সহায়তা করা।'[১৪]

সমাজ বিজ্ঞান সভার বৈশিষ্ট্য এই যে ইতিপূর্বে কোন সভা বা সমিতি বাঙালী জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আলোচনার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

প্রাথমিক শিক্ষা

(১৮৩৬-১৮৫৩)

হিন্দু কালেজ পাঠশালা

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে সরকার এ দেশের শিক্ষাবিষয়ে ফ্রিলট্রেসন নীতি অবলম্বন করে দেশীয় পাঠশালা অর্থাৎ জনশিক্ষা সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়েন। দেশীয় পাঠশালা সম্পর্কে সরকারের এই বিমাতৃসুলভ মনোভাব সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অবশ্যই চিন্তিত করেছিল। তখন চারদিকে ইংরাজী শিক্ষার জয়জয়কার চলছে। ইংরাজী জ্ঞান তখন আর্থিক উন্নতি ও সামাজিক মর্যাদা লাভের সুনিশ্চিত সোপান। ইংরেজী শিক্ষার জন্য দেশবাসীকে এই ভাবে প্রমত্ত দেখে হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ সভার রাধাকান্ত দেব, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামকমল সেন, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর প্রভৃতি বাংলা ভাষার মাধ্যমে ছেলেদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে একটি আদর্শ পাঠশালা স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। পাঠশালার জন্য অর্থসংগ্রহ, ছাত্র-নির্বাচন, শিক্ষক নিয়োগ, পাঠক্রম প্রস্তুতি এবং পুস্তক রচনা প্রভৃতি কাজের জন্য ডেভিড্ হেয়ার, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর, রামকমল সেন, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতিকে নিয়ে একটি সাব কমিটি গঠিত হল।

কমিটি স্থির করেন, প্রথম শ্রেণীতে অক্ষর, বানান, ইতিহাস, ব্যাকরণ ও গণিতের প্রাথমিক সূত্র, গোলাধ্যায়ের মূল প্রকরণ এবং ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। দ্বিতীয় শ্রেণীতে ব্যাকরণ, অঙ্ক, ক্ষেত্র পরিমাপক বিদ্যা, গোলাধ্যায়, জ্যোতির্বিদ্যা, শুদ্ধরূপে ভাষা কথনের বিধি, ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের ইতিহাস, এবং পত্রলিখন রীতি। তৃতীয় শ্রেণীতে শুদ্ধরূপে ভাষা কথনের নিয়ম, জমিদারী ও বাণিজ্য সম্পর্কীয় ব্যবহার, প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস, জ্যোতির্বিদ্যা বীজগণিত, রাজনীতি, নীতিবিদ্যা, ক্ষেত্র পরিমাপক বিদ্যা, গভর্ণমেণ্টের আইন ও আদালতের রীতি ব্যবহার এবং হিন্দু ও মুসলমানদের ব্যবস্থা।[14]

১৮ই জানুয়ারী ১৮৪০ বহু নেতৃস্থানীয় ইংরেজ ও বাঙালীর সম্মুখে বাংলা পাঠশালার পাঠ আরম্ভ হয়। সেদিন পাঠশালার প্রধান অধ্যাপক রামচন্দ্র

বিদ্যাবাগীশ মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে শিক্ষাদানের যৌক্তিকতা সম্পর্কে বক্তৃতা করেন এবং বাংলা যে শিক্ষার মাধ্যম হওয়ার মত শক্তিশালিনী ভাষা—সে কথাও বলেন। সেদিনের সভায় মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক ডাঃ সাও্‌নেসী এবং হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ রিচার্ডসন্ সাহেবও বাঙালীর বাংলা ভাষা শিক্ষার—প্রয়োজনীয়তা সম্প.র্ক বক্তৃতা করেন।

হিন্দু কলেজের উপর সরকারী কর্তৃত্বের সূচনা বহু পূর্বেই হয়েছিল। ১৮৪১ সনের ২০শে অক্টোবর থেকে এই কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হল। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ সভা কাউন্সিল অব্ এডুকেশনের অন্তর্গত একটি সাব কমিটি রূপে গণ্য হল এবং অধ্যক্ষ সভাকে প্রতিটি বিষয়ে কাউন্সিলের নির্দেশ মেনে চলতে হবে এই আদেশ হল।

এতদিনে অধ্যক্ষ সভার চেষ্টায় একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী পাঠশালার জন্য পাঠ্যপুস্তক রচনার ব্যবস্থা হচ্ছিল। কর্তৃত্ব পাওয়ার পর জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনসট্রাক্‌সন (যেটি ১৮৪০ সালে কিছু পরিবর্তিত হয়ে কাউন্সিল অব এডুকেশন নামে অভিহিত হয়েছিল) এ সম্পর্কে একটি সাব কমিটি গঠন করলেন, এবং তাতে একমাত্র বাঙালী সদস্য রইলেন প্রসন্ন কুমার ঠাকুর। হিন্দুর আচার আচারণ প্রাচ্য দর্শন বা ভাবধারা যাতে পাঠ্যপুস্তকে প্রতিফলিত না হতে পারে সে জন্য শিক্ষা সমাজ এই নিয়ম করে দিলেন যে, প্রথমে ইংরেজীতে পাঠ্যপুস্তক লিখে তা তাঁদের সাব কমিটির দ্বারা অনুমোদিত করিয়ে তবে বাংলা ও অন্যান্য দেশীয় ভাষায় অনুবাদ হবে। এভাবে কাজ করার ফলে পাঠশালার আদর্শ ব্যাহত হল এবং জাতীয় ভাবাদর্শ মূলক পাঠ্য পুস্তক রচনার আর আশা রইল না।

অধ্যক্ষ সভা পাঠশালার শোচনীয় পরিণতির কথা জানিয়ে কাউন্সিলকে দুবার পত্র লিখলেন। কিন্তু কাউন্সিল তাঁদের কথায় কর্ণপাত করলেন না। ১৮৪৩-৪৪ সনে পাঠশালার ছাত্র সংখ্যা দেড়'শর কিছু বেশীতে দাঁড়াল, কাউন্সিল পাঠশালার উন্নতির জন্য কোন ব্যবস্থাই করলেন না। 'বেঙ্গল হরকরা' (২৯ আগষ্ট ১৮৫১) লিখলেন—হিন্দু কলেজ পাঠশালা যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, তাতে একে গুরুমশায়দের পাঠশালার চেয়ে উঁচুতে স্থান দেওয়া যায় না।[15]

ইতিমধ্যে হিন্দু কলেজ পরিচালনার ব্যাপারে কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সভা এবং কাউন্সিলের মধ্যে নানা বাগবিতণ্ডা এবং বাদপ্রতিবাদ সুরু হোল।

ফলে কাউন্সিল কলেজ পরিচালনার ভার সবটাই নিজে হাতে নিলেন। সামান্য যেটুকু অবশিষ্ট ছিল ১৮৫৪ সনের ১৫ই মে থেকে হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সী কলেজে পরিণত হল, স্কুল বিভাগের নাম হল হিন্দু স্কুল এবং বাংলা পাঠশালা সংস্কৃত কলেজের অন্তর্ভুক্ত হল। এ অবস্থাতেও এই ১৮৫৪ সালেও রেভারেণ্ড লঙ্‌ দেখেছিলেন পাঠশালায় মাসিক আট আনা মাহিনা দিয়ে ২০০ ছাত্র বাংলার মাধ্যমে লেখাপড়া শিখছে। ব্যাপারটা তাঁকে দস্তুরমত বিস্মিত করেছিল।[16]

নূতন ব্যবস্থা অনুসারে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ রূপে ১৮৫৫ সনের ৩০শে এপ্রিল 'কাউন্সিল অব্‌ এডুকেশন' এর পক্ষে বিদ্যাসাগর মহাশয় এই বাংলা পাঠশালার পরিচালনা ভার গ্রহণ করলেন।

তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা

১৮৪০ এর ১৩ই জুন দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপন করেন। তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার উদ্দেশ্য হিন্দু কলেজ পাঠশালার থেকে ভিন্ন। হিন্দু কলেজ পাঠশালায় ধর্মালোচনার অবকাশ ছিল না অথচ মিশনারীরা অবৈতনিক ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে ইংরেজী শিখানোর ছলে ছাত্রছাত্রীদের খ্রীষ্টতত্ত্বই বেশী করে শিখাচ্ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার পাঠক্রমের মাধ্যমেই তাঁর শিক্ষাচিন্তার স্বাক্ষর রেখে গেছেন।[17]

বাংলার অগ্রগণ্য ব্যক্তিদের মনোভাব অনুধাবন করে ইতিমধ্যে বড়লাট হার্ডিঞ্জ বাংলা শিক্ষার প্রসারে এগিয়ে এলেন।

১৮৪৪, ১০ই অক্টোবর একটি ঘোষণায় তিনি বললেন, ইংরেজী শিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তি গুণ ও যোগ্যতা অনুসারে সরকারী কাজে নিযুক্ত হতে পারবেন। ঘোষণায় তিনি আরও বললেন যে, নিম্ন পদগুলিতেও নিরক্ষর ব্যক্তিদের নিয়োগ না করে দেশীয় ভাষায় লিখন পঠনক্ষম ব্যক্তিদের নিয়োগ করা হবে।[17a] হার্ডিঞ্জের ঘোষণা এদেশের ইংরেজী শিক্ষার প্রচারে প্রচুর সহায়তা করেছিল এবং সেই সঙ্গে বাংলা শিক্ষা প্রসারেরও ক্ষেত্র রচনা করেছিল। কেবলমাত্র দেশবাসীর প্রচেষ্টার উপর নির্ভর না করে তিনি বঙ্গদেশে (বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা) ১০১টি বাংলা আদর্শ পাঠশালা স্থাপনের ব্যবস্থা করলেন। যদিও এই বিস্তীর্ণ ভূভাগে ১০১টি পাঠশালা কিছুই নয় তবু সরকার মাতৃ-ভাষার মাধ্যমে জনশিক্ষার দায়িত্ব নিচ্ছেন এতে সেদিনকার দেশহিতৈষী

ব্যক্তি মাত্রই আশ্বস্ত ও আনন্দিত হয়েছিলেন।

১০১টি বিত্থালয়ের জন্য ১০১ জন শিক্ষক নিযুক্ত করা হল। বিত্থালয়ে বাংলা লিখন পঠন, বাংলায় গণিত, ভূগোল এবং ভারত ও বাংলার ইতিহাস পড়ানোর ব্যবস্থা হল। বঙ্গবিত্থালয়ে ছাত্রদের মাসিক বেতন দিতে হত এবং নিজেদের বই কিনতে হত।

হার্ডিঞ্জ এই সমস্ত বিত্থালয়ের ভার দিলেন সদর বোর্ড অব্ রেভেনিউ এর উপর। হার্ডিঞ্জ বুঝেছিলেন 'কাউন্সিল অব্ এডুকেশন' ইংরেজী শিক্ষা নিয়েই মশগুল, তাই বাংলা শিক্ষার উৎকর্ষ সাধন এঁদের দ্বারা সম্ভব নয়। কিন্তু হার্ডিঞ্জের চেষ্টা সত্ত্বেও বাংলা শিক্ষার প্রতি সরকারি ঔদাসিন্যের অবসান হল না। উপযুক্ত পরিচালক, পরিদর্শক এবং পাঠ্যপুস্তকের অভাবে তিন চার বছরের মধ্যেই স্কুল গুলির দুর্দশা দেখা দিল।

১৮৫২ সনে ১৯শে এপ্রিল বঙ্গ বিত্থালয়গুলি যখন কাউন্সিল্ অব্ এডুকেশনের কর্তৃত্বাধীনে আসে, তখন এদের অত্যন্ত দুরবস্থা। ১৮৫৪ সনের ১৯শে জুলাই উড্ সাহেবের ডেস্প্যাচ প্রকাশিত হল। ঐ সময়ে বাংলাদেশে ৩৩টি বঙ্গবিদ্যালয়ে ১৪০০ ছাত্র লেখাপড়া শিখছে।[14]

প্রাথমিক শিক্ষা বা জনশিক্ষা সম্পর্কে সরকারের অনুদার উদাসীন মনোবৃত্তি এরজন্য দায়ী। ১৮৫৪ সনের জুন মাসে 'ক্যালকাটা রিভিউ' (পৃঃ৩০৫) বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে লিখছেন, **In Bengal with its thirty-seven millions, the Government bestows Rs. 8,000/- annually on Vernacular Education ! One-third the salary of a Collector of Revenue ! As much is expended on 200 prisoners in jail !.**

অর্থাৎ বাংলাদেশে তিন কোটি সত্তর লক্ষ লোকের বাস। আর এদেশে সরকার বাংলা শিক্ষার জন্য খরচ করেন বছরে আট হাজার টাকা! এ টাকা হচ্ছে একজন কালেক্টারের বার্ষিক বেতনের এক-তৃতীয়াংশ, এটাকায় জেলখানায় দু'শ কয়েদী এক বছর পোষা হয়।

'ক্যালকাটা রিভিউ' যে ভাষায় বাংলা শিক্ষা সম্পর্কে সরকারী উদাসীনতা প্রকাশ করেছেন, তার চেয়ে অব্যর্থ ভাষায় এ তাচ্ছিল্যের কথা প্রকাশ বোধ হয় সম্ভব নয়।

স্ত্রী শিক্ষা (১৮৩৬-১৮৫৩)

১৮৩৭ সালে বিখ্যাত ধনী মতিলাল শীল ও হলধর মল্লিকের সহযোগে

এমন একটি সংঘ স্থাপনের প্রস্তাব করলেন যার উদ্দেশ্য হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহ প্রবর্তন এবং নারীদের মধ্যে উদার শিক্ষাব্যবস্থার প্রচলন। কিন্তু এরূপ মতের ও সংঘের বিরোধী দলও তদানীন্তন বঙ্গসমাজে বর্তমান ছিল।

'সমাচার দর্পন' এ সম্পর্কে উভয় পক্ষের পত্র কিছু প্রকাশ করেছেন। তা থেকে বাংলাদেশে স্ত্রী শিক্ষার সপক্ষে ও বিপক্ষে যে চিন্তাধারা সে সময় চলেছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৩৮ সালের ৩রা মার্চ স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী এক ব্যক্তি স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে লেখেন, "কএকজন হিতৈষী সাহেব লোক ও বিবি সাহেবেরা স্ত্রীলোকেদের বিদ্যাশিক্ষার্থে পাঠশালা স্থাপনার্থ উদ্যোগী হইয়াছেন কিন্তু দুই এক স্থানে অতি নীচ জাতীয় কএকজন বালিকা বস্ত্র ও অন্যান্য পারিতোষিকের নিমিত্ত তাঁহাদের পাঠশালাতে গমন করে কিন্তু অন্যান্য স্থানে তাঁহাদের ঐ উদ্যোগ বিফলই হইয়াছে।

ভারতবর্ষ সভ্য হওনার্থ বিবেচনা করিলে এই বিষয় অতি বিলপনীয় বটে। যদ্যপি পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীদিগকে বিদ্যাশিক্ষা না দেওয়া যায় তবে দেশের সৌষ্ঠব হওনের অতি বিলম্ব হইবে। সকল দেশেই সর্বকালেই পুরুষেরা স্ত্রী লোকের বাধ্য বটেন এবং ইহা যথার্থ বটে তবে স্ত্রীলোকেরা যদি সম্পূর্ণ-রূপে অজ্ঞানাবস্থায় থাকেন তবে পুরুষেরা কিরূপে সর্ব্বতোভাবে সভ্যতা প্রাপ্ত হইতে পারেন।

অতএব আমি স্বদেশীয় মিত্রবর্গের প্রতি এই বিনীত করি যে ইহার প্রতিকারক কোন উপায় স্থির করেন এই অকিঞ্চনের বোধে কলিকাতা বরাহ-নগর, পাণীয়হাটি, চুঁচুড়া, শান্তিপুর প্রভৃতি প্রধান প্রধান গণ্ডগ্রামে শিষ্ট বিশিষ্ট মান্য ব্যক্তিদের উচিত যে তাহারা সকলে একত্র হইয়া স্ত্রীরদের বিদ্যাভ্যাসার্থ এক এক পাঠশালা স্থাপন করেন।...অতএব অতি সাহসপূর্বক আমরা কেহ এইক্ষণে আরম্ভ করি এবং শ্রীশ্রী পরমেশ্বরের প্রসাদে আরম্ভ করিলেই নিতান্ত সুফল দর্শিতে পারিবে। কস্যচিৎ ব্রহ্মণস্য। চুঁচুড়া ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৮৩৮।[10]

আবার ২৬শে মে, ১৮৩৮ মুর্শিদাবাদ থেকে কৈলাস সেন লেখেন—

শ্রীযুত দর্পন প্রকাশক সমীপেষু। আপনার ১১৮১ সংখ্যক দর্পনে কস্যচিৎ চুঁচুড়া নিবাসী গুপ্তনামধারী 'ব্রাহ্মণস্য ইতি' স্বাক্ষরিত এক অদ্ভুত পত্র প্রকাশ হইয়াছে। কিন্তু কার্য্যান্তরে স্থানান্তরে থাকাতে তাহা পাঠ করিতে বিলম্ব হইয়াছিল। এইক্ষণে দৃষ্টমাত্রই লেখকের ভ্রান্তি শান্ত্যর্থে যৎকিঞ্চিৎ লিখিলাম। লিথক মহাশয় স্ত্রীগণের বিদ্যাভ্যাস না হওয়াতে আন্তরিক বিবাদিত আছেন।

সম্পাদক মহাশয় ও লেখক মহাশয় নারীগণের বিদ্যাভ্যাস না হওয়াতে দেশীয় সৌষ্ঠবের বিলম্ব হইতেছে লিখিয়াছেন। হায়, কি অপূর্ব কথা। অঙ্গনারা বিদ্যাশিক্ষা করিলে দেশের যে কিসে উপকার দর্শিত তাহা আমার বোধগম্য হয় না যেহেতুক স্ত্রীলোককে সর্ব শাস্ত্রেই অবিশ্বাসী ও খল কহিয়াছেন তাহার এক প্রমাণ 'বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ।'[২০]

আবার কৈলাস সেনের বক্তব্যের প্রতিবাদ ১৬ই জুন, ১৮২৮-এ জনৈক হুগলী নিবাসী করলেন :

***দর্পন সম্পাদক মহাশয় স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাধ্যয়নে শাস্ত্রে কোন নিষেধ নাই বরং নীতিশাস্ত্রে স্পষ্ট অনুমতি আছে যথা—

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ।" ইত্যাদি অর্থাৎ কন্যাকে পুত্রের ন্যায় পালন ও শিক্ষা করাইবেক।

আমি এই কহিতেছি যে একালে রাণী ভবাণী হঠী বিদ্যালঙ্কার ও শ্যামাসুন্দরী ব্রাহ্মণী প্রভৃতি অনেক স্ত্রীরা বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন এবং অনেকেই করিতেছেন তাহাতে তাহারদের প্রতি কি দোষ স্পর্শিয়াছে বা স্পর্শিতেছে অতএব পূর্ব্বাবধি এ পর্যন্ত স্ত্রীলোকদিগের যে বিদ্যাধ্যয়ন প্রথা প্রচলিত আছে এবং তাহাতে দোষাভাব ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য।[২১]

এইভাবে সপক্ষীয় ও বিপক্ষীয়দের বাদানুবাদ চলল স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে এবং তারই ভিতর অত্যন্ত মন্থর গতিতে স্ত্রীশিক্ষা এগিয়ে চলল বঙ্গদেশে।

১৮৪০ সনে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখে ২০০ টাকা পুরস্কার পেলেন। প্রবন্ধটি গৌরমোহন আড্ডির ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে ছাত্রদের সম্মুখে পাঠ করা হল (মার্চ ১৮৪০) এবং ১৮৪১ সনের জুলাই মাসে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হল, নাম হল 'Native Female Education'। কৃষ্ণমোহন ঐ প্রবন্ধে বললেন, হিন্দু শাস্ত্রের নানা গোঁড়ামির জন্য প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার জন্য হিন্দু মেয়েরা শিক্ষায় দীক্ষায় পশ্চাৎপদ হয়ে আছে। তিনি শিক্ষিত ইউরোপীয় মহিলা দ্বারা ঘরে বসে যাতে সম্ভ্রান্ত মেয়েরা লেখাপড়া শিখতে পারে তার প্রস্তাব করলেন এবং এ প্রসঙ্গে প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের কন্যার শিক্ষাব্যবস্থার কথা উল্লেখ করলেন। অবশ্য এ ব্যবস্থা চালু করতে হলে সংগঠন প্রয়োজন।

তিনি বললেন—'And it would not be chimerical to hope that if instruction could be offered under the auspices of a

well organised European native society, without demanding a sudden and violent revolution, as it were, in the domestic economics of the Hindus, the cause of female improvement would gradually prosper in Calcutta. (A prize essay on Native Female Education. P. 114—115)।[22]

অর্থাৎ ইউরোপীয় ও স্বদেশীয়দের দ্বারা মিলিতভাবে সুপরিচালিত কোনো সংস্থার তত্ত্বাবধানে যদি স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা হয় এবং সে শিক্ষায় যদি হিন্দুদের গার্হস্থ্য ব্যবস্থায় বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের প্রচেষ্টা না হয়, তাহলে কলকাতায় স্ত্রীশিক্ষা ক্রমশঃই প্রসারিত হবে।'

রামগোপাল ঘোষ নব্য বঙ্গের একজন নেতা ছিলেন। তিনি বরাবর স্ত্রীশিক্ষায় উৎসাহ প্রকাশ করেছেন। ১৮৪২ সনে তিনি হিন্দু কলেজের প্রথম দুই শ্রেণীর ছাত্রদের স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে দুটি রচনার জন্য একটি স্বর্ণ ও একটি রৌপ্যপদক পুরস্কার ঘোষণা করলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর মধুসূদন দত্ত ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় এই প্রবন্ধ লিখে যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কার পান।[23]

১৮৪২-এর ১লা জুন হেয়ার সাহেব স্বর্গত হলেন। স্মৃতিসভায় প্রগতিশীল বাঙালীরা 'হেয়ার প্রাইজ ফাণ্ড' নামে একটি ভাণ্ডার খুললেন। উদ্দেশ্য স্ত্রী-শিক্ষা প্রসার। স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখকদের পুরস্কার দেওয়ার কথাও হল। ১৮৪৯ সালে সংস্কৃত কলেজের ছাত্র তারাশঙ্কর শর্মা 'ভারত-বর্ষীয় নারীগণের শিক্ষা' প্রবন্ধ লিখে পুরস্কার পেলেন। ১৮৬৪ থেকে পুরস্কার তুলে দিয়ে এই ফাণ্ডের সাহায্যে বাংলাভাষায় স্ত্রীপাঠ্য পুস্তক প্রকাশ আরম্ভ হয়। ফাণ্ডের পরিচালকদের মধ্যে ছিলেন রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শিব চন্দ্র দেব এবং দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর।[24]

বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির কর্ণধাররূপে তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রাম-গোপাল ঘোষ ও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে ১৮৪৫ সনেই একটি পরিকল্পনা তৈরী করেন। প্রায় এই সময়েই উত্তরপাড়ার জমিদার জয়কৃষ্ণ ও রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় স্ত্রীবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় জানিয়ে শিক্ষা সমাজের কাছে পরিকল্পনা পাঠান ও সাহায্য প্রার্থনা করেন। বারাসতে প্যারীচরণ সরকার, নবীনকৃষ্ণ মিত্র, কালীকৃষ্ণ মিত্র প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ একযোগে একটি বালিকা বিদ্যালয় ১৮৪৭ সালেই স্থাপন করেছিলেন।[25]

১৮৪৮ সনের এপ্রিল মাসে জন এলিয়ট্ ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন বড়লাটের শাসন পরিষদের ব্যবহার সচিব হিসাবে ভারতবর্ষে আসেন। পদাধিকার বলে তিনি 'কাউন্সিল অব্ এডুকেশন' এর সভাপতি হলেন।

বেথুন এদেশে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করবেন স্থির করলেন। এদেশে স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা এবং ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা অত্যন্ত স্বচ্ছ ছিল, তাই নিজে গোঁড়া খ্রীষ্টান হয়েও তাঁর স্কুল থেকে ধর্মকে পুরোপুরি বাদ দিলেন এবং সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েদের নিয়ে স্কুল খুললেন। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের 'সংবাদ ভাস্কর', ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর'বেথুনের প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত করলেন।

স্ত্রীশিক্ষা বিষয়টিকে গোড়া থেকেই মর্যাদা দেবার অভিপ্রায়ে তিনি প্রকৃত সম্ভ্রান্ত বংশের প্রায় কুড়িটি মেয়ে নিয়ে স্কুল শুরু করলেন।

বেথুনের ঐ ধরণের প্রচেষ্টাকে স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে নিম্ন পরিস্রাবণ নীতির প্রয়োগ বলা যেতে পারে।

১৮৪৯ সনে বেথুন 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল' স্থাপন করলেন। রাজনারায়ণ বসু লিখেছেন—'যেদিনই উহা সংস্থাপন হয় সেদিন ফ্রিমেসনেরা পতাকা উড়াইয়া ও বাদ্যোদ্যম করিয়া মহাসমারোহের সহিত কলিকাতার রাস্তা দিয়া গমন করিয়া উহার মূল প্রস্তর নিখাত করেন।[২৬]

বিদ্যালয় খোলার দিন যে একুশটি মেয়ে উপস্থিত হয়েছিল, তার মধ্যে ভুবনমালা ও কুন্দমালা মদনমোহন তর্কালংকার মহাশয়ের দুই কন্যা। মদনমোহন শুধু মেয়েদের পাঠিয়েই কাজ শেষ করেননি, তিনি কিছুকাল যাবৎ ঐ বিদ্যালয়ে মেয়েদের পড়াতেন এবং মেয়েদের পাঠোপযোগী বাংলা পাঠ্যপুস্তকও রচনা করতে আরম্ভ করেন।

বেথুন সাহেবের অনুরোধে বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৫০ সনের ডিসেম্বর মাস থেকে তাঁর বালিকা বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদক পদ গ্রহণ করেন। বেথুন স্কুলের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় কী নিদারুণ শ্রম ও যত্ন স্বীকার করেছিলেন, তার বিবরণ বিদ্যাসাগরের অনুজ ও জীবনীকার শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের গ্রন্থে জানা যায়। শম্ভুচন্দ্র লিখছেন—'মহামতি ভারত হিতৈষী, বেথুন সাহেব ভারতবর্ষের অবলাগণের বিদ্যাশিক্ষার জন্য সর্বপ্রথমে কলিকাতা মহানগরীতে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

••• কলিকাতাস্থ দলপতিদের নিবারণে প্রথমতঃ কেহ কেহ স্বীয় দুহিতাগণকে

শিক্ষার জন্য এই নব প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ে পাঠাইতে সাহস করেন নাই। অগ্রজ মহাশয়ের অনুরোধে বহুবাজার নিবাসী বাবু নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, বাবু হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, বাবু রামগোপাল ঘোষ, বাবু ঈশানচন্দ্র বসু ও তৎকালের সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান উকীল-বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত, পণ্ডিত তারানাথ তর্ক বাচস্পতি, পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি কয়েকজন কৃতবিদ্য ও সম্ভ্রান্তলোক স্বীয় স্বীয় কন্যাগণকে শিক্ষার্থে 'বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ে' প্রেরণ করিতেন। উক্ত মহোদয়গণ দলপতিদের নিবারণেও ক্ষান্ত হইলেন না। এজন্য কলিকাতা ও পল্লীগ্রামস্থ সম্ভ্রান্ত দলপতিরা ঐক্য হইয়া উহাদের সহিত সামাজিক ব্যবহার বন্ধ করিয়া দেন এবং সংবাদপত্রেও তাঁহাদের যথোচিত দুর্নাম ঘোষণা করিয়াছিলেন।

*** যে সকল বালিকা ঐ বিদ্যালয়ে অধ্যয়নার্থে প্রবিষ্টা হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কোন কোন বালিকার পাণিগ্রহণ সময়ে বিপক্ষপক্ষ প্রতিবেশী সকল অনেক আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। অগ্রজ মহাশয়, পরিশ্রম স্বীকার করিয়া গতিবিধি ও উপরোধ অনুরোধ দ্বারা ঐ সকল আপত্তি খণ্ডণ করিয়া দিতে ক্ষান্ত থাকিতেন না। তৎকালে বেথুন ফিমেল স্কুলের চিরস্থায়িতার কোন আশাই ছিল না। পরিশেষে বেথুন সাহেব মহোদয় অগ্রজ মহাশয়কে ঐ বিদ্যালয়ে অবৈতনিক সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত করিলেন।

সর্বপ্রথমে ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষা প্রচার বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ই বেথুন সাহেবকে প্রবৃত্ত করেন। ফলতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয় আন্তরিক যত্ন না করিলে তৎকালে এতদ্দেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত হওয়া দুষ্কর হইত। তাঁহার যত্নের শৈথিল্য থাকিলে, কোন্‌কালে বেথুন ফিমেল স্কুল উঠিয়া যাইত।'[২৭]

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর প্রথমা কন্যা সৌদামিনী দেবীকে ১৮৫১ সনের জুলাই মাসে এই ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল বা বেথুন স্কুলে ভর্তি করেন। তিনি ১৮৫১, ৮ই জুলাই মেদিনীপুরে রাজনারায়ন বসুকে লেখেন,—"আমি বেথুন সাহেবের বালিকা বিদ্যালয়ে সৌদামিনীকে প্রেরণ করিয়াছি, দেখি এ দৃষ্টান্তে কি ফল হয়।"[২৮]

বেথুন ইহলোক ত্যাগ করেন ১৮৫১ সনের ১১ই অগষ্ট। ডালহৌসী তারপর থেকে বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার নিজেই বহন করেন। ১৮৫৬, ৬ই মার্চ তিনি ভারত ত্যাগ করেন। সেই থেকে তাঁর পূর্ব প্রস্তাব অনুসারে কলকাতা

বালিকা বিদ্যালয়ের পরিচালনার ভার নিলেন ভারত সরকার।

ভারত সরকার বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য এবং বিদ্যালয়টিকে জনপ্রিয় করার জন্য ১৮৫৬, ২০শে সেপ্টেম্বর কলিকাতা গেজেটে নিম্নলিখিত হিন্দু-প্রধানদের নিয়ে বালিকা বিদ্যালয়ের পরিচালনা সমিতি গঠন করলেন।

সভাপতি—স্যার সিসিল বীডন্, সদস্যগণ—রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, রাজা প্রতাপ চন্দ্র সিংহ, রায় হরচন্দ্র ঘোষবাহাদুর, অমৃতলাল মিত্র, রায় প্রাণনাথ চৌধুরী, রামরত্ন রায়, রাজেন্দ্র দত্ত, ভবানীপ্রসাদ দত্ত, রমাপ্রসাদ রায়, কালীপ্রসাদ ঘোষ। অবৈতনিক সম্পাদক—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।[২৭]

ঊনবিংশ শতকের গোড়াতে মেয়েদের বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান সম্পর্কে স্বাভাবিক ভাবেই বাঙালীর উদার মনোভাবের অভাব ছিল। তারপর কয়েকটি মিশনারী প্রতিষ্ঠান যেভাবে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে নিম্ন শ্রেণীর মেয়েদের নিয়ে স্ত্রীশিক্ষার প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন, তাতে বাঙালীর উপরোক্ত অনুদার মনোভাব কঠিন প্রতিরোধে পরিণত হয়েছিল।

আলোচ্য সময়ে (১৮৩৫-১৮৫৩) বঙ্গদেশে নানা পত্রিকার মাধ্যমে বাদানুবাদের ফলে এবং বঙ্গদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে মত প্রকাশের ফলে মধ্যবিত্ত বাঙালীর মন স্ত্রীশিক্ষার জন্য অনেকটা প্রস্তুত হল। এ মানসিক প্রস্তুতি পূর্ণতা পেল সেদিন যেদিন উপযুক্ত ব্যক্তি উপযুক্ত পদ্ধতিতে বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রকৃত সূচনা করলেন। এই উপযুক্ত ব্যক্তি হচ্ছেন জন্ বেথুন এবং উপযুক্ত পদ্ধতি হচ্ছে দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর প্রভৃতির মত প্রথম শ্রেণীর দেশনায়কদের অকৃপণ সহায়তা নিয়ে সম্ভ্রান্ত ও উচ্চবর্ণের মেয়েদের জন্য স্ত্রীবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। এই শুভ সূচনার পর থেকেই সকল শ্রেণীর বাঙালীর বিদ্যালয়ে নিয়মিত স্ত্রীশিক্ষার অনুকূল মানসিক প্রস্তুতি গড়ে উঠতে লাগল।

সমকালীন চারজন বঙ্গ মনীষীর শিক্ষাচিন্তা

রাজা রাধাকান্ত দেব (১৭৮৪-১৮৬৭)

রাজা রাধাকান্ত দেব বাংলার ইতিহাসে একটি বিস্মৃত প্রায় নাম। এর কারণ তাঁর সম্পর্কে নিষ্ঠুর দুটি তথ্য : রাজা রাধাকান্ত রামমোহনের সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ-প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে দেশে বিদেশে আন্দোলন সৃষ্টি করেছিলেন এবং তিনি সুহৃৎ সমিতির বহুবিবাহ প্রথা নিরোধক আন্দোলনেরও সক্রিয় বিরোধিতা করেছিলেন। এ দুটি কাজই যে সামাজিক প্রগতি বিরোধী এ সম্পর্কে তর্কের অবকাশ নেই। এ দুটি কাজ রাধাকান্তের জীবনের সমস্ত সৎ প্রচেষ্টাকে অনেকখানি ম্লান করে দিয়েছে। তাই বোধহয় তাঁর শিক্ষা চিন্তা ও শিক্ষা প্রচেষ্টার যথার্থ নিরপেক্ষতা দিয়ে প্রকৃত মূল্যায়ণ করা হয় নি। রাধাকান্ত দেবের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাঁর নিজস্ব চিন্তা ও ভাবনা অনুসারে তিনি আজীবন কাজ করে গেছেন, বিদেশ-বাহিত যুগের হাওয়া তাঁকে বিশেষ প্রভাবান্বিত করতে পারেনি। রামমোহন যে-সময় বলছেন, এদেশে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার প্রবর্তন কর্তব্য, বলছেন, মামুলী সংস্কৃত চর্চাকে রাষ্ট্রীয় আশ্রয় দিলে দেশবাসী অজ্ঞানের অন্ধকার থেকে মুক্ত হতে পারবে না, সে সময় সংস্কৃত চর্চাকে সর্বসাধারনের পক্ষে সুলভ করবার প্রচেষ্টায় রাধাকান্ত জীবনপাত করে চলেছেন। সে যুগে রাধাকান্তের সংস্কৃত চর্চা প্রসারের জন্য বিপুল ব্যাকুলতা এবং প্রচুর অর্থব্যয় প্রগতি বিরোধী বলেই মনে হওয়া আপাতদৃষ্টিতে স্বাভাবিক। কিন্তু নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চার দ্বারাই এদেশে তথাকথিত নবজাগরণের উদ্যোক্তারা স্বদেশের প্রাচীন গৌরবময় ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছিলেন এবং এইপরিচয়ই এই তথাকথিত জাগরণের পথ রচনায় তাঁদের শক্তি জুগিয়ে ছিল। ৪০ বছরের প্রাণপাত চেষ্টায় রাধাকান্ত যে বিশাল সংস্কৃত অভিধান 'শব্দকল্পদ্রুম' সংকলন করেছিলেন সে গ্রন্থ রচনায় তাঁর সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছিল **'to revive the study of Sanskrit in my own country where it has been on the decline.**[৪০]

সে গ্রন্থের সাহায্যেই উইলসন্, ম্যাক্স্‌মুলার প্রভৃতি পাশ্চত্ত্য পণ্ডিতরা প্রাচীন ভারতের ধর্ম ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ভারতের গৌরমণ্ডিত

ঐতিহ্যকে বিশ্ববাসীর কাছে উদ্ঘাটিত করতে পেরেছিলেন।

স্বদেশবাসীর মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষা প্রসারের জন্য রাধাকান্ত ১৮৫৭ সনে শোভাবাজারে একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ বছর ৭ই ফেব্রুয়ারি 'সমাচার চন্দ্রিকা' লেখেন,—

নূতন সংস্কৃত কলেজ। আমরা অসীম আনন্দসলিলে অবগাহন পূর্বক প্রকাশ করিতেছি অত্র নগরীয় অদ্বিতীয় মান্যাগ্রগণ্য পণ্ডিত মণ্ডলী উজ্জল নৃপবর শ্রীমন্মহারাজ রাধাকান্ত বাহাদুর সম্প্রতি অভিনব সংস্কৃত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চন্দ্র তর্কপঞ্চানন তথা শ্রীযুক্ত আনন্দ চন্দ্র শিরোমণি, শ্রীযুক্ত কালীকমল তর্কপঞ্চানন ভট্টচার্য্য মহাশয়গণ অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। বেলা ১০ (দশ) ঘণ্টাবধি দুই প্রহর চারিঘণ্টা পর্যন্ত পাঠের কাল নির্ণীত হইয়াছে। ১২ (বার) জন বিদেশীয় ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছেন। ঐ অভিনব কলেজে আপাততঃ ব্যাকরণ, অলংকার, ভট্টি কুমার কাব্যাদি, শব্দশাস্ত্র এবং নব্য প্রাচীন স্মৃতি ধর্মশাস্ত্র অধ্যাপনা হইতেছে। নিযুক্ত অধ্যাপকদিগের কথাই নাই, ঐ সকল বিদেশীয় ছাত্রগণেরাও রাজসংসার হইতে আহারীয় নগদ বৃত্তি পাইতেছেন।[৪১]

সংস্কৃত চর্চার পুনরুজ্জীবন রাধাকান্তের জীবনের সর্বপ্রধান ব্রত হলেও সে যুগের সকল শিক্ষা প্রচেষ্টায় তিনি সক্রিয়ভাবে সংযুক্ত ছিলেন। স্মরণীয় যে 'হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রথম থেকে দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর তিনি এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। স্কুল সোসাইটি, স্কুল বুক সোসাইটি, ভার্ণাকুলার লিটারেচার সোসাইটি সবার সঙ্গেই তাঁর যোগ ছিল।

১৮৪৫ সনে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মিশনারীদের খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারের নিরঙ্কুশ প্রচেষ্টায় বাধা দেবার জন্য যখন মিশনারীদের অবৈতনিক বিদ্যালয়গুলির মত একটি হিন্দু অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আয়োজন করেন, তখন রাধাকান্ত সেই উদ্যোগ সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। এই "হিন্দু-হিতার্থী বিদ্যালয়" (হিন্দু চ্যারিটেব্‌ল্ ইন্সটিটিউশন) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৪৬ খ্রীঃ-এর ১লা মার্চ। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে রাধাকান্তের প্রচেষ্টাকে দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা লেখেন বিশেষতঃ রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর পক্ষপাত শূণ্য হইয়া এ বিষয়ের সুসিদ্ধির জন্য যে প্রকার যত্নবান হইয়াছেন, ইহাতে কৃতকার্য হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা দেখিতেছি।[৪২]

১৮৫৩ সন থেকে হিন্দু কলেজে হীরাবুলবুলের পুত্রকে ভর্তি করা নিয়ে যে আন্দোলন শুরু হয় তারই ফলে প্রতিষ্ঠিত হয় 'হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ।' রাধাকান্ত দেব, মতিলাল শীল এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই কলেজের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে বিশেষ ভাবে যুক্ত ছিলেন। ফলে কলেজের যে পরিচালনা সমিতি গঠিত হয়েছিল রাধাকান্ত সর্বসম্মতিক্রমে সেই কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

জনশিক্ষা সম্পর্কে রাধাকান্তের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে সমকালীন কলকাতার বিশিষ্ট নাগরিকদের মধ্যে রাজা রাধাকান্ত ছিলেন অন্যতম যিনি ইংরাজী শিক্ষার প্রবল বন্যার মুখে সুষ্ঠু পদ্ধতিতে মাতৃভাষা বাংলা শিক্ষার পথ উন্মুক্ত ও প্রশস্ত করেছিলেন। স্কুল বুক সোসাইটির সদস্য হিসাবে এবং স্কুল সোসাইটির দেশীয় সম্পাদক হিসাবে তিনি কলকাতার বিশৃঙ্খল পাঠশালা-গুলিতে নিয়মশৃঙ্খলার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করে দেশীয় শিক্ষাকে সুবিন্যস্ত ও সুপরি-চালিত করেছিলেন। তাছাড়া নিজে পাঠশালার ছেলেমেয়েদের জন্য বাংলা পাঠ্য পুস্তক রচনা করে এবং উপযুক্ত পণ্ডিতদের দ্বারা রচনা করিয়ে তিনি ঐ সব পুস্তক ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থাও করেছিলেন। পরবর্তীকালে বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত বহু উন্নত ধরনের শিশু পাঠ্য-পুস্তক রচনা করেছিলেন সত্য; কিন্তু এ বিষয়ে বাংলা দেশে পথিকৃতের গৌরব রাধাকান্তেরই প্রাপ্য।

সে যুগে রাধাকান্ত প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের পাঠানোর পক্ষপাতী ছিলেন না, কিন্তু তা বলে স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী ছিলেন না, তিনি। তাঁর শোভাবাজার রাজবাটীতে স্কুল সোসাইটির ছাত্রদের যে বার্ষিক ও ত্রৈমাসিক পরীক্ষা হত, তাতে ছাত্রদের সঙ্গে ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটির ছাত্রীরাও পরীক্ষা দিতে আসত এবং ছাত্রদের মত তাদেরও গুণানুসারে পারিতোষিক দেওয়া হত।

বেথুন সাহেব কলকাতায় মেয়েদের প্রথম স্কুল স্থাপন করেছিলেন ১৮৪৯ সনের ৭ই মে। বেথুন সাহেবকে একখানি পত্রে তিনি স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে তাঁর অভিমত এবং ত্রিশ বৎসর যাবৎ এই উদ্দেশ্যে তিনি কি কি করেছেন তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন (২০শে মার্চ, ১৮৫১)। সে পত্রে তিনি বলেন, 'আপনি যে মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে এতটা প্রয়াসী হইয়াছেন, সে সম্বন্ধে আমার অভিমত সম্পর্কে বিপরীত ধারনা দূর করিবার জন্য আমি এই সুযোগে

বলিয়া রাখি যে, আমি নিজে এতকাল উপদেশ ও কর্মের দ্বারা দেখাইয়াছি যে আমি স্ত্রীশিক্ষার একজন প্রধান উদ্যোক্তা। জাতির নৈতিক চরিত্র ও সামাজিক সুখ বৃদ্ধির পক্ষে স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা যে কত অধিক তাহা এখন আর ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে হইবে না।[৪৪]

বেথুন স্কুল (ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল) প্রতিষ্ঠার সমকালে রাধাকান্ত দেব নিজ ভবনে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। এ বিদ্যালয় সম্পর্কে "সম্বাদ ভাস্কর" লেখেন 'কলিকাতা নগরে বালিকাদের শিক্ষার্থ দ্বিতীয় বিদ্যালয়। আমরা শ্রবণ করিলাম শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর তাঁহার বাটীতে স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার্থ এক পাঠশালা সংস্থাপন করিয়াছেন। সংস্কৃত কলেজের একজন ছাত্র ভদ্র বালিকাগণকে ইংরাজী, বাংলা, উভয় ভাষায় শিক্ষাদান করিতেছেন।[৩৪]

ডঃ নিমাই সাধন বোস বলেছেন রাধাকান্ত দেবের শিক্ষাচিন্তা তাঁর বাস্তব ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বহন করেছে। ইংরেজী শিক্ষা ছাড়াও, রাধাকান্ত জনগণের বাংলার শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। রাধাকান্ত লিখেছেন 'যখন দেশের জনগণ ভালমত বাংলা শিক্ষা লাভ করবে, তখন, দেশে কৃষি ও কারিগরী বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে যেখানে শিক্ষালাভ করে জনগণ সমাজের উপযোগী সদস্য হতে পারে।' তিনি সেই শিক্ষা ব্যবস্থার বিবেচনাহীন প্রবর্তনের বিরুদ্ধে আমাদের সচেতন করে দিয়েছেন যার ফলে ভাসা-ভাসা ইংরেজী বিদ্যা সম্বল করে দেশের যুবকরা কৃষি, বয়ন শিল্প প্রভৃতির প্রতি বিমুখ হয়ে সরকারী ও সওদাগরী অফিসে কেরানীগিরির জন্য লালায়িত হবে এবং তাদের অধিকাংশ ঐ জাতীয় চাকরী না পেয়ে, নিজেদের স্বল্প ইংরেজী বিদ্যার অহংকারের জন্য নিজ নিজ বৃত্তি অবলম্বন করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত বেকারে পরিণত হবে।[৩৫]

দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫)

রামমোহনকে ধর্মীয় ব্যাপারে বিচিত্র প্রতিপক্ষের সঙ্গে তর্ক যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল কিন্তু তাঁর উত্তরসাধক দেবেন্দ্রনাথের সমস্যা ছিল ভিন্নতর। ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্যশিক্ষা ও সংস্কৃতির আমদানির ফলে দেশের কৃতী সন্তানরা হিন্দু ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থাকে সর্বথা দূষনীয় মনে করছিলেন, সাগ্রহে খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করছিলেন এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি

বীতরাগ হচ্ছিলেন। ১৮৩০ এর পূর্ব পর্যন্ত এই প্রতিকূল পরিস্থিতি কোনক্রমে সহনীয় ছিল, কিন্তু ১৮৩০ সালে স্কটল্যাণ্ডের পাদ্রী আলেকজাণ্ডার ডাফ্ এদেশে আসবার পর পরিস্থিতি অসহনীয় হল। ডাফ্ প্রভৃতি মিশনারীরা প্রকাশ্যে হিন্দু ধর্মকে আক্রমণ করে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচার শুরু করলেন। 'বহু কৃতী বঙ্গসন্তান খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলেন। এঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়, মহেশ চন্দ্র ঘোষ, মধুসূদন দত্ত, জ্ঞানেন্দ্র মোহন ঠাকুর, লালবিহারী দে প্রভৃতি'।[৩৬]

এ পরিস্থিতি প্রতিরোধ করবার জন্য দেবেন্দ্রনাথ মিশনারীদের সঙ্গে সমান্তরাল কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন।

১৮৩০ সনে ডাফ্ সাহেব এদেশে এসে দেখলেন যে মিশনারীদের প্রাথমিক স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা হতাশাজনক এবং যাদের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা দেওয়া হয়েছে তারা হয় অনাথ-অনাথা, নয়ত সমাজের একেবারেই নিম্নস্তরের মানুষ। ডাক্ ভাবলেন উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের জন্য ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষার ব্যবস্থা করলে তাঁদের স্বল্পায়াসে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করা যাবে।[৩৭]

১৮৩০ সনে তিনি কলকাতার বুকে জেনারেল অ্যাসেম্‌ব্লিজ ইন্সটিটিউশন স্থাপন করলেন। এই স্কুলে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য বিদ্যার চর্চা শুরু হল এবং বাইবেল পড়া আবশ্যিক হল।

ডাক্ সাহেব এদেশে আসবার পর থেকে মিশনারীরা নতুন উৎসাহে নানা বিদ্যালয় স্থাপন করে এদেশের ছেলেদের সংস্পর্শে এসে তাঁদের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা দিচ্ছিলেন এবং দেবেন্দ্রনাথও নিজ ব্যয়ে বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনা করে এবং স্বদেশবাসী দ্বারা স্থাপিত অন্যান্য বিদ্যালয়কে আর্থিক সহায়তা করে মিশনারীদের কবল থেকে হিন্দুদের রক্ষা করবার চেষ্টা করেছিলেন। ১৮৪৪ সনের পূর্ব পর্যন্ত এই ভাবে হিন্দু খ্রীষ্টান বিরোধ চলছিল। কিন্তু প্রত্যক্ষ সংঘাত ঘটেনি। ইতিমধ্যে পাদ্রী ডাফ্ "India and the Indian Missions" নামক পুস্তক প্রকাশ করেন। এ পুস্তকে তিনি হিন্দু ধর্ম ও বেদান্তের প্রভূত নিন্দা করেন। এ নিন্দায় ক্ষুব্ধ হয়ে দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে (সেপ্টেম্বর ১৮৪৪ এবং জানুয়ারী, জুলাই ও সেপ্টেম্বর ১৮৪৫) ঐ পুস্তকের এবং খ্রীষ্টীয় বিভিন্ন পত্রিকাগুলির আক্রমণের চারটি প্রতিবাদ প্রকাশ করেন। ১৮৪৫ সনে ঐ চারটি প্রবন্ধ থেকে সংকলিত Vedantic Doctrines

Vindicated' নামক পুস্তক প্রকাশ করেন।

এই সব বাদ প্রতিবাদের মধ্যে আর একটি ঘটনা ঘটল। ১৮৪৫ সনের এপ্রিল মাসে ডাফ্ সাহেব অভিভাবকদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও তাঁর স্কুলের ১৪ বছর বয়স্ক উমেশ চন্দ্র সরকার ও তার ১১ বছর বয়সের বালিকা পত্নীকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন।[88]

দেবেন্দ্রনাথ আত্মজীবনীতে লিখছেন, "ইহা শুনিয়া আমার বড়ই রাগ হইল ও দুঃখ হইল। অন্তঃপুরের স্ত্রীলোক পর্যন্ত খ্রীষ্টান করিতে লাগিল। তবে রোস্, আমি ইহার প্রতিবিধান করিতেছি। এই বলিয়া আমি উঠিয়া পড়িলাম। আমি তখনই শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার দত্তের লেখনীকে চালাইলাম এবং একটি তেজস্বী প্রবন্ধ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশ হইল। ***শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার দত্তের প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশ হইল, আর আমি তাহার পরে প্রতিদিন গাড়ী করিয়া প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কলিকাতার সকল সম্ভ্রান্ত ও মান্য লোকদিগের নিকটে যাইয়া তাহাদিগকে অনুরোধ করিতে লাগিলাম যে, হিন্দু সন্তানদিগের যাহাতে পাদ্রীদের বিদ্যালয়ে যাইতে আর না হয় এবং আমাদের নিজের বিদ্যালয়ে তাহারা পড়িতে পারে তাহার উপায় বিধান করিতে হইবে। এদিকে রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, ওদিকে রামগোপাল ঘোষ, আমি সকলের নিকট গিয়া সকলকেই উত্তেজিত করিতে লাগিলাম।**** ১৩ই জ্যৈষ্ঠ আমাদের একটা মহাসভা হইল। সভাতে প্রায় সহস্র ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই সভা হইতে 'হিন্দু হিতার্থী' নামে একটা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইল এবং তাহার কর্মসম্পাদন জন্য শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর সভাপতি হইলেন, আমি ও হরিমোহন সেন সম্পাদক হইলাম। এই অবৈতনিক বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষক শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় নিযুক্ত হন। সেই অবধি খ্রীষ্টান হইবার স্রোত মন্দীভূত হইল, একেবারে মিশনারীদিগের মস্তকে কুঠারাঘাত পড়িল।'[89]

তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা এবং হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা একদিকে যেমন বাঙালীর জন্য দেবেন্দ্রনাথের শিক্ষাভাবনা ও শিক্ষা প্রচেষ্টার উদাহরণ, অন্যদিকে খ্রীষ্টধর্ম প্রতিরোধ প্রচেষ্টারও অন্যতম উদাহরণ। কিন্তু বাঙালীর শিক্ষা ব্যাপারে দেবেন্দ্রনাথের অবদানের এখানেই শেষ নয়। বিভিন্ন এবং বিচিত্র ক্ষেত্রে তাঁর শিক্ষা ভাবনা ও শিক্ষাবদানের স্বাক্ষর বিদ্যমান।

দেবেন্দ্রনাথের বয়স যখন পনর বছর, তখন তিনি এবং তাঁর সঙ্গীরা ১৮৩২ সনে কলকাতায় সর্বতত্ত্ব দীপিকা সভা স্থাপন করেন। ১৮৩২ সনে প্রতিষ্ঠিত অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েসন সে যুগে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালীর সর্বাগ্রগন্য সংস্থা, কিন্তু সেখানে সব চর্চাই হত ইংরাজীতে। সর্বতত্ত্ব দীপিকা সভা 'গৌড়ীয় ভাষা উত্তমরূপে অর্চনার্থ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর লক্ষ্য সম্পর্কে বলা হয় যে সেখানে 'উত্তমরূপে স্বদেশীয় বিদ্যার আলোচনা হইতে পারিবেক।'[40]

বাংলা ভাষার উন্নতির জন্য দেবেন্দ্রনাথের ব্যাকুলতার আর একটি বিশিষ্ট নিদর্শন পাই তাঁর 'বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের' সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের মধ্যে। ১৮৫০ সনের ডিসেম্বর মাসে এই সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। উদ্দেশ্য 'ট্রাষ্ট সোসাইটির, কিম্বা খ্রীষ্টান নলেজ সোসাইটি, কি স্কুল বুক সোসাইটি যে সকল পুস্তক প্রকাশ করিতে পারে না, তাহা উক্ত কমিটির সাহেবরা প্রকাশ করিবেন।'[40]

দেবেন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই এই সভার সঙ্গে যুক্ত হন। ১৮৬২ সনে এই সভা কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটির সঙ্গে মিলিত হয়।

বাঙালীর নবজাগরণের যুগে দেবেন্দ্রনাথ শুধু বাংলা ভাষার উন্নতি বিধান বা বাঙালীর জীবনে তার মাতৃভাষা বাংলাকে প্রতিষ্ঠা দান করাবার চেষ্টা করেই ক্ষান্ত হননি, বাঙালীর বিজ্ঞান চর্চার ব্যাপারেও তিনি যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন। তিনি সীতানাথ ঘোষ মহাশয়কে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য সাতশত টাকা দিয়েছিলেন এবং ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়কে তাঁর 'অ্যাসোসিয়েসন ফর দি কালটিভেশন অব্ সায়েন্স' ব্যাপারে অকুণ্ঠ অর্থ সাহায্য করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে দেবেন্দ্রনাথ 'জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি' নামে ১৮৯৩ সনে একটি পুস্তক প্রকাশ করেছিলেন। তাতে তিনি জোতির্বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, অভিব্যক্তিবাদ প্রভৃতি আলোচনা করেছেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্ব পরিচয়' পুস্তকে যে কাজ জাতীয় শিক্ষার জন্য করেছেন, দেবেন্দ্রনাথ সেই কাজ করেছিলেন উপরোক্ত পুস্তক রচনার মাধ্যমে।

উপরের আলোচনায় দেবেন্দ্রনাথের বিভিন্ন শিক্ষা প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া গেল, কিন্তু শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মনন ও গভীর বোধের পরিচয় পাই, প্রথমতঃ তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার পরিকল্পনা ও রূপায়ণে আর দ্বিতীয়তঃ

বাংলার ছোটলাট পীটার গ্রাণ্টকে লেখা তাঁর পত্রে। তত্ত্ববোধিনী পাঠশালাকে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রয়াস বলা যেতে পারে। অন্যদিকে, পীটার গ্রান্টকে লেখা পত্রে (৮ই আগষ্ট, ১৮৫৯) এদেশে জনশিক্ষা তথা স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে দেবেন্দ্রনাথ তাঁর গভীর ও স্বচ্ছ চিন্তার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেছেন। ১৮৫৯, ৭ই মে ভারত সরকারের নির্দেশে বাংলার ছোটলাট জন পীটার গ্রাণ্ট রাজা রাধাকান্ত দেব, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তির মতামত আহ্বান করেন। পীটার গ্রাণ্টের পত্রের উত্তরে দেবেন্দ্রনাথ ১৮৫৯ সনের ৮ই আগষ্ট, এক দীর্ঘ ইংরেজী পত্রে বাংলা দেশে জনশিক্ষা সম্পর্কে যে মত ব্যক্ত করেন তার সারমর্ম নীচে দেওয়া হল।[42]

আমার মনে হয় বর্তমান অবস্থায় জনশিক্ষার উন্নতি ও প্রসারের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে দেশীয় পাঠশালাগুলির উন্নতি বিধান এবং এ সম্পর্কে সবচেয়ে উপযোগী ব্যবস্থা হবে ডেভিড হেয়ার মহাশয়ের পরিচালনায় কলকাতার স্কুলে সোসাইটি জনশিক্ষার জন্য যে পন্থা অবলম্বন করেছিলেন তার অনুসরণ।

প্রথমতঃ, শিক্ষকগণ যাতে নিজ নিজ অধ্যয়ন দ্বারা শিক্ষণ ব্যাপারে পারদর্শিতা বাড়াতে পারেন সেজন্য তাঁদের উৎসাহিত করা এবং শ্রমের পুরস্কার সম্পর্কে তাঁদের নিশ্চিত আশ্বাস দেওয়া।

দ্বিতীয়তঃ, ছেলেদের লেখাপড়ায় উৎসাহিত করা এবং শিক্ষা বিষয়ে তাদের পারদর্শিতাকে যথারীতি পুরস্কৃত করা।

তৃতীয়তঃ, ছাত্রদের মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় সম্বলিত পাঠ্য পুস্তক ও তৎসহ আনন্দবিধায়ক পুস্তক বিতরণ করা।

উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলির সঙ্গে শিক্ষকদের শিক্ষণ বিষয়ে পারদর্শী করে তোলার জন্য একটি শিক্ষণ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাও করতে হবে।

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার উপযুক্ত পুস্তকের অভাব আছে এবং উপযুক্ত পুস্তকের অভাবের জন্যই দেশে জনশিক্ষা বিস্তার লাভ করতে পারছে না। এজন্য যথোপযুক্ত পুস্তক রচনা প্রয়োজন। প্রাথমিক শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য উপযোগী পুস্তক রচনার ব্যাপারে 'স্কটিশ স্কুল বুক অ্যাসোসিয়েশন' বা গ্রেট বৃটেনের ঐ জাতীয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে অনুসরণ করা কর্তব্য।

বাংলাদেশে যে সব বাংলা বিদ্যালয় এবং ইংরেজী বিদ্যালয় আছে সেগুলিকে অবলম্বন করেই পাঠশালার শিক্ষক মশায়দের জন্য প্রয়োজনীয়

শিক্ষা ব্যবস্থা করা সম্ভব।

উৎসাহ পেলে এবং উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা হলে বাংলা বিদ্যালয় এবং ইংরেজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক মশায়দের দিয়ে পাঠশালার উপযুক্ত বই লিখিয়ে নেওয়া যেতে পারে। এঁদের দেশীয় পাঠশালা পরিদর্শনের কাজেও নিযুক্ত করা যেতে পারে।

পাঠশালার পাঠক্রমে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রয়োজন: পড়ালেখা ও বানান শেখা, সরল পাটীগণিত এবং ক্ষেত্র পরিমাপ বিদ্যা, পত্র লিখন, কৃষি ও ব্যবসা সম্পর্কিত হিসাব রক্ষা পদ্ধতি, প্রাথমিক কৃষি বিজ্ঞান, সম্পত্তি সম্পর্কিত আইনের প্রাথমিক জ্ঞান, প্রাথমিক ভূগোল, ইতিহাস এবং ব্যবহারিক নীতিজ্ঞান।

অতঃপর দেবেন্দ্রনাথ বাংলা দেশের তিন শ্রেণীর লোকের কথা বলছেন, যারা নিজ সন্তানদের শিক্ষা সম্পর্কে উদাসীন।

প্রথম হচ্ছে যারা নিজেরা লেখাপড়া জানে না, দ্বিতীয় হচ্ছে যারা এত দরিদ্র যে ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যয় বহন করতে অসমর্থ এবং তৃতীয় হচ্ছে যারা ভাবে যে লেখাপড়া শিখলে তাদের সন্তানদের নিজ ধর্ম সম্বন্ধে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হবে।

উপরোক্ত তিন শ্রেণীর বঙ্গবাসীকে নিজের নিজের সন্তানের শিক্ষা সম্পর্কে আগ্রহশীল করতে হলে নিম্নমত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। প্রথমতঃ, তাদের ছেলেদের এমন শিক্ষা দিতে হবে যে-শিক্ষা ছাত্রদের কর্মজীবনে প্রয়োজনীয় প্রতিপন্ন হয়। দ্বিতীয়তঃ যারা সন্তান শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করতে অসমর্থ তাদের সন্তানদের বিনা বেতনে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। তৃতীয়ত, সম্প্রদায়গত ধর্মশিক্ষা স্কুলে পরিহার করতে হবে। অবশ্য নীতি শিক্ষাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে।

অতঃপর তিনি আরেক শ্রেণী লোকের কথা আলোচনা করেছেন যারা স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী। এরা মনে করে মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো নিষ্প্রয়োজন অথবা সামাজিক ও নৈতিক কারণে অনুচিত। এরা ভাবে লেখাপড়া শিখালে মেয়েরা বিবাহিত জীবনে অসুখী হয়। মেয়েদের লেখাপড়া সম্পর্কে এসব আপত্তি পুরুষদের অজ্ঞতারই ফল। স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে দেশবাসীর এইসব কুসংস্কার জনসাধারণের মাঝে শিক্ষাবিস্তার হলে যথাসময়ে অবশ্যই দূর হয়ে যাবে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)

১৮৪১ সনের ডিসেম্বর মাসে একুশ বছর বয়সে বিদ্যাসাগর ফোর্টউইলিয়াম কলেজের প্রধান পণ্ডিত হন। তারপর ১৮৪৬ সনের ৬ই এপ্রিল তিনি সংস্কৃত কলেজে সরকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৮৪৬-৫৮ এই দীর্ঘ বার বছরের মধ্যে ন'বছর বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এই ন'বছরে তিনি চারটি শিক্ষা পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করেন।

(ক) ১৮৪৬ সনে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক থাকার সময় প্রথম পরিকল্পনা। এই সংস্কার পরিকল্পনা তিনি দিয়েছিলেন সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক রসময় দত্ত মহাশয়কে।

(খ) ১৮৫০ এর ১৬ই ডিসেম্বর—সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক থাকাকালীন কাউন্সিল অব এডুকেশন এর সম্পাদক মোয়াট্ এবং সভাপতি বেথুনের অনুরোধে দ্বিতীয় পরিকল্পনা।

(গ) ১৮৫২ সনে, সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষ থাকা কালে, তৃতীয় পরিকল্পনা।

(ঘ) ১৮৫৩ সনের সেপ্টেম্বর মাসে ব্যালেণ্টাইনের সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন রিপোর্টের আলোচনা প্রসঙ্গে চতুর্থ পরিকল্পনা।

প্রথম পরিকল্পনায় বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ব্যাকরণের পাঠ্য ও পাঠন প্রণালী ও সাহিত্য শ্রেণীর পাঠ্য পরিবর্তনের কথা বলেছেন এবং সেই সঙ্গে ইংরেজী বিভাগের পাঠ্য ও পাঠন প্রণালীর আমূল সংস্কারের প্রস্তাব করেছেন। পরিকল্পনার উদ্দেশ্য তিনি উপসংহারে ব্যক্ত করেছেন।

পরিকল্পনার উপসংহারে বিদ্যাসাগরের বক্তব্য হচ্ছে : সংস্কৃত কলেজের কার্যক্রম তিনি সযত্নে লক্ষ্য করেছেন। যে প্রস্তাব তিনি করেছেন তার উদ্দেশ্য ছাত্রদের শিক্ষায় যথাসম্ভব সংস্কৃত ও ইংরেজী বিদ্যার সমন্বয় সাধন করা। কারণ তাঁর ধারনা, এ ধরণের শিক্ষায় এমন সব ছাত্র তৈরী হবে যারা বাংলা ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি পরিবেশন করে বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করে তুলতে পারবে।[43]

১৮৫০ সনের ১৬ই ডিসেম্বর বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক হিসাবে শিক্ষা কাউন্সিলের সম্পাদক মোয়াট সাহেবকে একটি রিপোর্ট পাঠান। এই রিপোর্টে তিনি ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলংকার, জ্যোতিষ, স্মৃতি, ন্যায়, ইংরেজী প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগের পাঠ্য ও পাঠন সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেন। ইংরেজী পঠন-পাঠন সম্বন্ধে তাঁর

অভিমত হল—ইংরেজী চর্চা ঐচ্ছিক না রেখে আবশ্যিক করতে হবে এবং ইংরেজী পড়া অলংকার শ্রেণীতেই শুরু করতে হবে। অলংকার শ্রেণী থেকে কলেজের সর্বশেষ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনার সাত আট বছর সময় লাগে। যে কোন পরিশ্রমী ছাত্র এই সময়ে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি অর্জনের যথেষ্ট সুযোগ পাবে।

রিপোর্টের শেষে তিনি বলছেন যে—তাঁর প্রস্তাবিত সংস্কারগুলি যদি কাউন্সিল প্রবর্তন করেন, তবে পুনর্গঠিত সংস্কৃত কলেজ অবশ্যই প্রকৃত সংস্কৃত বিদ্যানুশীলনের কেন্দ্র হয়ে উঠবে, উন্নত বাংলা সাহিত্যের জন্ম ক্ষেত্র হবে এবং এই কলেজের ছাত্ররাই শিক্ষকরূপে দেশের জনসাধারণের মধ্যে ঐ সাহিত্যের মাধ্যমে জ্ঞান ও সাহিত্য রস বিতরণ করবে।[44]

১৮৫২ সনে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ থাকার সময় ঈশ্বরচন্দ্র ২৬টি অনুচ্ছেদ সম্বলিত একটি শিক্ষা পরিকল্পনা রচনা করেন—"**Notes on the Sanskrit College**" শিরোনামে। রচনার তারিখ ১২ই এপ্রিল ১৮৫২। এই নোট্‌স্-এর পাঁচটি পরিচ্ছেদেই বিদ্যাসাগর তাঁর মূল বক্তব্য পরিচ্ছন্ন ভাবে বলেছেন। তিনি লিখেছেন বাংলাদেশে শিক্ষাব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত উন্নত বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি করা। যাঁরা দস্তুরমত ইংরেজী জানেন না, ইংরেজী ভাষায় বিধৃত পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিদ্যা আহরণ করতে বা সেগুলিকে প্রাঞ্জল বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে অক্ষম তাঁরা এ সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারবেন না। আবার যাঁরা সংস্কৃতে প্রকৃত ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন নি তারাও বাংলা ভাষায় সুসাহিত্য সৃষ্টি করতে পারবেন না। এই জন্যই সংস্কৃতে যাঁরা পারদর্শী তাঁদের ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যেও পারদর্শিতা অর্জন করা প্রয়োজন। এজন্য তিনি মনে করেন সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের ইংরেজী সাহিত্য ভালভাবে শেখালে তারাই উন্নত বাংলা সাহিত্যের সার্থক রচয়িতা হতে পারবে।[45]

চতুর্থ পরিকল্পনাটি হল ব্যালেন্টাইনের সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন রিপোর্টের আলোচনা প্রসঙ্গে। মোয়াট্ সাহেবের পত্রের উত্তরে ১৮৫৩ সনের ৭ই ডিসেম্বর ব্যালেন্টাইন রিপোর্টের আলোচনা প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর লিখেন,—"জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার আমাদের প্রথম প্রয়োজন। আমাদের কতগুলি বাংলা বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। এই সব বিদ্যালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে কতগুলি পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে হবে এবং শিক্ষকের

দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে পারে এমন একদল লোক তৈরী করতে হবে—তাহলেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে। শিক্ষকরা মাতৃভাষায় সুশিক্ষিত হবেন, বিভিন্ন বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করবেন এবং দেশের প্রচলিত কুসংস্কার থেকে মুক্ত থাকবেন। এধরনের একশ্রেণীর শিক্ষক গড়ে তোলাই আমার জীবনের লক্ষ্য এবং সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা সংস্কার ব্যাপারে আমি আমার সমস্ত উদ্যম এই উদ্দেশ্য নিয়োজিত করতে চাই।'[45]

বিদ্যাসাগরের উপরোক্ত শিক্ষা পরিকল্পনাগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধন তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল। তিনি বুঝেছিলেন, এ লক্ষ্যে পৌছতে হলে বাঙালীকে সংস্কৃত ও ইংরেজীর, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য বিদ্যার, সমান অনুশীলনে মনোযোগী হতে হবে।

হাজার হাজার বছর ধরে সঞ্চিত সংস্কৃত সাহিত্যের জ্ঞান ভাণ্ডারের সঙ্গে ইংরেজী ভাষায় বিধৃত পাশ্চাত্যের জ্ঞান সম্পদের সংযোগ সাধন করে নতুন যুগের বাংলা সাহিত্যের বুনিয়াদ তিনি রচনা করতে চেয়েছিলেন। তাঁর ঈপ্সিত বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি কেবল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বা কেবল ইংরেজীবিদ দিয়ে সম্ভব নয়। তাঁর পরিকল্পনাগুলির বাস্তব রূপায়ণের ক্ষেত্র ছিল সংস্কৃত কলেজ। সংস্কৃত কলেজকে তিনি দেশীয় টোল চতুস্পাঠীতে রূপায়িত করতে চাননি, আবার দ্বিতীয় এক হিন্দু কলেজও তৈরী করতে চাননি। সংস্কৃত কলেজকে তিনি প্রাচ্য প্রতীচ্যের বিদ্যা ও সংস্কৃতির মিলন ক্ষেত্র করতে চেয়েছিলেন।

১৮৫৪ সনে বাংলাদেশের প্রথম ছোট লাট হন ফ্রেডারিক হ্যালিডে। তিনি ছোট লাট হবার দু'মাস আগে কাউন্সিল অব্ এডুকেশনের সদস্য হিসাবে বাংলা শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর মতামত একটি মিনিটে ব্যক্ত করেন। এই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় হ্যালিডের অনুরোধে বাংলা শিক্ষা সম্বন্ধে একটি পরিকল্পনা তৈরী করেন ৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৪।

বিদ্যাসাগরের পরিকল্পনার মূল কথাগুলি হল :—

১। বাংলা শিক্ষার সুব্যবস্থা ও বিস্তার একান্ত প্রয়োজনীয়। তা নাহলে দেশের জনসাধারণের কল্যাণ হবে না।

২। কেবল লিখন, পঠন, গণনা ও সরল অঙ্ক কষার মধ্যে বাংলা শিক্ষা সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। যতদূর সম্ভব বাংলা ভাষাতেই সম্পূর্ণ শিক্ষা দিতে হবে এবং তার জন্য ভূগোল, ইতিহাস, জীবন চরিত, পাটীগণিত,

জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা; নীতিবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও শরীরতত্ত্ব বাংলায় শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।

৩। প্রকাশিত বই এর মধ্যে এই বইগুলি প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তক রূপে গ্রহণযোগ্য—(ক) শিশুশিক্ষা (পাঁচভাগ)। প্রথম তিন ভাগে আছে বর্ণপরিচয়, বানান ও পঠন শিক্ষা। চতুর্থ ভাগ—জ্ঞানোদয় বিষয়ে একখানি ছোট বই। পঞ্চম ভাগ—চেম্বার্স এডুকেশনাল কোর্স এর অন্তর্গত নীতি পাঠ পুস্তকের ভাবানুবাদ। (খ) পশ্বাবলী—অর্থাৎ জীবজন্তুর বিবরণ। (গ) বাংলার ইতিহাস—মার্শম্যানের পুস্তকের ভাবানুবাদ (ঘ) চারুপাঠ অথবা প্রয়োজনীয় ও আকর্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে পাঠমালা। (ঙ) জীবন চরিত চেম্বার্স বায়োগ্রাফির অন্তর্গত কোপার্নিকাস্, গ্যালিলিও, নিউটন, হার্শ্যাল, লিনিয়স, ডুবাল, উইলিয়ম, জোন্স, টমাস জেঙ্কিন্স প্রমুখ বিজ্ঞানীদের জীবনীর ভাবানুবাদ।

৪। পাটীগণিত, জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা ও নীতিবিজ্ঞানের বইও লেখা হয়েছে। ভূগোল, রাজনীতি, শরীরবিজ্ঞান, ইতিহাস এবং কতকগুলি ধারাবাহিক জীবন চরিত এখনও রচনা করতে হবে। বর্তমানে ভারতবর্ষ গ্রীস, রোম ও ইংলণ্ডের ইতিহাস হলেই চলবে।

৫। একজন শিক্ষক হলে চলবে না। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে দু'জন করে শিক্ষক দরকার। স্কুল গুলিতে সম্ভব হলে তিনটি থেকে পাঁচটি শ্রেণী থাকবে। কাজেই একজন শিক্ষক দ্বারা শৃঙ্খলার সঙ্গে কাজ চলবে না।

৬। যাতায়াতের ব্যয় সমেত মাসিক ১৫০্ টাকা বেতনে দু'জন বাঙালী পরিদর্শক নিয়োগ করা প্রয়োজন। একজন মেদিনীপুর ও হুগলীর জন্য আর একজন নদীয়া ও বর্ধমানের জন্য। তাঁদের কাজ হবে ঘন ঘন স্কুলগুলি পরিদর্শন করা। স্কুলের প্রত্যেক শ্রেণীর ছাত্রদের পরীক্ষা নেওয়া এবং প্রয়োজন মত শিক্ষা প্রণালী সংস্কার করা।

৭। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ প্রধান পরিদর্শক নিযুক্ত হবেন। বছরে তিনি অন্ততঃ একবার স্কুলগুলি পরিদর্শন করবেন এবং কর্তৃপক্ষকে একটি রিপোর্ট দিবেন। কর্তৃপক্ষের উপরই বাংলা স্কুলগুলির পরিচালনার ভার ন্যস্ত থাকবে।

৮। সংস্কৃত কলেজ সাধারণ শিক্ষার কেন্দ্র হয়েও বাংলা শিক্ষক গড়ে তোলার জন্য 'নর্মাল স্কুল' রূপেও কাজ করবে।[47]

১৮৫৫ ১লা মে থেকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর দক্ষিণ বাংলার সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শকও নিযুক্ত হয়েছিলেন।

বাংলা শিক্ষাক্ষেত্রে সে সময় দু'টি অন্তরায় ছিল। প্রথম অন্তরায় বাংলা ভাষার ভালো পাঠ্যপুস্তকের অভাব এবং দ্বিতীয় অন্তরায় উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব। ১৮৫৫-এর ২রা জুলাই বিদ্যাসাগর ডি. পি. আই এর নিকট এক পত্রে বাংলা স্কুলের শিক্ষকদের জন্য একটি শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় (নর্মাল স্কুল) স্থাপনের প্রস্তাব করেন। বাংলা সরকার এবং ডি. পি. আই. উভয়েই বিদ্যাসাগরের নর্মাল স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব অনুমোদন করলেন। বিদ্যাসাগরের প্রস্তাব অনুসারে অক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয় নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হলেন। ১৮৫৫, ১৭ই জুলাই থেকে বিদ্যাসাগরের তত্বাবধানে নর্মাল স্কুল খোলা হয়। নর্মাল স্কুলে ১৭ বছরের কম অথবা ৪৫ বছরের বেশী বয়সের ছাত্র ভর্তি করা হত না। 'বোধোদয়', 'নীতিবোধ', 'শকুন্তলা', 'কাদম্বরী', 'চারুপাঠ', 'ভূ-বিদ্যা', 'পদার্থবিদ্যা', জীববিদ্যা প্রভৃতি ছাত্রদের পড়ানো হত। মাসে মাসে পরীক্ষা হত এবং অমনোযোগী ও অক্ষম ছাত্রদের বাদ দেওয়া হত। কৃতী ছাত্রদের নিয়োগ করা হত শিক্ষকের কাজে।

দক্ষিণ বাংলার সহকারী স্কুল পরিদর্শক হিসাবে ১৮৫৫ সনের আগষ্ট থেকে ১৮৫৬ সনের জানুয়ারীর মধ্যে বিদ্যাসাগর তাঁর এলাকার প্রত্যেক জেলায় পাঁচটি করে স্কুল স্থাপন করেন। বর্ধমান জেলায়—আমোদপুর, জৌগ্রাম, খণ্ডঘোষ, মানকর, দাঁইহাট ; হুগলী জেলায়—হারোপ, নিয়াখালা, কৃষ্ণনগর, কামারপুকুর, ক্ষীরপাই ; মেদিনীপুর জেলায়—গোপালনগর, বাসুদেবপুর, মালঞ্চ, প্রতাপপুর, জকপুর; নদীয়া জেলায়—বেলঘরিয়া, মহেশপুর, ভজনঘাট কুশদহ বা খাটুয়া, দেবগ্রাম। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের জন্য মাসে পঞ্চাশ টাকা খরচ হত। গ্রামবাসীরা নিজেরা বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণের ব্যয় বহন করতেন।

স্ত্রীশিক্ষা : বাঙালীর শিক্ষা ব্যবস্থায় ঈশ্বরচন্দ্রের তিনটি **প্রকৃষ্ট কীর্তি :** তিনি সংস্কৃত বিদ্যার সঙ্গে ইংরেজী ভাষা সাহিত্য ও আধুনিক পাশ্চাত্য বিদ্যার সংযোগ স্থাপন করেছিলেন, বাংলা শিক্ষার সংস্কার ও বহুল প্রচলন করেছিলেন এবং স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ও প্রসার করেছিলেন।

১৮৪৯-৫০ সনে বেথুনের অন্যতম সহযোগী হিসাবে বিদ্যাসাগর বঙ্গদেশে স্ত্রী শিক্ষার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। বেথুন বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ৭ই মে ১৮৪৯ আর ১৮৫০ সনের ডিসেম্বর থেকে ঈশ্বরচন্দ্র ঐ বালিকা বিদ্যালয়ের

অবৈতনিক সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন।

কলকাতা শহরে বেথুন স্কুলই প্রথম ধর্ম নিরপেক্ষ বালিকা বিদ্যালয়। অবৈতনিক সম্পাদক নিযুক্ত হওয়ার পর বিদ্যাসাগর বন্ধু বান্ধব ও পরিচিত ভদ্রলোকদের বেথুন স্কুলে নিজ নিজ কন্যাদের পড়তে দেবার জন্য অনুরোধ করেন। বিদ্যাসাগরের অনুরোধের ফলেই পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি, শম্ভুনাথ পণ্ডিত, হরদেব চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের কন্যারা এখানে ভর্ত্তি হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা সৌদামিনীকে এখানে ভর্তি করে দেন। পণ্ডিত মদনমোহনের দুই মেয়ে ভুবনমালা ও কুন্দমালা প্রতিষ্ঠাবধি বেথুন স্কুলের ছাত্রী ছিলেন।[৪৮]

১৮৫৬ সনের মার্চ মাসে ডালহাউসি ভারতবর্ষ ত্যাগ করলে বেথুন স্কুলের ভার নিলেন ভারত সরকার। সরকার বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য একটি কমিটি গঠন করলেন এবং সেই কমিটির সম্পাদক হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিদ্যালয়টির পুনর্গঠন সম্পর্কে সম্পাদক বিদ্যাসাগর ১৮৫৬ সনের ২৪শে ডিসেম্বর একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন। বিজ্ঞপ্তিটি 'সংবাদ প্রভাকরে' (১৩ই জানুয়ারী, ১৮৫৭) প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞপ্তিতে অবশ্য অন্যান্য সদস্যগণেরও স্বাক্ষর ছিল। এই বিজ্ঞপ্তিতে বিদ্যাসাগর বলেছেন—"***হিন্দুজাতীয় স্ত্রীলোকদিগের যথোপযুক্ত বিদ্যাশিক্ষা হইলে, হিন্দুসমাজের ও এতদ্দেশের কত উপকার হইবে, তদ্বিষয়ে অধিক উল্লেখ করা অনাবশ্যক। যাঁহাদের অন্তঃকরণ জ্ঞানলোক দ্বারা প্রদীপ্ত হইয়াছে, তাহারা অবশ্যই বুঝিতে পারেন ইহা কত প্রার্থনীয় যে যাঁহার সহিত যাবজ্জীবন সহবাস করিতে হয় সেই স্ত্রী সুশিক্ষিত ও জ্ঞানসম্পন্ন হন এবং শিশু সন্তানদিগকে শিক্ষা দিতে পারেন আর স্ত্রীও কন্যাগণের মনোবৃত্তি প্রকৃতরূপে মার্জিত হইয়া অকিঞ্চিৎকর কার্যের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ থাকে এবং যে সকল কার্যের অনুষ্ঠানে বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি ও পরিশুদ্ধি হইতে পারে তাহাতে প্রবৃত্ত হয়।

"অতএব আমরা এতদ্দেশীয় মহাশয়দিগকে অনুরোধ করিতেছি এই সকল গুরুতর উদ্দেশ্য সাধনের যে উপায় নিরূপিত হইয়াছে, সেই উপায় অবলম্বন করিয়া তাহার ফলভাগী হউন। এই সকল উদ্দেশ্য সাধন হিন্দু-ধর্মের অনুযায়ী ও হিন্দু সমাজের প্রকৃত মঙ্গল-সাধন।[৪৯]

বেথুন বিদ্যালয় সুপরিচালনা করে বিদ্যাসাগর শুধু বাঙলা তথা ভারতের প্রাণকেন্দ্র কলকাতার মধ্যবিত্ত সমাজে স্ত্রীশিক্ষার আগ্রহ উদ্দীপ্ত করেননি,

বাংলার পল্লী অঞ্চলেও স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন।

১৮৫৪ সালে উড সাহেবের ডেসপ্যাচে স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে সমর্থন জানানো হয়। বাংলার প্রথম ছোট লাট হ্যালিডে ১৮৫৭ সনের গোড়ার দিকে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে উদ্যোগী হলেন। এ বিষয়ে হ্যালিডের দক্ষিণ হস্ত ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। হ্যালিডের সঙ্গে কথাবার্তা এবং আলাপ আলোচনার উপর নির্ভর করে এবং বালিকা বিদ্যালয়গুলি সরকারী সাহায্য পাবে এই আশ্বাসে বিদ্যাসাগর পল্লী বাংলায় স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে অগ্রসর হলেন। নভেম্বর ১৮৫৭ থেকে মে ১৮৫৮ মধ্যে বিদ্যাসাগর হুগলীতে কুড়িটি, বর্ধমানে এগারটি, মেদিনীপুরে তিনটি এবং নদীয়ায় একটি মোট পঁয়ত্রিশটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করতে পেরেছিলেন।[৫০]

সংস্কৃত শিক্ষা : সংস্কৃত কলেজে বারো বছর পাঁচমাস অধ্যয়নের পর ১৮৪১ সনের ডিসেম্বর মাসে ঈশ্বরচন্দ্র "বিদ্যাসাগর" উপাধি নিয়ে কলেজের পাঠ সাঙ্গ করেন। দীর্ঘকাল সংস্কৃত কলেজের ছাত্র হিসাবে যে অসুবিধাগুলি তিনি বোধ করেছিলেন, কর্মজীবনে তিনি সংস্কৃত কলেজের সংস্পর্শে আসবার পর থেকেই সেগুলি দূর করবার জন্য নানা পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করেছেন। অবশেষে ১৮৫১ এর ২২শে জানুয়ারী থেকে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হওয়ার পর সংস্কৃত কলেজটিকে গৌড়জনের হিতার্থে মনের মত করে গড়ে তুলবার সুযোগ এবং অধিকার তিনি পেলেন। সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠন ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনের প্রধান সৎকর্ম এবং বাঙালী জাতির সংস্কৃতি জীবনে পুনর্গঠনের প্রভাব সুদূর প্রসারী।

সংস্কৃত কলেজে ব্রাহ্মণ বৈদ্যদের অধ্যয়নের অধিকার ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র অধ্যক্ষ হয়ে কয়েক মাসের মধ্যেই কলেজের দ্বার কায়স্থদের জন্য উন্মুক্ত করে দিলেন এবং ১৮৫৪ সনে ভদ্র হিন্দু মাত্রই সংস্কৃত কলেজে প্রবেশাধিকার পেল।

সংস্কৃত কলেজে এই অধিকার স্বীকৃত হওয়ার ফলে সমগ্র হিন্দু জাতি বিশেষ করে বাঙালী হিন্দুর আর্য সাহিত্য এবং শাস্ত্র অনুশীলনের পথ সুগম হল। সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররা তিন চার বছরের মধ্যে যাতে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান অর্জন করতে পারে তার জন্য বিদ্যাসাগর দিন রাত্রি কঠোর পরিশ্রম করে নিম্নলিখিত বইগুলি রচনা বা সংকলন করে প্রকাশ করলেন।

(১) সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা (নভেম্বর ১৮৫১) (২) ঋজু পাঠ

১ম ভাগ (নভেম্বর ১৮৫১), ঋজু পাঠ ২য় ভাগ (মার্চ, ১৮৫২), (৪) ঐ তৃতীয় ভাগ (ডিসেম্বর ১৮৫২) (৫) ব্যাকরণ কৌমুদী ১ম ভাগ (১৮৫৩), (৬) ঐ দ্বিতীয় ভাগ (১৮৫৩), (৭) ঐ তৃতীয় ভাগ (১৮৫৪) (৮) ঐ চতুর্থ ভাগ (১৮৬২)। এতগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা বা সংকলন করে ঈশ্বরচন্দ্র স্বদেশে সংস্কৃত চর্চার বিপুল সহায়তা করে গেছেন আর সেই সংগে আসন্ন ভবিষ্যতে এক পরমা শক্তিশালী বাংলা ভাষার আবির্ভাবের পথ ভগীরথের মত রচনা করে গেছেন।

১৮৭৩ সনে বিদ্যাসাগর বেথুন সোসাইটিতে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে ইংরাজী ও বাংলায় প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঐ প্রবন্ধের উপসংহারে ঈশ্বরচন্দ্র বললেন,—"*** সংস্কৃত ভাষানুশীলনের এক অতি প্রধান ফল এই যে, ইদানিন্তন কালে ভারতবর্ষে হিন্দী, বাংলা প্রভৃতি যে সকল ভাষা কথোপকথনে ও লৌকিক ব্যবহারে প্রচলিত আছে, সে সমুদায় অতি হীন অবস্থায় রহিয়াছে। ইহা এক প্রকার বিধিনির্বন্ধ স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে যে, ভূরি পরিমানে সংস্কৃত কথা লইয়া ঐ সকল ভাষায় সন্নিবেশিত না করিলে তাহাদিগের সমৃদ্ধিও শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করা যাইবেক না। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় সম্পূর্ণরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ ব্যতিরেকে তৎসম্পাদন কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ভারতবর্ষীয় সর্বসাধারণ লোকে বিদ্যানুশীলনের ফলভোগী না হইলে, তাহাদিগের চিত্তক্ষেত্র হইতে চিরপ্ররূঢ় কুসংস্কারের সমূলে উন্মূলন হইবেক না এবং হিন্দী বাংলা প্রভৃতি তত্তৎ প্রদেশের প্রচলিত ভাষাকে দ্বারস্বরূপ না করিলে সর্বসাধারণের বিদ্যানুশীলন সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। সুতরাং ইউরোপীয় কোন ভাষা হইতে পুরাবৃত্ত, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি তত্তৎ প্রচলিত ভাষায় সংকলিত হওয়া অত্যাবশ্যক। কিন্তু সংস্কৃত না জানিলে কেবল ইংরেজী শিখিয়া আমরা যে এই মহোপকারক গুরুতর বিষয় সম্পন্ন করিতে পারিব ইহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে।***"

ইংরেজী শিক্ষা ঃ ঈশ্বরচন্দ্রের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে ইংরেজী এবং সংস্কৃত এই উভয় বিদ্যার চর্চার দ্বারাই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি সম্ভব এবং বাঙালীর উন্নত মনোবৃত্তির বিকাশ সম্ভব। তাই সংস্কৃত কলেজের পুনর্গঠনের সময় তিনি যেমন সংস্কৃত চর্চার সুব্যবস্থা করেছিলেন, তেমনি সেই সংগে ইংরেজী সাহিত্য এবং ইংরেজী, অঙ্কশাস্ত্র পঠন পাঠনের ব্যবস্থাও করেছিলেন। তার পূর্বে কর্তৃপক্ষের মর্জিমত মাঝে মাঝে ইংরেজী পাঠনের

ব্যবস্থা হত, আবার সে ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যেত। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের জন্য ইংরেজী শিক্ষা আবশ্যিক করলেন। কলেজের জুনিয়ার এবং সিনিয়ার স্কলারসিপ পরীক্ষার্থীদেরও ইংরেজীতে নির্দিষ্ট নম্বর পেতে হত। সংস্কৃত কলেজ পুনর্গঠনের সময় ১৮৫৩ সনে তিনি নিজগ্রামে বীরসিংহে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। বিদ্যাসাগর মশায়ের অনুজ তথা জীবনীকার শম্ভু চন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় লিখছেন—'বালক বিদ্যালয়ে প্রথমতঃ বাংলা ও সংস্কৃত কাব্য ও অলংকারাদি শিক্ষা দেওয়া হইত; কিছুদিন পর অধিক সংস্কৃত সাহিত্যাদি অধ্যয়ন না করাইয়া, রীতিমত ইংরেজী ও সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হইত।'[51]

বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্য এদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের চেষ্টা করেছেন এবং সেই সঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষার সংস্কার প্রসারেরও চেষ্টা করেছেন। আর এই দ্বিবিধ প্রচেষ্টার মাধ্যমেই বিদ্যাসাগর হয়ত নিজের অজ্ঞাতসারে বাংলাদেশে রেনেসাঁস বা নবজাগৃতিকে সত্যভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত ও ত্বরান্বিত করে গেছেন। আমরা অনেক সময় ভাবি ইংরেজের আগমন এবং ইংরেজী শিক্ষার প্রসারের ফলে এদেশে রেনেসাঁস বা নবজাগরণ সম্ভব হয়েছে। কিন্তু রেনেসাঁসের গূঢ় অর্থ বিচার করলে বুঝা যাবে একথা ঠিক নয়। ইংরেজী এবং ইংরেজী শিক্ষা এদেশে নতুন জ্ঞান-বিজ্ঞান আমদানী করেছিল সত্য, কিন্তু তার ফলেই রেনেসাঁস সম্ভব হতে পারে না। রেনেসাঁসের প্রধান অঙ্গ হল নিজের দেশের অতীত সংস্কৃতির পুনরাবিষ্কার ও নবমূল্যায়ন।

উনিশের শতকের প্রথম পাদে এদেশে বাঙালীদের দ্বারা প্রাচ্যবিদ্যা প্রচারের কিছু আয়োজন হয়েছিল। রাজা রামমোহন রায় সংস্কৃত ভাষায় নিহিত প্রাচ্যবিদ্যা স্বদেশবাসী তথা বিশ্ববাসীর কাছে অনেকটা উন্মুক্ত করেছিলেন। রাজা রাধাকান্ত দেব—সংকলিত 'শব্দ কল্পদ্রুমের' সহায়তায় কোলব্রুক, কেরী, উইলসন প্রভৃতি ইউরোপীয়রা এদেশে বসেই বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থে আবদ্ধ ভারতীয় আর্যদের চিন্তাভাবনার নানা রত্ন উদ্ধার করেছিলেন।

গৌড়ীয় সমাজ (প্রতিষ্ঠা ১৮২৩, ১৬ই ফেব্রুয়ারী) সাহিত্য ও শাস্ত্র চর্চার এমন প্রেরণা দিয়েছিলেন যার ফলে বহু সংস্কৃত কাব্য, মহাকাব্য, ব্যাকরণ, স্মৃতি, দর্শন প্রভৃতির মূল অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। এইভাবে এদেশে

সংস্কৃত চর্চার পুনরুজ্জীবন শুরু হবার পর ১৮২৪ সনে কোম্পানি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু এর দ্বারখোলা রইল শুধু ব্রাহ্মণ-বৈদ্যদের কাছে। ঈশ্বরচন্দ্র ১৮৪৬ সনে সংস্কৃত কলেজে সহকারী সম্পাদকের পদ নিয়ে প্রবেশ করেন এবং ১৮৫১ সনে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হন। ১৮৫৪ সনে তিনি সংস্কৃত কলেজে যে-কোন হিন্দুর প্রবেশাধিকারের ব্যবস্থা করেন এবং পর পর নানা সংস্কার সাধন করে সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত চর্চাকে যথাযোগ্য গুরুত্ব দেন।

১৮৫৭ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল এবং সেখানে নানা ক্লাসিক্যাল ভাষার সঙ্গে এণ্ট্রান্স থেকে এম. এ. পর্যন্ত সংস্কৃত শিক্ষনীয় বিষয় বলে নির্ধারিত হল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রয়োজনে ঈশ্বরচন্দ্র সহজ সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করলেন এবং প্রায় সবগুলি খ্যাত কাব্য, নাটক সম্পাদন করে প্রকাশ করলেন। এই ভাবে প্রচুর সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা, সংকলন ও সম্পাদন করে ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত বিদ্যা প্রচারে যে কি বিপুল ভাবে সহায়তা করেছিলেন তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে বাংলা দেশের এশিয়াটিক সোসাইটি (প্রতিষ্ঠা বর্ষ ১৭৮৪) প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার যে আয়োজন করেছিলেন এবং রামমোহন, রাধাকান্ত, রাজেন্দ্রলাল প্রভৃতির প্রচেষ্টায় যে আয়োজন ক্রমে ক্রমে সার্থক হচ্ছিল, বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় সে আয়োজন পূর্ণতা প্রাপ্ত হল। আবার এই বিদ্যাসাগরই মেট্রোপলিটন ইন্সটিটিউশনের মাধ্যমে আমাদের দেশে ইংরেজী শিক্ষাকে স্বাধীন ভাবে স্থায়ী করবার প্রথম ভিত্তি স্থাপন করেন। এই ভাবে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার সঙ্গে প্রাচ্য বিদ্যার পুনরভ্যুত্থান সম্ভব হওয়ায় রেনেসাঁস বা নবজাগৃতি এদেশে সত্যভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

অক্ষয় কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬)

১৮৩৯ সনের ২০শে ডিসেম্বর ঈশ্বরগুপ্তের প্রস্তাবে অক্ষয় কুমার তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য মনোনীত হন। বাংলা দেশের সংস্কৃতি, সাহিত্য ও শিক্ষার সঙ্গে এই ভাবেই অক্ষয় কুমারের প্রথম প্রত্যক্ষ যোগ স্থাপিত হয়েছিল। এর কয়েকমাস পরেই ১৮৪০, ১০ই জুন দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপন করলেন। অক্ষয়কুমার সে পাঠশালার শিক্ষক নিযুক্ত হলেন।

তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় শিক্ষকতার সময় ছাত্রদের জন্য অক্ষয় কুমার একটি

ভূগোল রচনা করেন (১৮৪১)। এই ভূগোলের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন—'** এ ভাষায় (বাংলা ভাষায়) এ প্রকার প্রচুর গ্রন্থ দৃষ্ট হয় না যে তদ্দারা বালক বালিকাদিগকে সুচারুরূপে শিক্ষা প্রদান করা যায়।' তাই 'বহু ক্লেশ বহু ইংরাজী গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া বালকদিগের বোধগম্য অথচ সুশিক্ষাযোগ্য এই ভূগোল' তিনি প্রস্তুত করেছেন।

তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় শিক্ষকতার সময়ই তিনি বাংলা ভাষায় 'বহুবিদ্যার বৃদ্ধির' উদ্দেশ্য 'বিদ্যাদর্শন' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন (১৮৪২ জুন)। এ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় তিনি লেখেন—'যখন যে জাতির মধ্যে সভ্যতা প্রবেশ করে, তাহার পূর্বেই এই প্রকার প্রকাশ্য পত্রের সৃষ্টি হইয়া বিদ্যার পথ মুক্ত হইতে থাকে। এই পরম প্রিয়কর নিয়মের পশ্চাদ্‌বর্তী হইয়া আমরাও বঙ্গদেশের মৃতপ্রায় ভাষার পুনরুদ্দীপনে যত্ন করিতে অভিলাষ করিয়াছি।'[৫২]

এই বিদ্যাদর্শন পত্রিকাব শক ১৭৬৪, অগ্রহায়ণ সংখ্যায় বাংলাব স্ত্রী শিক্ষা সম্পর্কে তিনি একটি প্রস্তাব স্বদেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত করেন। বিদ্যাদর্শনে তিনি লেখেন—"এইক্ষণে হিন্দু স্ত্রীদের যেরূপ কুলধর্ম এবং জাতি রক্ষার যে প্রকার কঠিন নিয়ম দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে স্ত্রীবিদ্যার সাধারণ্যে হওয়া দুরূহ। ** সুতরাং ঐ সকল প্রতিবন্ধক সত্বেও ইহা সমাধা করা সামান্য কার্য নহে; অতএব এই বিষয়ের পরীক্ষার্থে জনসমাজে আমরা এক প্রস্তাবোত্থাপন করিতে অভিলাষ করিয়াছি। তাহা মনোনীত জ্ঞান করিয়া যদি অন্য অন্য ভ্রাতা সম্পাদকগণ অগ্রসর হয়েন, তবে অনুমান করি সাধারণ জনসমূহেরও উৎসাহ হইতে পারে।

** আমরা সকল উপায়াপেক্ষা এ বিষয়ের জন্য একতার প্রতিই অধিক নির্ভর করিতে পারি এবং স্ত্রীবিদ্যার উন্নতিকল্পে দেশহিতৈষী জনসমূহের যুক্ত সাহাযা ভিন্ন অন্য কিছুই শুভকর বোধ করি না; অতএব আমরা একান্তরূপে অনুরোধ করিতেছি দয়াশীল মহাশয়েরা ঐক্যবাক্যে একত্র হইয়া এতদ্দেশীয় স্ত্রীবিদ্যার উন্নতি নিমিত্ত একটি সভা স্থাপন করুন এবং দৃঢ়রূপে তৎসমাজের কার্য বিষয় মনোযোগী হউন।"[৫৩]

১৮৪৩, ৩০শে এপ্রিল তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা বাঁশবেড়িয়া গ্রামে স্থানান্তরিত হয়। এ উপলক্ষে এক মহতী সভা হয়। সে সভায় অক্ষয় কুমার মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে বাঙালীর শিক্ষাদান সম্পর্কে তাঁর বক্তৃতায়

যে দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাধারার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা পরবর্তীকালের জাতীয়তাবাদী মনোভাবের অগ্রদূত। ঐ বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন—

'*** এইক্ষণে আমাদিগের স্ব স্ব সাধ্যানুসারে আপন ভাষায় শিক্ষা প্রদান করা, এ দেশীয় যথার্থ ধর্মের উপদেশ প্রদান করা অতি আবশ্যক হইয়াছে। নতুবা আর কিয়ৎকাল গৌনে ইংরাজদিগের সহিত আমাদিগের কোন বিষয়ে জাতীয় প্রভেদ থাকিবেক না—তাহাদিগের ভাষাই এদেশের জাতীয় ভাষা হইবেক এবং তাহাদিগের ধর্মই এদেশের জাতীয় ধর্ম হইবেক, সুতরাং ব্যক্ত করিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, যে হিন্দু নাম ঘুচিয়া আমাদিগের পরের নামে বিখ্যাত হইবার সম্ভাবনা দেখিতেছি। এই সকল সাংঘাতিক ঘটনার নিবারণ করিতে এবং বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানশাস্ত্রের এবং ধর্মশাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করিতে তত্ত্ববোধিনী সভা অদ্য ১৭৬৫ শকের ১৮ই বৈশাখ রবিবার এতৎ পাঠশালারূপ নবকুমার প্রসব করিলেন।"[54]

বাঙালী ছাত্রকে তার মাতৃভাষা বাংলায় শিক্ষাদান, বাংলাভাষায় 'বহুবিদ্যার বৃদ্ধির' উদ্দেশ্যে নানা বিষয়ে পুস্তক রচনা, স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের প্রচেষ্টা প্রভৃতি ব্যাপারে অক্ষয়কুমারের চিন্তা ও কর্মের সঙ্গে সে যুগের মনীষীদের পুরোপুরি মিল আছে, কিন্তু যে-ক্ষেত্রে সে-যুগে অক্ষয়কুমার অনন্যসাধারণ তা হচ্ছে—বাঙালীর মননধারায় এক বিজ্ঞান সচেতন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবর্তন করা।

উনবিংশ শতাব্দীর বাণী সংস্কারমুক্ত জ্ঞানবাদ ও মানবপ্রেম। অক্ষয়কুমার তাঁর সকল চিন্তায় ও প্রচেষ্টায় এই সংস্কার মুক্ত জ্ঞানবাদকেই অবলম্বন করেছিলেন। মধ্যযুগীয় সংস্কার-মূঢ় এই দেশে অক্ষয়কুমারের আবির্ভাব এক ঐতিহাসিক ঘটনা। ঈশ্বরচন্দ্রের মত বাঙালী সন্তানের শিক্ষা চিন্তাই ছিল অক্ষয়কুমারের মুখ্য চিন্তা। তাই বাঙালী ছাত্রদের জন্য তিনি ভূগোল, চারুপাঠ (তিন খণ্ড), পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি বিজ্ঞান-বিষয়ক পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছিলেনে। আর বাঙালীর শিক্ষার স্বার্থেই তাঁর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা।

ইংরেজী শিক্ষার প্রসার

(১৮৫৪-১৮৮১)

উড্ সাহেবের ডেস্প্যাচ্ এল ১৮৫৪ সনে বঙ্গ দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে এই ডেস্প্যাচের অপরাপর ফলের বাকী যে-দুটি বিশেষভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে-দুটি হল :

(১) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

(২) গ্রাণ্ট-ইন্-এড্ বা অনুদান প্রথার প্রবর্তন।

প্রথমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আলোচনা করা যাক্। উনিশ শতকের গোড়া থেকেই বাঙালী চিত্তে প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সমন্বয়ের আকাঙ্খা জেগেছিল। ইতিহাসের নানা শক্তি বাঙালীর মনে এই আকাঙ্খা জাগিয়েছিল। উনিশের শতকের তৃতীয় দশকে এ আকাঙ্খা একটা ব্যাকুলতার রূপ নেয় এবং সেই ব্যাকুলতা থেকেই জন্ম নিল অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন (১৮২৮), মেকানিক্স্ ইনস্টিটিউট্ (১৮৩৬), তত্ত্বরঞ্জনী সভা (১৮৩৯) (পরে নাম হয় তত্ত্ববোধিনী সভা), বেথুন সোসাইটি (১৮৫১), সুহৃৎ সমিতি (১৮৫৪) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান।

এই সব প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মধ্যে যে আশঙ্কা ও আগ্রহের প্রকাশ, তারই চূড়ান্ত পরিণতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। বাঙালী চিত্তের গভীরে এই আগ্রহের বীজ না থাকলে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার সপক্ষে মেকলের সদম্ভ উক্তি মিলিয়ে যেত, ১৮৫৪-র ডেস্প্যাচ্ লেখা হত না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বুদ্ধিজীবী বাঙালীর এই একান্ত কামনাকে দেশব্যাপী একটা ভিত্তিভূমি দিয়েছিল এবং শিক্ষা ও জ্ঞানের শুদ্ধ ক্ষেত্রে ঐ ব্যাকুলতাকে চরিতার্থ করবার জন্য আয়োজনও করেছিল।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে ইংরেজ সরকারের দিক থেকে শাসন কাজে ইংরেজী জানা-বাঙালী কর্মচারীর ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটানোর ব্যবস্থা হ'ল। আবার বাংলার সমাজে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত নতুন মধ্যবিত্ত স্তরের আবির্ভাবের পথ প্রশস্ত হ'ল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গোড়ার দিকে লর্ড ক্যানিং আশা করেছিলেন যে এমন সময় আসন্ন যখন **'The nobility and the upper classes of India**

would think that their children had not had the dues of their rank unless they passed through the course of this University.[1]

অর্থাৎ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আপন সন্তানদের পড়াতে না পারলে ভারতের অভিজাত এবং উচ্চশ্রেণীর মানুষেরা ভাববেন তাঁদের সন্তানরা তাদের সামাজিক মর্যাদার অনুপাতে যোগ্য শিক্ষা পায়নি।' ক্যানিং-এর এ-উক্তির পর দশ বছর যেতে না যেতেই স্যার হেনরী মেইন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণে বললেন, (১৭ই মার্চ, ১৮৬৬)—**'The fact is that the founders of the University of Calcutta thought to create an aristocratic institution and inspite of themselves, they have created a popular institution.'**[2] অর্থাৎ আসল ব্যাপারটা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতারা একটি অভিজাত প্রতিষ্ঠান গড়তে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁরা একটি গণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন।

যে সব বিচক্ষণ বৃটিশের মাথায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা এসেছিল, তারা নিশ্চয়ই এ জাতীয় ফললাভের কথা কল্পনা করতে পারেননি। তাঁরা ভেবেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা এদেশে পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন রাজভক্ত একটি শ্রেণী তৈরী করবে যাঁরা অগণিত দেশবাসীর চিন্তাধারাকে ইংরেজের স্বপক্ষে নিয়ন্ত্রণ করবেন এবং এই ভাবে পরোক্ষে বৃটিশ সম্রাজ্যের বুনিয়াদ দৃঢ়তর করে তুলবেন। কিন্তু ইতিহাসের অনিবার্য গতি দিনে দিনে বিশ্ববিদ্যালয়কে বাংলার সকল শিক্ষার্থীর বিদ্যায়তন হিসেবেই পুষ্ট করে তুলল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত বাঙালীরা অল্পকাল মধ্যে দেশবাসীর লুপ্ত জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তুললেন।

১৮৬০ সনে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পন' নাটক প্রকাশিত হল। নীলদর্পনের মূল বাংলা ও ইংরেজী প্রচারের ফলে ইংলণ্ডের উদার ইংরেজরাও নীলকরদের আচরণে ক্ষুব্ধ হলেন। বাংলাদেশেও ইংরেজ চরিত্রের প্রতি প্রথম ব্যাপক ঘৃণা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত হল। তারপর ১৮৬১ সনে বাংলা দেশে 'রাজনারায়ন বসু' সোসাইটি ফর্ দ্য প্রোমোশন্ অব্ ন্যাশন্যাল ফিলিংস্ অ্যামাং দ্য এডুকেটেড্ নেটিভস্ অব বেঙ্গল' প্রতিষ্ঠা করলেন। আবার এই সমিতির ভাবাদর্শ অনুসরণ করে ১৮৬৭ থেকে বঙ্গদেশে এক অভিনব স্বদেশী মেলার (হিন্দুমেলা বা চৈত্র মেলা) প্রবর্তন হল। বাংলাদেশে এই স্বাদেশিকতার

জাগরণ ইংরেজ সরকার লক্ষ্য করছিলেন এবং এ জাগরণ যে ইংরেজী শিক্ষার বা উচ্চশিক্ষার অনিবার্য পরিণতি এ সিদ্ধান্তে তাঁরা সহজেই উপনীত হয়েছিলেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে, ডেস্‌প্যাচের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য নির্দেশ হল, গ্রান্ট-ইন্‌-এড্‌ বা অনুদান প্রথার প্রবর্তন। অনুদানের দুটি উদ্দেশ্য ছিল:

(১) সরকারের উপর শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যায়ের চাপ হ্রাস করা।

(২) বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনার ব্যাপ্যারে বেসরকারী উদ্যোগকে উৎসাহিত করা।

এই অনুদান প্রবর্তনের ব্যাপারেও ডেস্‌প্যাচ রচয়িতাদের হিসেবে ভুল হয়ে গেল, অনুদান প্রর্বতনের ফলে বঙ্গদেশে সেকেণ্ডারী বা ইংরেজী স্কুলের সংখ্যা অপ্রত্যাশিত বা অনাকাঙ্খিত দ্রুত গতিতে বাড়তে লাগল। পূর্বে 'কাউন্সিল অব্‌ এডুকেসন্‌' কাজ শুরু করেছিলেন সাতটি সরকারী কলেজ ও ষোলটি সেকেণ্ডারী স্কুল নিয়ে। অনুদান প্রবর্তনের পর ১৮৫৫ সনে সেকেণ্ডারী স্কুলের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৪৭ এবং এর দেড়বছরের মধ্যেই ঐ সংখ্যা হল ৭৯।

১৮৬২-৬৩ তে সরকারী অনুদানের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা। ১৮৭০-৭১ সনে সরকার অনুদানের পরিমাণ বাড়িয়ে করেছিলেন ৫ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা। কিন্তু সে সময় দেখা গেল শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারী অর্থ বিনিয়োগ সরকারী অর্থ বিনিয়োগের চতুর্গুণ হয়েছে।'[৩]

ইংরেজী শিক্ষার এ দুরন্ত প্রসার সরকারের পক্ষে আদৌ রুচিকর ছিল না। তাই কালবিলম্ব না করে ১৮৭০ সাল থেকেই সরকার তার প্রায় সমগ্র শিক্ষা প্রচেষ্টা নিয়োজিত করলেন প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে। ইংরেজী শিক্ষা অবহেলা করে দেশীয় বিদ্যালয়গুলির উপর এই আকস্মিক দরদ বঙ্গদেশের কয়েকটি জেলার অধিবাসীদের এত বিচলিত করেছিল যে, **'It can be fitly described as a state of actual panic.** অর্থাৎ তাঁরা দস্তুর মত ভয় পেয়েছিল বলা যেতে পারে।[4]

সেকেণ্ডারী স্কুলগুলি অবহেলিত হতে লাগল। কতকগুলি সরকারী স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হল। সেকেণ্ডারী শিক্ষায় অর্থ সাহায্য দস্তুর মত সঙ্কুচিত করা হল। শিক্ষিত বাঙালী বুঝতে পারল যে ইংরেজী শিক্ষা এ দেশবাসীর মধ্যে দেশাত্মবোধের জাগরণ আনছে, তাই ইংরেজ সরকার উচ্চশিক্ষা

সংহারের সংকল্প করছেন। কিন্তু উচ্চশিক্ষা লাভের আগ্রহ তখন এদেশে এত প্রবল ছিল যে অর্থ সাহায্য বন্ধ বা সঙ্কুচিত করে তাকে প্রতিহত করবার ক্ষমতা সরকারের হল না—'The Educational movement had obtained so great a momentum of its own that it was already in Bengal, if not in other provinces, beyond the control of the Department of Public Instruction.'[5]

প্রাথমিক শিক্ষা (১৮৫৪-১৮৮১)

১৮৫৪ সনের ১লা মে হ্যালিডে সাহেব বাংলায় প্রথম ছোট লাট হন। ছোটলাট পদে নিযুক্ত হবার দু'মাস আগে মার্চ মাসে তিনি বাংলা শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর মতামত একটি 'মিনিটে' ব্যক্ত করেন। মিনিটে তাঁর বক্তব্য হল :

'বাংলা দেশে অসংখ্য দেশী পাঠশালা আছে। এই পাঠশালাগুলির সংস্কার ও উন্নতি সাধন আমাদের অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত। এমন কতকগুলি মডেল স্কুল স্থাপন করা উচিত যা এই সব পাঠশালার পক্ষে আদর্শ স্থানীয় হবে। যদি নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে মডেল স্কুলগুলির শিক্ষা ব্যবস্থা দেখে পাঠশালার গুরুমহাশয়রা নিজেদের উন্নতির জন্য সচেষ্ট হতে পারেন ইত্যাদি।'[6]

বাংলাদেশের পাঠশালাগুলির উন্নতির জন্য হ্যালিডের এই প্রস্তাবের ভিত্তি হল বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ফেব্রুয়ারী মাসে রচিত 'বাংলা শিক্ষার পরিকল্পনা।' হ্যালিডে ঐ মিনিটেই বলেছেন 'বিদ্যাসাগর মহাশয় যে ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা বলছেন, আমি তা মোটামুটিভাবে অনুমোদন করি। আমার ইচ্ছা তাঁর প্রস্তাবিত ব্যবস্থাই কাজে পরিণত করা হোক।'[7]

এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন হ্যালিডের ইচ্ছা ক্রমেই বিদ্যাসাগর মহাশয় দক্ষিণ বাংলার সহকারী ইস্কুল পরিদর্শক নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং ১৮৫৫ আগষ্ট থেকে ১৮৫৬ জানুয়ারী মধ্যে নিজ এলাকার (বর্ধমান, হুগলী, মেদিনীপুর ও নদীয়া জেলা) প্রত্যেক জেলায় পাঁচটি করে মোট কুড়িটি মডেল স্কুল স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হ্যালিডে ও বিদ্যাসাগরের এ প্রচেষ্টা বঙ্গদেশে প্রাথমিক শিক্ষা সমস্যার প্রান্ত দেশও স্পর্শ করল না।

১৮৫৪ সনে উড্ সাহেবের ডেস্‌প্যাচ এল, এই ডেস্‌প্যাচের চতুর্থ

অনুচ্ছেদে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হল—এ দেশের অগণিত, অসহায় জনগণের জন্য ব্যবহারিক এবং কার্যকরী শিক্ষার ব্যাপারে সরকার এ যাবৎ নিদারুন অবহেলা করেছেন। সরকার যেন উপরোক্ত শিক্ষাব্যবস্থার জন্য উদ্যোগী হন এবং এজন্য প্রয়োজনীয় অর্থ মঞ্জুর করা হবে।'[৪]

ডেসপ্যাচের নীতিগুলি কার্যকর করতে না করতে সিপাহী বিদ্রোহ এসে গেল (১৮৫৭)। তারপর এল ১৮৫৯-এর ডেসপ্যাচ্। এই ডেসপ্যাচ-এ বলা হল, প্রাথমিক শিক্ষার পুরো দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে এবং প্রয়োজন হলে অর্থসংস্থানের জন্য সরকারকে জমির উপর শিক্ষাকর ধার্য করতে হবে। বঙ্গদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত ছিল তাই জমির উপর কর ধার্য বাংলা সরকার করলেন না। এই শিক্ষাকর ধার্যের ব্যাপার নিয়ে বঙ্গসরকার ও ভারত সরকারের মতবিরোধ দেখা দিল এবং শেষ পর্যন্ত ডিউক অব্ আরগাইল-এর নির্দেশে (১২ই মে ১৮৭০) এই বিরোধের অবসান হল। ইতিমধ্যে বঙ্গদেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হল এবং দুর্ভিক্ষ কমিশন কৃষকদের উপর কোন প্রকার কর ধার্য করা সমীচীন নয় বলে মত দিলেন। তাই শিক্ষাকর ধার্যের ব্যাপারটা চাপা পড়ে গেল। কিন্তু শিক্ষাকর প্রসঙ্গ বাদ দিলেও দেখা যাবে ১৮৫৪ থেকে ১৮৮২-র (হান্টার কমিশনের সময়) মধ্যে বঙ্গসরকার নানা রকমের প্রচেষ্টা করেছেন দেশীয় পাঠশালাগুলির উন্নতির জন্য। সরকার প্রথমে 'সার্কেল স্কুল সিস্টেম্' প্রচলন করলেন। এই পদ্ধতি অনুসারে কাছাকাছি কতগুলি পাঠশালার জন্য একজন প্রধান গুরু নিয়োগ করা হত। কাছাকাছি অবস্থিত ঐ স্কুলগুলির উপরদিককার ক্লাসে তিনি পড়াতেন এবং কোন অসুবিধা হলে তিনি তা নিরসনের সহায়তা করতেন। এই সার্কেল স্কুল পদ্ধতিতে অভিপ্রেত ফল পাওয়া গেল না।

ভারত সরকারের সেক্রেটারী এ. এম. মনটিস্ সার্কেল স্কুল পদ্ধতির কিছু পরিবর্তন করে নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দিলেন। নর্মাল স্কুলে গুরুমহাশয়দের এক বছরের ট্রেনিং হত এবং এই ট্রেনিং-এর সময় তাঁরা মাসিক পাঁচ টাকা পেতেন। ট্রেনিং এর সুরুতেই লিখিতভাবে স্থির হত কে কোন গ্রামে গুরুগিরি করবেন।

বঙ্গদেশের গভর্ণর স্যার জর্জ ক্যাম্পবেল প্রাথমিক স্কুলগুলিকে সাহায্য দানের ব্যবস্থা করলেন এবং ১৮৭২ নাগাদ প্রায় ২,০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সাহায্য দেওয়া হল। এই সাহায্য দানের ফলে গ্রামবাসীরা তাদের সাহায্যের

পরিমাণ কমাতে সুরু করলেন, তাছাড়া দেশে যে সব স্কুল আগে থেকে চলছিল সেইগুলিই কিঞ্চিৎ উপকৃত হল। কিন্তু শিক্ষাবিবর্জিত অঞ্চলে নতুন পাঠশালা স্থাপনে এ পদ্ধতির উপযোগিতা প্রমাণিত হল না।

ইতিমধ্যে মেদিনীপুরের জেলাশাসক 'পেমেণ্ট বাই রেজাল্টস্' চালু করে সন্তোষজনক ফল পেলেন। বাংলার লাট সাহেব সারা বঙ্গদেশে এই প্রথা প্রচলনের নির্দেশ দিলেন। কিন্তু এত করেও বঙ্গদেশে এবং অন্যান্য রাজ্যেও প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার বা উন্নতি আশানুরূপ হল না। অথচ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা আশাতীত ভাবে অগ্রসর হতে লাগল। এটা সত্যই এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতি যার আশু অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা সরকার বোধ করলেন। তাই লর্ড রিপন ১৮৮২ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে একটা সামগ্রিক অনুসন্ধানের জন্য হাণ্টার কমিশন নিয়োগ করলেন। এই কমিশন নিয়োগের ব্যাপারে মিশনারীদের প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টা ছিল, কিন্তু সে-কথা এখানে প্রাসঙ্গিক নয়।

স্ত্রী শিক্ষা (১৮৫৪-১৮৮১)

১৮৬০ সনের পূর্ব পর্যন্ত বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে বেথুন স্কুল ছাড়া বিশেষ কিছু করা হয়নি। সত্যকারের দেশীয় প্রচেষ্টা শুরু হলো ১৮৬১ থেকে।

১৮৬১ সনের ৩রা অক্টোবর ব্রাহ্ম সমাজের এক সভায় কেশবচন্দ্র স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, সব মেয়েদের বয়স দশ বছরের বেশী তারা বিদ্যালয়ে পড়বার সুযোগ পায় না। অথচ এ বয়সে যতটুকু শিক্ষা তারা পায়, বিয়ে হবার পর তার চর্চার কোন উপায় থাকে না। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় এর প্রতিকার কি করে সম্ভব সে বিষয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন।

কেশব সেনের এই আলোচনার মধ্যে অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার বীজ নিহিত ছিল।

১৮৬২ সনের মাঝামাঝি কলকাতায় ব্রাহ্মবন্ধুসভা স্থাপিত হয় এবং কেশব সেনের প্রচেষ্টায় এই সভার অধীনে **"অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা"** নামে একটি সভা স্থাপিত হয়। এই শেষোক্ত সভা প্রতিষ্ঠার ফলে বাংলা দেশের মেয়েরা বিয়ের পূর্বে এবং বিয়ের পরে ঘরে বসে বিদ্যাচর্চার সুযোগ পেল।

অন্তঃপুর স্ত্রী-শিক্ষার কাজ কিভাবে চলেছিল তার খবর পাওয়া যায় উমেশ চন্দ্র দত্ত সম্পাদিত "বামাবোধিনী" পত্রিকায় (আশ্বিন ১২৭৪,

পৃঃ ৫৮৮ ৫৮৯)। ব্রাহ্ম বন্ধুসভা দু'বছর এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে এর ভার 'বামাবোধিনী' সভার উপর ছেড়ে দেন। বামাবোধিনী সভার উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গদেশে নারী জাতির উন্নতি সাধন। সভার উদ্যোক্তা ছিলেন উমেশচন্দ্র দত্ত, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং শিশির কুমার ঘোষের জ্যেষ্ঠাগ্রজ বসন্ত কুমার ঘোষ। বামাবোধিনী সভা এদেশের অন্তঃপুর স্ত্রী-শিক্ষায় যথেষ্ট সহায়তা করেছে।

'অন্তঃপুর স্ত্রী-শিক্ষা পাঁচ বছরে বিভক্ত ছিল। প্রথম বছরে পরীক্ষায় বোধোদয়, পাটীগণিতের সংকলন, ব্যাকরণ ও নামতা থেকে আরম্ভ করে পঞ্চম বর্ষের পরীক্ষায় প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ক্ষেত্রতত্ত্ব প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৫]

'বামাবোধিনী' সভার কাজ ১৮৭০ সাল নাগাদ চলেছিল। প্রতি বছরই পাঠ্যতালিকা নির্ধারণ, ছাত্রীদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা, বছরের শেষে ছাত্রীদের কাছে প্রশ্নপত্র পাঠানো, তারপর তাদের লিখিত উত্তর পরীক্ষক মণ্ডলী দিয়ে পরীক্ষা করানো এবং উৎকৃষ্ট ছাত্রীদের পুরস্কার দান—সভার কাজ এই পদ্ধতিতে চলত।

১২৭৬ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় "বামাবোধিনী পত্রিকা" পাঁচটি শ্রেণীর পাঠ্য বিষয়ের একটি বিস্তৃত তালিকা প্রকাশ করেছেন। তাতে দেখা যায় প্রথম শ্রেণীর থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান ও শাস্থ্যতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয় ক্রমিকভাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়েছিল। ১২৭৭ আশ্বিন সংখ্যায় ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য একটি বিশেষ পরীক্ষার পাঠ্য বিষয়ের তালিকা প্রকাশিত হয়। মুখ্য পাঠ্য বিষয়গুলি নিচে দেওয়া হল।

১। সাহিত্য—নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব, সীতার বনবাস, চারুপাঠ ২য় ভাগ, শকুন্তলা, সাবিত্রী চরিত কাব্য, মেঘনাদ বধ কাব্য, পদ্মিণী উপাখ্যান, ব্যাকরণ অলংকার, প্রবন্ধ রচনা।

২। ইতিহাস—ভারতবর্ষ, ইংলণ্ড, রোম ও গ্রীসের ইতিহাস।

৩। গণিত—সমুদয় পাটীগণিত, ক্ষেত্রতত্ত্ব ১ম অধ্যায়, বীজগণিত সমানুপাত পর্যন্ত।

৪। বিজ্ঞান—ধাত্রীবিদ্যা, শিশুপালন, পদার্থের গুণ, প্রাকৃতিক ভূগোল ও খগোল, বামাবোধিনীর বিজ্ঞান বিষয়ক সমুদায় প্রস্তাব।

উপরের পাঠ্যতালিকা থেকে বোঝা যাবে ছাত্রীদের শিক্ষার মান কত উঁচু ছিল।

কেশবচন্দ্র বিলাত থেকে বাংলায় ফিরে ১৮৭০, ২রা নভেম্বর ভারতের নানা উন্নতির জন্য "ভারত সংস্কার সভা" স্থাপন করেন। স্ত্রী-জাতির উন্নতি সাধন এই সভার অন্যতম কর্তব্য বলে পরিগণিত হয়।

বামাবোধিণী সভা ১৮৭০ সনের শেষে কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত ভারত সংস্কার সভার অঙ্গীভূত হয়ে অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে রত থাকে। ভারত সংস্কার সভার আনুকূল্যে ১৮৭০ সনের ১লা ফেব্রুয়ারী **'স্ত্রী শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়'** স্থাপিত হল। মাস খানেকের মধ্যে এর ছাত্রী সংখ্যা হল সতের। মিসেস উইল্‌সন এই বিদ্যালয়ের সুপারিনটেন্‌ডেন্ট হলেন। এখানে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বাংলা পড়াতেন, কেশবচন্দ্র সেনও মাঝে মাঝে ছাত্রীদের বিজ্ঞান পড়াতেন। শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা ছিলেন প্রাপ্তবয়স্কা ব্রাহ্ম মহিলা। বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে বছর খানেক পরে কেশবচন্দ্র 'ভারত আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করলেন। কতগুলি ব্রাহ্ম পরিবার এই আশ্রমে বসবাস করতেন। তাঁদের স্ত্রী ও অন্যান্য বয়স্থা আত্মীয়া এই বিদ্যালয়ের ছাত্রী হলেন। এইভাবে বিদ্যালয়ের স্থায়িত্ব সম্পর্কে অনেকটা নিশ্চিত হয়ে কেশবচন্দ্র সরকারী সাহায্যের জন্য শিক্ষা কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করলেন, ১৮৭২ সনের ৯ই আগষ্ট সরকার বিদ্যালয়টিকে পাঁচ বছরের জন্য বার্ষিক দুই হাজার টাকা সাহায্য মঞ্জুর করলেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ রায়, উমানাথ গুপ্ত, শশিভূষণ দত্ত, প্রমুখ মনীষীগণও এখানে শিক্ষাদানে লিপ্ত ছিলেন।

প্রতি বৎসরে সাড়ম্বরে ছাত্র-ছাত্রীদের বাৎসরিক পরীক্ষা সে যুগের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের দ্বারা গৃহীত হত। ইংরেজী বাংলা উভয় ভাষাতেই অনেক কৃতিত্ব প্রকাশ হত। শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ কেশবচন্দ্রের উৎসাহে ও প্রেরণায় **'বামাহিতৈষিণী সভা'** নামে একটি সাহিত্য সংস্কৃতি মূলক পাক্ষিক সমিতি স্থাপন করেন। এই সভায় নারীদের আচার ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ, পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ, বক্তৃতা ও আলোচনা চলত।

কিছুটা ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্দ্বন্দে এবং মুখ্যত সরকারী সাহায্য বন্ধ হওয়ায় কেশবচন্দ্রের "স্ত্রীশিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়টি ১৮৭৮ সনে উঠে গেল।[৩৪]

হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় ও বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়।

হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়ের কাজ শুরু হয় ১৮৭৩ সনের ১৮ই নভেম্বর

কলকাতার বেনিয়াপুকুর লেনে পাঁচটি ছাত্রী নিয়ে। বিলাতে কেশবচন্দ্র সেনের ভারতীয় নারীজাতি সম্পর্কে বক্তৃতায় অনুপ্রাণিত হয়ে মিস এনেট্ অ্যাক্রয়েড্ ১৮৭২ সনের ১৫ই ডিসেম্বর কলকাতা এসে পৌছান এবং মেয়েদের জন্য আদর্শ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হন। তিনি প্রধান শিক্ষয়িত্রী হয়ে উপরোক্ত হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এ বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, প্রাথমিক বিজ্ঞান, ইংরেজী, সূচীকর্ম প্রভৃতি শেখানো হত। বাংলাদেশের পরবর্তী কালের অনেক বিখ্যাত মহিলা এ স্কুলের ছাত্রী ছিলেন। মিস্ অ্যাক্রয়েড্-এর এ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেন কেশবচন্দ্র সেন, দুর্গামোহন দাস, বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র, অবলাবান্ধব সম্পাদক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি।

মিস্ অ্যাকরয়েডে্র তত্ত্বাবধানে বিদ্যালয়টি মাত্র দু'বছর চলেছিল। কিন্তু বিদ্যালয়টি উঠে গেলেও ঐ বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নেতৃস্থানীয় বাঙালীরা ঐ রকম একটি বিদ্যালয়ের সবিশেষ প্রয়োজনীয়তা মর্মে মর্মে অনুভব করছিলেন।

আনন্দমোহন বসু, দুর্গামোহন দাসের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিদ্যালয়টির পুনরুজ্জীবনে তৎপর হলেন। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মশায় সহযোগিতার জন্য এগিয়ে এলেন। ১৮৭৬ সনের ১লা জুন ওল্ড বালিগঞ্জ রোডে নতুন করে বিদ্যালয়টি স্থাপিত হল। নামকরণ হল "বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়"।

বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ে ইংরেজী, বাংলা, সংগীত, চিত্রাঙ্কন, সূচীকর্ম, রন্ধনকার্য প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হত। প্রতিষ্ঠার অল্পকাল মধ্যেই বিদ্যালয়টির উন্নততর পঠন-পাঠন ব্যবস্থা সুধীজনের সপ্রসংশ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বেথুন স্কুল এ সময় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাত্র। ১৮৭৮ সনের মাঝামাঝি বেথুন স্কুলের সম্পাদক মনোমোহন ঘোষের আগ্রহে সভাপতি কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার রিচার্ড গার্থ বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। এই পরিদর্শনের পরই গার্থ সাহেব উভয় শিক্ষায়তনকে সম্মিলিত করবার একটি প্রস্তাব দিলেন। এ প্রস্তাবে সে যুগের স্ত্রী-শিক্ষায় উৎসাহী বাঙালী ভদ্রমহোদয়েরা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। ১৮৭৮, ১লা আগষ্ট উভয় বিদ্যালয় মিলিত হল। এইভাবেই বেথুন স্কুল একটি উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হল।[10]

উত্তরপাড়া হিতকরী সভা।

উত্তর পাড়ার (হুগলী) জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর ভ্রাতা

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় ১৮৬৪ সনে "উত্তরপাড়া হিতকরী সভা" স্থাপিত হয়। হিতকরী সভা উত্তরপাড়ায় একটি আদর্শ বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং কাছাকাছি গ্রামগুলিতে বালিকা পাঠশালা প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেন। এই সব পাঠশালার ছাত্রীদের পাঠে উৎসাহদানের উদ্দেশ্যে উক্ত সভা মাসিক দু'টাকা হারে এক বছর দেয় আটটি বৃত্তির ব্যবস্থা করেন।

ধীরে ধীরে 'হিতকরী সভা'র কাজ উত্তরপাড়া ও নিকটবর্তী অঞ্চল ছাড়িয়ে সমগ্র বর্ধমান বিভাগে বিস্তার লাভ করে। সভার দ্বারা পরীক্ষা গ্রহণ এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মেধাবী ছাত্রীদের পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা করে 'হিতকরী সভা' বাংলাদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে প্রচুর সহায়তা করে। এই সভার কৃতিত্বের কথা শিক্ষা অধিকর্তার বার্ষিক রির্পোটে বারংবার স্বীকার করা হয়েছে।

১৮৭৬-৭৭-এর রিপোর্টে বলা হয়েছে উত্তরপাড়ার খুব নিকটবর্তী বালিকা বিদ্যালয়গুলির উন্নতি হচ্ছে, কারণ 'হিতকরী সভা' ঐসব স্কুলের মেধাবী ছাত্রীদের বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করেছেন।

বর্ধমান বিভাগে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে প্রধানতঃ কর্তৃত্ব করছে 'হিতকরী সভা।'[11]

উত্তরপাড়া হিতকরী সভার আদর্শে স্ত্রীশিক্ষার জন্য যে সব সভা সমিতি সারাদেশে গঠিত হয়েছিল তারমধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হল **"মধ্যকই সম্মিলনী' 'শ্রীহট্ট সম্মেলন' 'বিক্রমপুর সম্মেলনী'** এবং **ফরিদপুর সুহৃৎ সংঘ।'** নদীয়া, যশোহর, ২৪-পরগণা জেলার কলকাতাবাসীরা **মধ্যকই সম্মিলনী প্রতিষ্ঠা** করেন। এ সভার সভাপতি ছিলেন বামাবোধিণী পত্রিকার সম্পাদক উমেশ চন্দ্র দত্ত। উপরোক্ত জেলাগুলিতে স্ত্রীশিক্ষা উৎসাহিত করা ছিল এই সভার কাজ। এজন্য বিভিন্ন বালিকা বিদ্যালয়ে এই সভা বৃত্তিদানের ব্যবস্থাও করেছিলেন।

শ্রীহট্ট সম্মেলন স্থাপিত হয়েছিল ১৮৭৮ সনে। উদ্দেশ্য ছিল শ্রীহট্ট জেলায় স্ত্রীশিক্ষার প্রসার। যারা নিয়মিত বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে সম্মেলনের আয়োজিত পরীক্ষায় তারা যোগ দিতে পারত।

বিক্রমপুর সম্মিলনী হয়েছিল কলকাতায়, ১৮৭৯ সনে। ঢাকা জেলার বিক্রমপুর তথা সমগ্র ঢাকা জেলায় স্ত্রীশিক্ষাব প্রসার ছিল এই সভার উদ্দেশ্য।

অবলাবান্ধব সম্পাদক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন এই সভার প্রধান উদ্যোক্তা এবং সভাপতি। দ্বারকানাথ বাংলাভাষা ও শারীরতত্ত্ব শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতেন এবং এই উদ্দেশ্য নিয়ে ছাত্রীদের জন্য পাঠ্য পুস্তকও নির্ধারিত হত। সম্মিলনী অনেক বালিকা বিদ্যালয়ে অর্থ সাহায্য করেছিলেন। এঁদের আয়োজিত বাৎসরিক পরীক্ষায় কুমারী, বিবাহিত এবং বিধবা মেয়েরা যোগ দিত।

১৮৮০ অথবা ১৮৮১ সনে **ফরিদপুর সুহৃদ্ সংঘ** কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এদের উদ্দেশ্য ছিল ফরিদ্পুর জেলায় শিক্ষা বিস্তার।

উপরোক্ত সংঘ বা সমিতির মত আর যেসব সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য **'ত্রিপুরা জেনানা এডুকেশন সোসাইটি', 'বাখরগঞ্জ হিতৈষণী সভা'** এবং **'ময়মনসিংহ সম্মেলন'**। এদেরও আদর্শ ছিল উত্তর পাড়ার হিতকরী সভা।

১৮৮৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে উপাচার্য রেনল্ডস্ (H. J. Reynolds) জানালেন: **Here in Bengal, more progress has perhaps been made than in any other parts of the country; and we have nearly 50,000 girls attending schools or receiving instruction in Zenanas, in the lower provinces. The exertions of that admirable institution, the Uttarpara Hitakari Sabha has largely contributed to the measure of success which has been attained.**[12]

অর্থাৎ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে বাংলা দেশেই স্ত্রীশিক্ষায় সবচেয়ে বেশী অগ্রগতি হয়েছে। প্রধানতঃ উত্তরপাড়া হিতকরী সভার প্রচেষ্টাতেই বাংলাদেশে প্রায় ৫০,০০০ বালিকা হয় স্কুলে পড়েছে, নয়তো ঘরে বসে লেখা পড়া শিখছে।

বঙ্গ মহিলা সমাজ ও আর্যনারী সমাজ ঃ বঙ্গদেশের মেয়েরা স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের জন্য কলকাতায় দুটি সভা স্থাপন করেছিলেন। একটি 'বঙ্গ মহিলা সমাজ,' অপরটি 'আর্যনারী সমাজ'। ১৮৭৮ সনে ব্রাহ্মসমাজের মতবিরোধ নিয়ে ব্রাহ্মরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যান। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের যাঁরা প্রতিষ্ঠাতা তাঁরা গঠন করলেন বঙ্গ মহিলা সমাজ (১লা আগষ্ট; ১৮৭৯)। অন্যান্য কাজের সঙ্গে পুরনারীদের সাধারণ শিক্ষা এবং শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা

এঁরা করেছিলেন।

১৮৭৯ সনের এপ্রিল মাসে নববিধান সমাজের অন্তর্ভুক্ত মহিলারা "আর্যনারী সমাজ" গঠন করলেন। এ সমাজের উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীন আর্যনারীদের আদর্শে বাঙালী নারীর জীবন গড়ে তোলা। আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাত্রীদের চিন্তাধারা থেকে একথা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, বাঙালী মেয়েদের পাশ্চাত্য জীবনাদর্শ অনুকরণ থেকে বিরত করবার কথা দেশের একদল শিক্ষিতা মহিলা সে সময় সক্রিয়ভাবে ভাবছিলেন।

লালবিহারী দে (১৮২৪-১৮৯৪)

এই পর্বের দুইজন শিক্ষাবিদের শিক্ষাচিন্তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের মধ্যে প্রথমজন হচ্ছেন লালবিহারী দে। বাংলাদেশ এঁকে শুধু **Folk Tales of Bengal** এবং **Bengal Peasants' Life** গ্রন্থ দু'খানির রচয়িতা বলেই জানে। বেথুন সোসাইটির কার্যবিবরণী থেকে জানা যায় যে, লালবিহারী **'On Vernacular Education in Bengal** এবং **'On English Education in Bengal'** নামে দু'টি প্রবন্ধ সোসাইটির সভায় পাঠ করেছিলেন ১৮৫৯-এর পূর্বে।[13]

লালবিহারী বঙ্গদেশে শিক্ষাকে আবশ্যিক করবার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন তাঁর **'Compulsory Education in Bengal' (1869)** প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান সভার এক অধিবেশনে পঠিত হয়।'[14]

উপরের তিনটি প্রবন্ধের শিরোনাম এবং নিচে যে প্রবন্ধটির বক্তব্য আলোচনা করা হচ্ছে তা থেকে বোঝা যাবে লালবিহারী বঙ্গদেশের শিক্ষা সম্পর্কে শৌখিন চিন্তা করেননি, বিজ্ঞ শিক্ষাবিদের মত তদানীন্তন শিক্ষা-ব্যবস্থার যে-যে ক্ষেত্রে আলোকপাত করা প্রয়োজন সেইসব ক্ষেত্রে নিজস্ব ভাবনা দেশবাসীর কাছে জানিয়েছেন।

লালবিহারী ছিলেন ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক এবং ইংরেজী ভাষায় গ্রন্থ রচয়িতা। শিক্ষাদানের পদ্ধতি প্রভৃতি প্রসঙ্গ তাঁর পাক্ষিক পত্রিকা 'অরুণোদয়ে' আলোচনা করেছেন। মাতৃভাষা শিক্ষা সম্পর্কে তিনি বলছেন, 'এতাদৃশ, স্বার্থসম্পাদনী মূর্খতাদোষ-কলঙ্ক-উন্মোচণী বঙ্গভাষা বঙ্গদেশীয় লোকদিগের সর্বাগ্রে শিক্ষা করা কর্তব্য। পশ্চাৎ রাজকীয় ভাষা,

তদনন্তর ভাষান্তর। স্বদেশীয় ভাষাজ্ঞান ব্যতিরেকে ভাষান্তরজ্ঞান কখনই সুলভ কি সহজ হয় না—প্রথম শিক্ষাকল্পে সাতিশয় কঠিনতর বোধ হয়॥ দেশভাষা বিশিষ্টরূপ পরিজ্ঞাত হইয়া যে কোন ভাষা শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যায় তাহাতে অবশ্যই কৃতকার্য হওনের সম্ভাবনা।[18]

লালবিহারী বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়েছিলেন ১৮৬৮ সনের ১০ই ডিসেম্বর বেথুন সোসাইটির এক অধিবেশনে।

এ বক্তৃতায় তিনি বাংলাদেশে জনশিক্ষার ব্যয়-নির্বাহের জন্য শিক্ষা সেস্ প্রবর্তনের প্রস্তাব সমর্থন করেন। জনশিক্ষা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করতে গিয়ে লালবিহারী বলছেন যে এদেশে জনশিক্ষার ব্যয়ভার সরকার, দেশের জমিদারবর্গ ও জনসাধারণকে বহন করতে হবে। তাছাড়া ছাত্র-ছাত্রীদেরও বেতন হিসাবে কিছুটা বহন করতে হবে। জনশিক্ষার পাঠ্যসূচী সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলছেন যে পড়া, লেখা এবং অঙ্ক কষা—এই তিনটিই হবে মুখ্য শিক্ষণীয় বিষয়। পাঠ্যবইতে থাকবে পশুজগৎ, উদ্ভিদজগৎ এবং ধাতু সম্পর্কে বিভিন্ন রচনা। তাছাড়া কৃষি, নীতিধর্ম, মিতব্যয়িতা প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা। এই সব পাঠ্য বিষয়ের সঙ্গে আরও থাকবে প্রাথমিক হিসাবরক্ষা, জমিদারী হিসাবরক্ষা, পত্রলিখন, ভূগোল, ইতিহাস এবং ব্যায়ামশিক্ষা। এই ব্যায়াম চর্চার উপর লালবিহারী প্রচুর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন ব্যায়ামচর্চা প্রত্যেক বিদ্যালয়ে আবশ্যিক করে ক্ষীণশক্তি বাঙালীর স্বাস্থ্যোন্নতির পথ সুগম করতে হবে।[19]

প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে উপরোক্ত বক্তৃতায় লালবিহারী তাঁর মৌলিক শিক্ষাচিন্তার আরও এক নিদর্শন রেখে গেছেন। ঐ সময় প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নের জন্য সরকার নানাভাবে ভাবছিলেন, নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করছিলেন। কিন্তু কোনভাবেই প্রাথমিক শিক্ষার সুব্যবস্থা করতে পারেন নি। এর মূলে ছিল সরকারের নিম্ন পরিস্রবণ নীতিতে বদ্ধমূল আস্থা। কিন্তু শিক্ষাবিদ্ লালবিহারীর শিক্ষাচিন্তা এত স্বচ্ছ ও অভ্রান্ত ছিল যে সে যুগেও তিনি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন যে দেশের জনগণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার করতে হলে ভ্রান্ত পরিস্রবণ নীতি পরিহার করতে হবে।

কিশোরীচাঁদ মিত্র, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের বক্তৃতায় বলেছিলেন 'শিক্ষা উচ্চশ্রেণী থেকে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে চুঁইয়ে পড়ে—এ সত্যের প্রমাণ হচ্ছে কোর্ট অফ্ ডাইরেকটরস্ তাঁদের ডেসপ্যাচ কার্যকর করার পর থেকে দেশে

প্রচুর স্কুল ও পাঠশালা স্থাপিত হয়েছে। তাই আমাদের কর্তব্য হচ্ছে উচ্চ-শ্রেণী ও মধ্যবিত্তদের শিক্ষিত করা, তাহলেই দেখা যাবে নিম্নশ্রেণীরা শিক্ষিত এবং উন্নত হচ্ছে।'

বেথুন সোসাইটির বক্তৃতায় লালবিহারী কিশোরীচাঁদের এই উক্তি উল্লেখ করে নিম্ন পরিস্রাবণ নীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। তিনি বলেন, পৃথিবীর কোন দেশেই কোন কালে জ্ঞান বা বিদ্যা উচ্চ শ্রেণী থেকে নিম্ন শ্রেণীতে চুঁইয়ে পড়েনি। ভারতবর্ষেও উচ্চতর শ্রেণী অর্থাৎ ব্রাহ্মণরা খৃষ্টজন্মেরও হাজার বছর পূর্বে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় ছিলেন। কিন্তু গত একশ' পুরুষ ধরে একফোঁটা বিদ্যাও ব্রাহ্মণদের থেকে দেশের জনসাধারণের উপর চুঁইয়ে পড়েনি। আর বর্তমান কালে যদি নিম্নশ্রেণীর অর্থাৎ শূদ্র শ্রেণীর কিছু সংখ্যক লোক লেখাপড়া শিখে থাকেন, তাহলেও কৃতিত্ব ঐ ব্রাহ্মণ-ফিলটারের নয়, কৃতিত্ব হচ্ছে ইংরেজদের, যাঁরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষার জন্য পৃথক ব্যবস্থা করেছেন। তিনি বলছেন,*** **In this country knowledge never filtered from the higher classes . The fact is that upper class filter at any rate is not a filter but a jar hermetically sealed. And hence it was to vary the figure, that while a Brahman Dives was faring sumptuously and luxuriantly on logic, metaphysics and theology, the Sudra Lazarus was positively dying of starvation, in vain expecting a few crumbs to fall from his lords table.**[17]

এই উক্তির সারমর্ম হচ্ছে—এদেশে জ্ঞানবিদ্যা কোনদিনই ব্রাহ্মণদের থেকে শূদ্রদের উপর চুঁইয়ে পড়েনি। আসলে ব্রাহ্মণরা বিদ্যা ব্যাপারে ছিলেন বায়ু নিরুদ্ধ পাত্র বিশেষ, কোন মতেই তাঁদের পরিস্রাবণ যন্ত্র বলা যায় না। তাই যখন তাঁরা যুক্তিবিদ্যা, দর্শন, ধর্মশাস্ত্র ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করেছেন, তখন দেশের শূদ্র শ্রেণী থেকেছে অজ্ঞতার চরম অন্ধকারে।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৯৪)

আর এক মনীষীর শিক্ষা-সম্পর্কিত চিন্তা ও প্রচেষ্টার আলোচনা না করলে এই পর্বের শিক্ষা ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ইনি ভূদেব মুখোপাধ্যায়। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভূদেব মুখোপাধ্যায় আজীবন এদেশের শিক্ষার সঙ্গে

জড়িত ছিলেন। কলেজ ছেড়ে তিনি দেবেন্দ্রনাথের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত 'হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়ে' প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। এর অল্পপরেই ১৮৪৭ সনে স্বাধীনভাবে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে তিনি 'চন্দননগর সেমিনারী' নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে কিছুদিনের মধ্যেই এ বিদ্যালয় ছেড়ে কলকাতা মাদ্রাসার ইংরেজী বিভাগে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে যোগ দেন। তারপর তিনি হাওড়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক, (১৮৪৯), হুগলী নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক (১৮৫৬) এবং ১৮৬২ সনের ১৫ই জুলাই সেণ্ট্রাল ডিভিসনে অস্থায়ী সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক নিযুক্ত হন। উত্তরকালে তিনি বেঙ্গল এডুকেসনাল সার্ভিসে অস্থায়ী প্রথম শ্রেণীর কর্মচারীপদে উন্নীত হয়েছিলেন।

ভূদেব ১৮৫৬ থেকে প্রায় ছ' বছর হুগলী নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। সে সময় শিক্ষা সংক্রান্ত নানাতত্ত্ব ও তথ্য সম্বন্ধে তিনি অধ্যয়ন ও চিন্তার সুযোগ পেয়েছেন। ১৮৫৬ সনেই তিনি 'শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব' নামে ৯১ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। ঐ পুস্তিকায় ভূদেবের শিক্ষা ভাবনার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ পুস্তিকা থেকে কিছু উদ্ধৃত করা হল :

পাঠশালার শিক্ষকদের উপদেশ প্রসঙ্গে (দ্বিতীয় অধ্যায়) তিনি লিখছেন—"'পেসটালজাই' নামক কোন সুবিখ্যাত শিক্ষাশাস্ত্রকার কহেন, বালক সকলকে কৌশলক্রমে বিদ্যার্থী করিবার যত্ন করা বিধেয়। বিদ্যাভ্যাস করাইবার নিমিত্ত ভয় প্রদর্শনাদি রূক্ষ-উপায় অবলম্বন করা বিহিত নহে। 'স্মিথটর' নামক অপর কোন মহামহোপাধ্যায় কহিয়াছেন যে শিশুদিগের মনেও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবোধ জন্মাইবার চেষ্টা করা আবশ্যক। পাঠের প্রথমাবস্থায় পেষ্টালোজাই মহাশয়ের রীতি অবলম্বন করা একান্ত আবশ্যক,—ক্রমশ : স্মিথ্‌টর মহোদয়ের নিয়মানুযায়ী হইতে পারা যায়। কিন্তু শিক্ষক শিষ্যবর্গের সম্পূর্ণ প্রীতি, ভক্তি ও বিশ্বাসভাজন না হইলে এই উভয় উপায়ের কিছুই কোন কার্যকর হয় না। অপরন্তু ইহাও বিবেচনা করা উচিত যে সঙ্গীত যেমন আমাদিগের শ্রবণেন্দ্রিয়ের আনন্দ-দায়ক, পরিমিতাহার সমুদয় শরীরের তৃপ্তি জনক, তেমনি জ্ঞানোপার্জন এবং জ্ঞানালোচনাও অতিরিন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ আনন্দদায়ক হওয়া উচিত। ***

কোন বৃদ্ধ মৃত্যুকালে আপনার অমিতব্যয়ী সন্তানকে কহিয়াছিলেন, 'বাপুরে! প্রত্যহ খরচের খাতা খানি দেখিও।' অর্থব্যয়ের খাতা অনেকেই দেখে। কিন্তু যাহা হইতে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্বর্গ উৎপন্ন হয়, তাহার

খাতা কেহই রাখে না। অতএব বাল্যাবধি সময়ের মিতব্যয়িতার শিক্ষা প্রদান করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

পূর্বেই কহিয়াছি যে বালকদিগের সহিত প্রণয় করা কর্তব্য। কথায় বলে। 'ছেলের সঙ্গে ছেলে হইতে হয়' এই কথা অতি যথার্থ এবং যে শিক্ষক সর্বতোভাবে আপনি ছেলেমানুষ হইতে পারেন, তিনি স্বভাব নির্বাহ করিতে সর্বাপেক্ষা সক্ষম হন।'

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ না করে পারা যায় না যে ১৮৫৬ সনে সার্থক শিক্ষক সম্পর্কে ভূদেবের এই উক্তির সঙ্গে ১৯৩১ সনে রচিত 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' পুস্তকে রবীন্দ্রনাথের সার্থক শিক্ষক সম্পর্কে উক্তির আশ্চর্য মিল আছে। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'গুরুর অন্তরে ছেলেমানুষটি যদি একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়, তবে তিনি ছেলেদের ভার নেবার অযোগ্য হন। শুধু সামীপ্য নয় উভয়ের মধ্যে প্রকৃতি গত সাযুজ্য ও সাদৃশ্য থাকা চাই। নইলে দেনা পাওনায় নাড়ীর যোগ থাকে না।.......যিনি জাতশিক্ষক ছেলেদের ডাক পেলেই তাঁর আপন ভিতরকার আদিম ছেলেটি আপনি ছুটে আসে। মোটা গলার ভিতর থেকে উচ্ছ্বসিত হয় প্রাণভরা কাঁচা হাসি। ......সাধারণত আমাদের গুরুরা প্রবীণতা সপ্রমাণ করতেই চান, প্রায়ই ওটা সস্তায় কর্তৃত্ব করবার প্রলোভনে।'[14]

উক্ত পুস্তকে কবিতা পাঠের উপযোগিতা সম্পর্কে (সপ্তম অধ্যায়) তিনি বলেছেন, 'বালকবৃন্দ স্বভাবতই কাব্যানুরাগী হয়। তাহারা ছন্দোবদ্ধ বিশিষ্ট পাঠগুলিকে স্বেচ্ছা পূর্বক কণ্ঠস্থ করে এবং উচ্চৈঃস্বরে তাহার আবৃত্তি করিতে ভালবাসে। বালক কালাবধি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কবিতা পাঠের দ্বারা যে শীঘ্রই ভাষাবোধ এবং ব্যাকরণ-বোধ উত্তম হয় তাহা নিঃসন্দেহ এবং কবিতা পাঠ নিবন্ধন যে মানসিক অনেকানেক বৃত্তির সম্যক উপকারদর্শে, ইহা বিবেচক ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। অতএব তাদৃশ দুইখানি কবিতার পুস্তক বঙ্গভাষায় নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে বোধ হয়।

বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষা সম্পর্কে (একাদশ অধ্যায়) তিনি বলছেন—ধর্ম প্রবৃত্তি সকল যথোচিত-রূপে উদ্রিক্ত না হইলে মনুষ্য কখনই সুখী হইতে পারে না। অতএব অবহিত হইয়া ছাত্রবর্গের ধর্মপ্রবৃত্তি সমস্তকে উদ্রিক্ত করা শিক্ষকগণের অবশ্য কর্তব্য-কর্ম, তাহার সন্দেহ নাই। যে পুস্তক পাঠ করানো যাউক, সর্বদাই যত্ন করিয়া সুনীতি সমস্তের অঙ্কুর শিশুদিগের হৃদয় ক্ষেত্রে

রোপণ করিতে হইবে। যদিও বিদ্যালয়ে পরমার্থ সম্বন্ধীয় কোন কথার অধিক আন্দোলন করার আবশ্যকতা নাই, তথাপি সে কতিপয় বিষয়ে মনুষ্য সাধারণের দৃঢ়বিশ্বাস আছে, যথা—ঈশ্বরের অস্তিত্ব, পাপ-পুণ্যের ভেদ এবং পবিত্র কর্মে তাঁহার তুষ্টি—এই সকল কথা শৈশবাবধিই বালকদিগের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া উচিত। তথা বয়োজ্যেষ্ঠ এবং গুরু সম্বন্ধীয় সকল লোকের প্রতি ভক্তি, দরিদ্র এবং দুঃখিত ব্যক্তিদের প্রতি দয়া এবং বয়স্যদের প্রতি সখ্য প্রকাশ করিয়া যথোচিত আচরণ করিতে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক।

ভূদেব ধর্মশিক্ষা প্রসঙ্গে 'সুনীতি সমস্তের অঙ্কুর শিশুদিগের হৃদয়ক্ষেত্রে রোপণ' সম্পর্কে যা বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে ধর্মশিক্ষার সঙ্গে নীতিশিক্ষাও পরিহার করা হয়েছে। এতে সুফল হয়েছে একথা এ যুগের শিক্ষাবিদরা স্বীকার করেন না। মুদালিয়ার কমিশন (১৮৫২-৫৯), কোঠারী কমিশন (১৮৬৪-৬৬), ধর্ম ও নীতি শিক্ষার পুনঃ প্রবর্তনের প্রয়োজন স্বীকার করেছেন।

বঙ্গদেশ যখন ইংরাজী ভাষার জয়ধ্বনিতে মুখরিত তখনও ভূদেব বুঝেছিলেন যে দেশবাসীর মাঝে শিক্ষার কথা, জ্ঞানের কথা, যদি সঞ্চারিত করে দিতে হয় তবে তা মাতৃভাষার মাধ্যমেই করতে হবে। মাতৃভাষার মাধ্যমেই জ্ঞানের নানা বিষয় এবং দেশ বিদেশের নানা সংবাদ দেশবাসীর কাছে পরিবেশনের জন্য তিনি 'শিক্ষাদর্শন ও সংবাদসার' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে। ভূদেব যে ভাষায় এবং যে ভাবে পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন, তাতে বাংলাদেশে জনশিক্ষা সম্পর্কে তাঁর সুগভীর সচেতনতা এবং আন্তরিক আকুলতা প্রকাশ পেয়েছে।

পত্রিকাটি প্রকাশের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে তাদের পরিপার্শ্ব ও সমাজ সম্পর্কে একটি সচেতন মনোভাব (Social awareness) সৃষ্টি করা ছিল ভূদেবের অন্যতম উদ্দেশ্য। পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভূদেব বলেন—'পল্লীগ্রামের লোকেরা কোন ভাল বিষয়ের কথা শুনিতে পায় না। তাহাদের মধ্যে কেবল দলাদলি আর নিমন্ত্রণের কথাই হইয়া থাকে। অতএব প্রামাণিক সংবাদপত্র সমস্ত হইতে কলোপধায়ক ও শ্রদ্ধাজনক কতকগুলি করিয়া সংবাদ উদ্ধৃতি করিয়া দিলে তাদৃশ লোকদিগের অনেক উপকার দর্শিতে পারে। সংবাদ গুলি কিছু পুরাতন হইবে বটে, কিন্তু নিতান্ত উপবাসক্লিষ্ট ব্যক্তিকে পর্য্যুষিতান্ন প্রদান করিলেও পুণ্য আছে। আর দেখ,

যে সকল আইন প্রচলিত আছে এবং মধ্যে মধ্যে প্রস্তাবিত ও প্রচলিত হইয়া যাইতেছে, তাহার মর্ম অনেকেই অবগত হয় না। অথচ আইন না জানায় লোকের যে দোষ হয়, আইন কিছু সেই দোষের দণ্ড দিতে ছাড়ে না। অতএব নিতান্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সমস্তের সার সংগ্রহ করিয়া দিলে পত্রিকার উপকারিতা এবং ইহার গৌরবও বৃদ্ধি হইতে পারিবে। ফলতঃ শিক্ষাশব্দের অর্থ কিঞ্চিৎ প্রশস্ত করিয়া লইলে 'শিক্ষাদর্পণের' মধ্যে লিখা যাইতে না পারে এমন কথাই নাই।'[১৯]

১৮৭২ সনে স্যার জর্জ ক্যাম্বেল উচ্চশিক্ষা সঙ্কোচের নীতি অনুসরণ করে বহরমপুর, কৃষ্ণনগর ও রাজসাহী কলেজ থেকে বি. এ. ক্লাস তুলে দেবার ব্যবস্থা করলেন। কলেজগুলিকে প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পরিণত করা হল। আবার মহম্মদ মহসীনের বিপুল দান হুগলী কলেজের জন্য ব্যয় না করে দেশের মুসলমান সন্তানদের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হবে স্থির হল। আসল কথা, ইংরেজ সরকার প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অতি দরদী হয়ে সেদিন যে উচ্চশিক্ষার আয়োজন সংকুচিত করেছিলেন তার কারণ সে-সময়ে উচ্চশিক্ষিত বাঙালী বৃটিশ শাসন সম্পর্কে বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করতে শুরু করেছিল।

সরকারের উপরোক্ত শিক্ষানীতি সম্পর্কে ভূদেব মন্তব্য করেছিলেন যে ইংরেজ আমলে এদেশের গ্রামীন সমাজ, গ্রামীন কুটীর শিল্প সব প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে, আর এদিকে আইন-আদালত ও ব্যবসার ভাষা হয়েছে ইংরেজী। ফলে দেশের চিরাচরিত প্রাথমিক শিক্ষার জন্য দেশবাসীর স্বাভাবিক আগ্রহ যথেষ্ট কমে গেছে। আর, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলস্বরূপ দেশে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী তৈরী হয়েছে, তারা উচ্চশিক্ষার জন্য আগ্রহশীল। এক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষা পুনর্বাসনের অজুহাতে দেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা সংকুচিত করা অত্যন্ত অনুচিত হবে।

সরকার প্রবর্তিত উচ্চশিক্ষার পথ ধরে দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নতুন নতুন জ্ঞানলাভের ব্যবস্থা হয়েছে আর এইসব নতুন নতুন জ্ঞানের কথা দেশবাসীর মধ্যে পরিব্যাপ্ত করে দেওয়াই আমাদের আকাঙ্খা।[২০]

ভূদেব শাসক-গোষ্ঠীর ঔপনিবেশিক স্বার্থপ্রণোদিত কূটনীতি বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি জানতেন যে প্রাথমিক শিক্ষার পুনর্বাসনের জন্য **'Sustained human action'**-এর প্রয়োজন। শাসকগোষ্ঠী সেজন্য কোন

আন্তরিক উদ্যোগ করবেন না, শুধু মুখেই সহানুভূতি প্রকাশ করছেন।

১৮৮২ সনের ৩রা ফেব্রুয়ারী জাতীয় শিক্ষা কমিশন (হাণ্টার কমিশন) নিযুক্ত হয়েছিল। ভূদেব এই কমিশনের সদস্য ছিলেন। কমিশনকে সাহায্য করবার জন্য বিভিন্ন প্রদেশে প্রাদেশিক কমিটি গঠিত হয়েছিল। ভূদেব বাংলাদেশের কমিটির সভ্য মনোনীত হয়েছিলেন। এই প্রাদেশিক কমিটির পক্ষ থেকে মূল কমিশনে যে রিপোর্ট দেওয়া হয়েছিল ভূদেব তার রচয়িতা ছিলেন।

কমিশন নিযুক্ত হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই ১৭/২/৮২ তারিখে ভূদেব বঙ্গদেশে প্রাথমিক শিক্ষার পরিচালনা ও প্রসার সম্পর্কে তদানীন্তন ছোটলাট ইডেন্ সাহেবকে এক দীর্ঘ পত্র লেখেন। পত্রটি ভূদেবের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে পরিণত চিন্তার একখানি মূল্যবান দলিল স্বরূপ। পত্রটি নীচে দেওয়া হল :

'আমার বোধ হইতেছে যে ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রেরিত এডুকেশন কমিশন বঙ্গদেশে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ও উন্নতিকল্পে ভূমির উপর শিক্ষা কর (সেস্) বসানোর প্রস্তাব অনুমোদন করিবেন। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে শিক্ষার অবস্থা দর্শনে এবং তদ্বিষয়ে পুস্তকাদি পাঠে আমার স্থির বিশ্বাস এই যে, যে প্রদেশে আমাদের বাঙ্গলার ন্যায় বহু গ্রাম্য পাঠশালা বিদ্যমান, সেখানে শিক্ষা করের টাকায় স্থাপিত স্কুলগুলি প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের সাহায্য করা দূরে থাকুক, উহার সঙ্কোচই করিবে। একটি উদাহরণ দ্বারা এই কথাটি সুস্পষ্ট করিবার চেষ্টা করিব। মনে করা যাউক কোন জেলার বার্ষিক খাজনা আদায় ২০ লক্ষ টাকা হয়। ইহার উপর শতকরা ১৲ টাকা সেস্ বসিলে বাৎসরিক আয় হইবে ২০ হাজার টাকা, অর্থাৎ মাসিক প্রায় ১৬০০৲ টাকা। শিক্ষকের মাসিক ৫৲ টাকা হিসাবে মাহিনা হইলে ইহাতে ৩৫০ জন গ্রাম্য পাঠশালার শিক্ষককে বেতন দেওয়া যাইতে পারে। বঙ্গদেশের জেলাগুলিতে সাধারণত পাঠশালার সংখ্যা এখনই প্রায় ১৫ শত করিয়া আছে। শিক্ষা সেস্ এর সাহায্যে পাঠশালা স্থাপিত হইলে পাঠশালার সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে না, সম্ভবতঃ তাহারা একটু বড় বড় গ্রামগুলিতে পুরাতন পাঠশালার স্থানই অধিকার করিবে।

যে সকল গ্রামে এক্ষণে পাঠশালা নাই, সেই গ্রামগুলিই বাছিয়া যদি তথায় এই নতুন শিক্ষা কর পুষ্ট পাঠশালাগুলি সংস্থাপিত করা হয়, তাহা

হইলে সেগুলি অতীব দরিদ্র গ্রামেই স্থাপিত করিতে হইবে। সেখানে পাঠশালার গুরুমহাশয়েরা গ্রামের জনসাধারণের নিকট কোন সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকায় অসন্তুষ্ট হইবে, ওদিকে আবার বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামগুলিতে পাঠশালার গুরু মহাশয়েরাও গবর্ণমেণ্ট সাহায্য হইতে অযথা বঞ্চিত হইয়াছেন মনে করিয়া অসন্তুষ্ট হইবেন এবং অন্তরে উপেক্ষাজনিত অসন্তোষের সৃষ্টি করিবেন। ইহার ফলে জেলার বর্তমান পাঠশালাগুলি অনাদৃত হইয়া বিনষ্ট হইবে। সকলেই শিক্ষা কর হইতে সাহায্যের চেষ্টাতেই থাকিবে।

আমি লক্ষ্য করিয়াছি যে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে শিক্ষা করের প্রবর্তনের সহিত এইরূপ প্রাচীন স্বতঃউৎপন্ন (ইণ্ডিজিনাস্) পাঠশালাগুলি উঠিয়া গিয়াছে। করের সাহায্যে স্থাপিত পাঠশালাগুলি তাহাদের পূর্বতন পাঠশালাগুলি অপেক্ষা সংখ্যাতেও অল্প এবং পাঠনাতেও নিকৃষ্ট। বাংলাদেশে শিক্ষা কর নাই। এখানে প্রাচীন দেশীয় পাঠশালাগুলি এখনও সজীব এবং সমাজের নিম্নস্তরের জনসাধারণের শিক্ষার অভাব পরিপূরণ করিতেছে। এ প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার করিতে হইলে ভূমির উপর শিক্ষা কর সংস্থাপনের প্রস্তাব পরিত্যাগ করাই উচিত।

প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য আমার নিজের একটি প্রস্তাব আছে। আমার ইচ্ছা করে যে, আপনার অনুমতি লইয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এ সম্বন্ধে একটি আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থাপিত করি। উহা অনেকটা ১৮৭০ সালের ৬ আইনের (চৌকিদারী আইনের) সদৃশ হইবে।

(১) গ্রামে গ্রামে প্রত্যেক চৌকিদারের এলাকায় একটি একটি করিয়া পাঠশালা স্থাপন করিতে হইবে। গ্রামে চৌকিদারের যেরূপ ভাবে নিয়োগ ও বেতন প্রাপ্তি হয়, সেইভাবে উক্ত পাঠশালার গুরুমহাশয়ের নিয়োগ এবং বেতন প্রাপ্তি চৌকিদারী পঞ্চায়েতের হাত দিয়া হইবে। এই আইন প্রবর্তন হইলে ইহার কর্মক্ষেত্র চৌকিদারী আইনের সহিত জেলা হইতে জেলান্তরে প্রসারণ হইতে থাকিবে এবং অবশেষে সমগ্র প্রদেশে বিস্তৃত হইবে।

এই উপায় অবলম্বনে স্থানীয় লোকের পরিচালনায় শিক্ষার বিস্তার সুচারুরূপে অনেকদূর পর্যন্ত হইতে পারে। কোনরূপ শিক্ষা করের অধীনে তাহা হয় নাই বা হওয়া সম্ভব নয়। পূর্বে গ্রাম্য সমাজের সজীব অবস্থায় যখন প্রতি গ্রামে গ্রাম্য শিক্ষক ছিলেন, এই আইনের প্রবর্তন অনেকটা সেই

অবস্থার নিকটবর্তী আনিয়া দেওয়ায় সেরূপ শুভফল প্রসূত করা সম্ভব।

আমার মনে হয় না যে ইহাতেও ন্যায়তঃ কোন আপত্তি থাকিতে পারে। আমি বাংলাদেশের শুভ উদ্দেশে আপনার নিকট এই প্রস্তাব করিলাম। আশা করি, আপনি ইহা গ্রহণ করিয়া টম্‌সন যেরূপে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে করিয়া গিয়াছেন, বাংলাদেশে তাহা অপেক্ষা মহত্তর স্থায়ী উপকার করিয়া যাইতে পারিবেন।[২১]

প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে পরবর্তী আলোচনায় দেখা যাবে যে হাণ্টার কমিশন জেলায় জেলায় স্কুল বোর্ড স্থাপনের প্রস্তাব করে প্রাথমিক শিক্ষার সর্বদায়িত্ব ঐ 'জেলা স্কুল বোর্ড গুলির উপরেই ছেড়ে দিলেন। সরকারকে প্রত্যক্ষ দায়িত্ব গ্রহণ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হল। অর্থসংস্থানের ব্যবস্থাও স্কুল বোর্ডগুলিকেই করতে বলা হল। সরকারকে স্থানীয় সংগৃহীত অর্থের অর্ধেক পরিমাণ অথবা প্রতিস্কুলের মোটব্যয়ের এক-তৃতীয়াংশ বহন করতে বলা হল। ১৯। ২। ৮২ তারিখে ভূদেব ছোটলাট ইডেন্-এর কাছে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে যে প্রস্তাব করেছিলেন, হাণ্টার কমিশন তার কোন অংশই গ্রহণ করলেন না। অথচ ৩০। ১১। ৮২ তারিখে ভূদেব তাঁর দ্বিতীয় পুত্রকে যে পত্র লেখেন, তা থেকে জানা যায় যে হাণ্টার সাহেব ভূদেব রচিত প্রাদেশিক রিপোর্টকে প্রথম শ্রেণীর রচনা বলে প্রশংসা করেছেন।[২২]

সে যাহোক, কমিশনের সুপারিশের বিশ-বাইশ বছর পরে ১৯০৪ সনে দেখা গেল বঙ্গদেশে প্রাথমিক শিক্ষা এতটুকুও প্রসারিত হয়নি বরং সঙ্কুচিত হয়েছে।

জাতীয় সংহতির স্বার্থে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশবাসীর মধ্যে হিন্দী ভাষার চর্চা একান্ত প্রয়োজন। ভূদেবই প্রথম বাঙালী যিনি তাঁর বিভিন্ন রচনার মধ্যে এই মত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে গেছেন। এসম্পর্কে ভূদেবের উক্তিগুলি নীচে দেওয়া হল—

(১) ভারতবাসীর চলিত ভাষাগুলির হিন্দী হিন্দুস্থানীই প্রধান এবং মুসলমানদের কল্যাণে উহা সমস্ত মহাদেশ ব্যাপক। অতএব অনুমান করা যাইতে পারে যে, উহাকে অবলম্বন করিয়াই কোন দূরবর্তী ভবিষ্যৎকালে সমস্ত ভারতবর্ষের ভাষা সম্মিলিত থাকিবে।[২৩]

(২) ভারতবর্ষের অধিক লোকই হিন্দী ভাষায় কথোপকথন করিতে সমর্থ। অতএব শুদ্ধ ভারতবাসীর বৈঠকে ইংরেজীর ব্যবহার না করিয়া হিন্দীতে

কথোপকথন করাই ভাল।[২৪]

(৩) ভারতবর্ষের সকল প্রদেশবাসী ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বণিক, প্রভৃতি মধ্যে প্রদেশ নির্বিশেষে আপনার বর্ণমধ্যে বিবাহ চলিলে ভারত সমাজ দৃঢ় সম্বদ্ধ এবং হিন্দী ভাষা অধিকতর প্রচলিত হইয়া উঠে। এইরূপ সংস্কার প্রার্থনীয়।[২৫]

উপরের উদ্ধৃতিগুলি থেকে দেখা যাচ্ছে ভূদেব আন্তঃ প্রাদেশিক ভাষা হিসাবে ভারতে হিন্দী প্রবর্তনের কথাই বলেন নি, গোঁড়া বাঙালী ব্রাহ্মণ হয়েও আন্তঃ প্রাদেশিক বিবাহের কথা ভেবেছিলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ বাসীর মধ্যে এক পরমাসংহতি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করা।

ভূদেব তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থ, পত্র, তাঁর প্রকাশিত পত্রিকা প্রভৃতির মাধ্যমে তাঁর শিক্ষা চিন্তার যে পরিচয় রেখে গেছেন, তা আলোচনা করলে একথা স্পষ্ট বোঝা যায় যে পরিপার্শ্ব, জীবিকা ও সমাজ অম্বিত করে একটি সার্থক শিক্ষা ব্যবস্থার কথাই তিনি চিন্তা করছিলেন। জাতীয় চরিত্রের সঙ্গে জাতীয় শিক্ষার সামঞ্জস্য সাধন ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। তিনি জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে যেমন সজাগ ছিলেন, গণশিক্ষার মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার সম্পর্কেও তেমনি সচেতন ছিলেন। এই দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার সঙ্গে ভূদেবের শিক্ষাচিন্তার কোথায় যেন একটি মিল দেখা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-১৮৯৪)

অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'নবজীবন' পত্রিকায় (প্রথমসংখ্যা ১২৯১, শ্রাবণ) বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন ধর্ম বিষয়ক প্রবন্ধগুলি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় ১২৯২ বঙ্গাব্দের চৈত্র পর্যন্ত। এই প্রবন্ধগুলির কিছু পরিবর্তন করে এবং আরও কয়েকটি নতুন প্রবন্ধ যোগ করে বঙ্কিমচন্দ্র "ধর্মতত্ত্ব, প্রথমভাগ, অনুশীলন," নামে গ্রন্থ ১৮৮৮ সনে প্রকাশ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র গুরুশিষ্যের কথোপকথন ছলে পুস্তকটিতে ধর্মতত্ত্ব তথা অনুশীলন তত্ত্ব বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। মানব সন্তানের আদর্শশিক্ষা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মতবাদ তাঁর অনুশীলন তত্ত্বেই বিবৃত ও ব্যাখাত হয়েছে।

অনুশীলন তত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিম বলছেন, মানুষের সুখ মনুষ্যত্বে। মনুষ্যজীবনের লক্ষ্য এই মনুষ্যত্ব অর্জন। মানুষের বৃত্তিগুলিকে সাধারণতঃ দু' ভাগে ভাগ করা যায়—শারীরিক ও মানসিক। এই শারীরিক ও মানসিক

বৃত্তিগুলির উপযুক্ত ফুর্তি, পরিণতি ও সামঞ্জস্যই হচ্ছে মনুষ্যত্ব, এই সামঞ্জস্যই হচ্ছে সুখ। ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির স্ফূর্তি ও পরিতৃপ্তিতে প্রকৃত সুখ নাই। সকল বৃত্তির স্ফূর্তি ও পরিতৃপ্তির সমবায়ই সুখ।

শারীরিক বৃত্তির অনুশীলন সম্পর্কে তিনি বলছেন,—শরীরবৃত্তির অনুশীলন দ্বারা দেহকে একটি শাণিত অস্ত্রের মত করতে হবে, যেন সে দেহ দিয়ে সর্ব কর্ম সিদ্ধ হয়। দেহকে এইভাবে তৈরী করবার উপায় (১) ব্যায়াম (২) শিক্ষা (৩) আহার (৪) ইন্দ্রিয় সংযম।

শারীর শিক্ষা প্রসঙ্গে বঙ্কিম বলছেন 'আমাদের দেশে এক্ষণে যে কলেজি শিক্ষা প্রণালী প্রচলিত তাহার প্রধান নিন্দাবাদ এই যে, ইহাতে শিক্ষার্থীদের শারীরিক স্ফূর্তির প্রতি বিন্দুমাত্র দৃষ্টি থাকে না। এজন্য কেবল শারীরিক নহে, মানসিক অধঃপতনও উপস্থিত হয়। ধর্ম—মানসিক শক্তির উপর নির্ভর করে। কাজে কাজেই ধর্মেরও অধোগতি ঘটে।[২৬]

মানসিক বৃত্তিগুলির মধ্যে কতগুলির কাজ জ্ঞানার্জন ও বিচার। কতগুলির কাজ কার্যে প্রবৃত্তি দেওয়া যথা ভক্তি, প্রীতি, দয়াদি। আর কতগুলির কাজ আনন্দের উপভোগ, সৌন্দর্য হৃদয়ে গ্রহণ, রসাগ্রহণ, চিত্তবিনোদন। যে মানসিক বৃত্তি জ্ঞান অর্জন করে, সেগুলিকে জ্ঞানার্জনী বৃত্তি, যেগুলি কার্যে প্রবৃত্ত করায় সেগুলি কার্যকারিণী বৃত্তি, আর যেগুলি আনন্দ অনুভূত করায় সেগুলি আহ্লাদিনী বা চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি বলা চলে। জ্ঞান, কর্ম, আনন্দ—এই ত্রিবিধ বৃত্তির ত্রিবিধ ফল। সচ্চিদানন্দ এই ত্রিবিধ বৃত্তির প্রাপ্য। এ প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, 'জ্ঞানার্জনী বৃত্তির মুখ্য ফল জ্ঞানলাভ, গৌণ ফল আনন্দ। কার্যকারিণী বৃত্তির মুখ্য ফল কার্যে প্রবৃত্তি, গৌণ ফল আনন্দ, কিন্তু চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তিগুলির মুখ্য ফলই আনন্দ—অন্য ফল নাই। পাশ্চাত্তেরা এগুলিকে 'Aesthetic Faculties' বলেন।" এইভাবে আলোচনা করে বঙ্কিম বলছেন, 'এখন মনুষ্যের সমুদয় শক্তিগুলিকে চারিশ্রেণীতে বিভক্ত করা গেল। (১) শারীরিকী (২) জ্ঞানার্জনী (৩) কার্যকারিণী (৪) চিত্তরঞ্জিনী। এই চতুর্বিধ বৃত্তিগুলির উপযুক্ত স্ফূর্তি, পরিণতি ও সামঞ্জস্যই মনুষ্যত্ব।[২৭/২৮]

প্রাচীন ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় ব্রহ্মচর্যাশ্রমে জ্ঞানার্জনীবৃত্তি এবং গার্হস্থ্যাশ্রমে কার্যকারিণী বৃত্তির (ভক্তি, প্রীতি, দয়া প্রভৃতি) অনুশীলন হত। বঙ্কিম বলছেন, জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সকলকেই অনুশীলন করতে হবে। জ্ঞানার্জন-

ভিন্ন অন্যবৃত্তির সম্যক্ অনুশীলন সম্ভব নয়। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রথম দোষ হচ্ছে—জ্ঞানার্জনী বৃত্তিগুলির প্রতি অধিক মনোযোগ, কার্যকারিণী বা চিত্তরঞ্জিনীর প্রতি প্রায় অমনোযোগ। শুধু তাই নয় পাশ্চাত্যের অনুকরণে আমরা মনে করি শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু জ্ঞানার্জন বৃত্তিগুলির স্ফুরণ, মনুষ্যত্ব অর্জন নয়।

বঙ্কিম আরও বলছেন—'এই কাণ্ডজ্ঞানহীন ভারসাম্যহীন জ্ঞান চর্চার ফলে এদেশে বাঙালীরা অমানুষ হইতেছে। তর্ককুশল, বাগ্মী বা সুলেখক—ইহাই বাঙালীর চরমোৎকর্ষের স্থান হইয়াছে। ইহারই প্রভাবে ইউরোপের কোন প্রদেশের লোক কেবল শিল্প কুশল, অর্থগৃধ্নু, স্বার্থপর হইতেছে; কোন দেশে রণপ্রিয়, পরস্বাপহারী পিশাচ জন্মিতেছে। ইহারই প্রভাবে ইউরোপে এত যুদ্ধ, দুর্বলের উপর এত পীড়ন। শারীরিক বৃত্তি, কার্যকারিণীবৃত্তি, মনোরঞ্জিনীবৃত্তি, যতগুলি আছে সকলগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য যোগ্য যে বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন তাহাই মঙ্গলকর; সেগুলির অবহেলা আর বুদ্ধিবৃত্তির অসঙ্গত স্ফূর্তি মঙ্গলদায়ক নহে। *** অনুশীলন নীতির মূল গ্রন্থি এই যে, সর্বপ্রকার বৃত্তি পরস্পর পরস্পরের সহিত সামঞ্জস্য বিশিষ্ট হইয়া অনুশীলিত হইবে; কেহ কাহাকেও ক্ষুন্ন করিয়া অসঙ্গত বৃদ্ধি পাইবে না।'[৯৯]

প্রচলিত শিক্ষা প্রণালীর আর একটি ত্রুটির দিকে বঙ্কিম অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। তিনি বলছেন—'আধুনিক শিক্ষা প্রণালীর দ্বিতীয় ভ্রম এই যে, সকলকে এক এক কি বিশেষ বিষয়ে পরিপক্ব হইতে হইবে—সকলের সকল বিষয় শিখিবার প্রয়োজন নাই। তাহা হইলে মানসিক বৃত্তির সকলগুলির স্ফূর্তি ও পরিণতি হইল কি? সবাই আধখানা করিয়া মানুষ হইল, আস্ত মানুষ পাইব কোথা? যে বিজ্ঞান কুশলী কিন্তু কাব্য রসাদির আস্বাদনে বঞ্চিত, সে কেবল আধখানা মানুষ অথবা যে সৌন্দর্যদগ্ধ প্রাণ, সর্ব সৌন্দর্যের রসগ্রাহী, কিন্তু জগতের অপূর্ব বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে, অজ্ঞ, সেও আধখানা মানুষ। উভয়েই মনুষ্যত্বহীন, সুতরাং ধর্মে পতিত। যে ক্ষত্রিয় যুদ্ধ বিশারদ কিন্তু রাজধর্মে অনভিজ্ঞ অথবা যে ক্ষত্রিয় রাজধর্মে অভিজ্ঞ কিন্তু রণবিদ্যায় অনভিজ্ঞ তাহারা যেমন হিন্দুশাস্ত্রানুসারে ধর্মচ্যুত, ইহারাও তেমনি ধর্মচ্যুত—এই প্রকৃত হিন্দু ধর্মের মর্ম।'[১০০]

শিক্ষা তত্ত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিম মানুষের বৃত্তিগুলির স্ফূরণ ও অনুশীলন সম্পর্কে কতগুলি মূল্যবান উক্তি করেছেন। তিনি বলছেন;

'মানুষের সকলবৃত্তির সমানভাবে স্ফুরণ সম্ভবত নয়, উচিৎও নয়। কতকগুলি বৃত্তি যথা ভক্তি, প্রীতি, দয়া—ইহাদের সম্প্রসারণ শক্তি অন্যান্য বৃত্তি অপেক্ষা অধিক এবং এইগুলির অধিক সম্প্রসারণই সকল বৃত্তির সামঞ্জস্যের মূল। পক্ষান্তরে আরও কতকগুলি বৃত্তি আছে। প্রধানতঃ কতগুলি শারীরিক বৃত্তি—সেগুলিও অধিক সম্প্রসারণ শক্তিশালিনী কিন্তু সেগুলির সঠিক সম্প্রসারণে অন্যান্য বৃত্তির সমুচিত স্ফূর্তির বিঘ্ন হয়।

সুতরাং সেগুলি যতদূর স্ফূর্তি পাইতে পারে ততদূর স্ফূর্তি পাইতে দেওয়া অকর্তব্য।[8১]

এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলছেন—আমাদের নিকৃষ্ট বা পাশব বৃত্তিগুলির সাংসারিক প্রয়োজন সিদ্ধির উপযোগী স্ফূর্তি হলেই যথেষ্ট। এ বৃত্তিগুলির স্ফুরণের জন্য কোন চেষ্টা করা উচিত নয়। যেগুলিকে আমরা নিকৃষ্ট বৃত্তি বলি, সেগুলি এত শক্তিশালী যে অতি সহজেই তারা উচিতমাত্রা অতিক্রম করে বৃদ্ধি পায়। এগুলির দমনই যথার্থ অনুশীলন।

অনুশীলনের জন্য তিনটি বিষয় প্রয়োজন—(১) সময় (২) শক্তি (৩) অনুশীলনের উপাদান। আমাদের জীবনে সময় ও শক্তি উভয়ই সংকীর্ণ, তাই যে বৃত্তি অনুশীলন-সাপেক্ষ নহে অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্ত তাহার অনুশীলন জন্য সময় দিব না; যাহা অনুশীলন-সাপেক্ষ তাহার অনুশীলনে সকল সময়টুকু দিব।[8২]

অনুশীলন তত্ত্বের আলোচনার গোড়াতেই বঙ্কিম লক্ষ্য করেছেন সবদেশে সবকালে মানুষ জীবনের সুখ খুঁজছে। এই সুখের অন্বেষণ মানুষকে চালিত করছে। সকলেই সুখের কামনা করেছে, কেউই সুখ পাচ্ছে না। তাই অনুশীলনতত্ত্বে তিনি চিন্তা করেছেন প্রকৃত সুখ কি এবং কোন ধরনের অনুশীলনের ফলে মানুষ প্রকৃত সুখের অধিকারী হতে পারে। যে অনুশীলন বা চর্চার ফলে মানুষ জীবনে প্রকৃত সুখী হতে পারে, মানুষের সার্থক শিক্ষা বলতে সেই অনুশীলনকেই বুঝতে হবে। বঙ্কিম সর্বমানবের জন্য এই অনুশীলনের স্বরূপ উদ্ঘাটন ও বিশ্লেষণ করেছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে বিশেষ করে, ইংলণ্ডে হিতবাদীরাও (লক্, বেনথাম্) সুখতত্ত্ব নিয়ে গভীর চিন্তা করেছেন এবং ব্যক্তির সুখ ও সমাজের সুখ—এ-দুইয়ের সামঞ্জস্য করতে চেয়েছেন। প্রবৃত্তির চরিতার্থতা হলে ব্যক্তির সুখ হয়। যদি ধরে নিই যে সে প্রবৃত্তি সুপ্রবৃত্তি তবুও তাতে

সমাজের সুখ নাও হতে পারে। তাই হিতবাদীরা ব্যক্তি সুখ ও সমাজ সুখ এর সামঞ্জস্য করতে গিয়ে বলেছেন **greatest good of the greatest number** অর্থাৎ সবচেয়ে বেশী মঙ্গল চাই সবচেয়ে বেশী সংখ্যক মানুষের জন্য। কিন্তু এতথ্যে অসম্পূর্ণতা এইখানে যে একের যা সুখ অপরের তা সুখ নাও হতে পারে। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য একটি সর্বকালের স্বীকৃত সত্য। বঙ্কিম হিতবাদের অন্তর্নিহিত এই সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন।

তাই তিনি অনুশীলনের এমন সংজ্ঞা খুঁজেছেন যা সকল কালে সকল মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তিনি ঈশ্বর-বিশ্বাসী তাই বলেছেন ঈশ্বর-মুখিতাই উপযুক্ত অনুশীলন। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, বঙ্কিমচন্দ্র 'অনুশীলনকে' একটা ভক্তিমূলক সাধনায় পর্যবসিত করেননি। তিনি জ্ঞানমার্গের পথিক। জ্ঞানের মধ্যে অনুশীলনের ভিত্তি খুঁজেছেন। কোন্ বৃত্তির কতটুকু অনুশীলন করলে মনুষ্যত্ব অর্জন করা যায়, সুখী হওয়া যায়, কোন্ সুখ স্থায়ী, কোন্ সুখ দুঃখের নামান্তর—এ সবের নির্দেশ পাওয়া যাবে জ্ঞানচর্চায়। বঙ্কিম বলছেন জ্ঞানভিন্ন তুমি ঈশ্বরকেও জানিতে পারিবে না।'[৪৪]

তাই বঙ্কিম অনুশীলনের মাধ্যমে তৈরী করতে চেয়েছেন জ্ঞানবান, ভক্তিমান মানুষ যিনি সকল সুখেরই স্বরূপ চিনেছেন এবং সকল সাধনা ঈশ্বরে সমর্পণ করতে শিখেছেন।

উপরের আলোচনা থেকে এ সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে বঙ্কিমচন্দ্র অনুশীলন বলতে ভারতীয় হিন্দুর আদর্শ জীবন-চর্চার যে রূপ উপলব্ধি করেছিলেন, তার কথাই বলেছেন, গীতার কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তিযোগের সমন্বয়ের কথাই বলেছেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় যে পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, এমন কি শ্রী অরবিন্দ যে বিস্তারিত শিক্ষাচিন্তা আমাদের দিয়েছেন, তারও মুখ্য ভাবনা গীতার এই জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বয়।

মনীষী বঙ্কিম ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের মানব সন্তানের জন্য আদর্শ শিক্ষা হিসাবে তাঁর অনুশীলনতত্ত্বের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণই শুধু করেননি; ইংরেজ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ইংরেজী শিক্ষা এবং সেই সঙ্গে সরকারের 'নিম্ন পরিস্রবন নীতি' এদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সমাজে যে নিদারুণ অমঙ্গলের সূচনা করেছিল, 'বঙ্গদর্শনে' বিভিন্ন প্রবন্ধের সাহায্যে সে সম্পর্কেও দেশবাসীকে অবহিত ও সতর্ক করে দিয়েছেন। নিম্ন পরিস্রবন নীতির অসারতা ও অযৌক্তিকতা এবং ইংরাজী শিক্ষার প্রসারে এ দেশে লোকশিক্ষার

ক্রমাবলুপ্তি সম্পর্কে উনবিংশ শতাব্দীতে দু'জন বঙ্গ মনীষী বিশেষভাবে চিন্তা করেছিলেন, একজন রেভারেণ্ড লালবিহারী দে, অপরজন বঙ্কিমচন্দ্র।

১৮৩৫ সনে মেকলের পরামর্শে বড়লাট বেন্টিঙ্ক প্রাচ্য শিক্ষা বাতিল করে এদেশে ইংরেজী শিক্ষা এবং সেই সঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে ফিলট্রেশন্ নীতি প্রবর্তন করেছিলেন। সরকারের উগ্র পৃষ্ঠপোষকতায় ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তিত হওয়ার ফলে দেশের মানুষ অল্প কালের মধ্যেই ইংরেজী জানা এবং ইংরেজী না জানা এই দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত হতে লাগল। এদের বিভেদ বাড়তে বাড়তে এমন দুস্তর হয়ে উঠল যে একের জন্য অপরের কোন সহৃদয়তা বা সমবেদনা রইল না, একের সুখ দুঃখের সঙ্গে অপরের সুখদুঃখের ক্ষীণতম যোগসূত্রও ছিন্ন হয়ে গেল। এই করুণ অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে বঙ্কিম বলছেন—'শিক্ষিত অশিক্ষিতের হৃদয় বুঝে না। শিক্ষিত অশিক্ষিতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। মরুক রামা লাঙ্গল চষে, আমার ফাউলকারী সুসিদ্ধ হইলেই হইল। রামা কিসে দিন যাপন করে, কি ভাবে, তার কি অসুখ, তার কি সুখ, তাহা নদের ফটিকচাঁদ তিলার্ধ মনে স্থান দেয় না। বিলাতে কানা ফসেট সাহেব, এদেশে স্যার অস্‌লি ইডেন, ইঁহারা তাহার বক্তৃতা পড়িয়া কি বলিবেন; নদের ফটিকচাঁদের সেই ভাবনা। রামা চুলোয় যাক্, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। তাহার মনের ভিতর যাহা আছে, রামা এবং রামার গোষ্ঠী—ছয়কোটি যাটলক্ষের মধ্যে ছয়কোটি উনষাট লক্ষ উননব্বই হাজার নয়শ—তাহারা তাহার মনের কথা বুঝিল না'।[৩৪]

এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় নিম্ন পরিস্রবন নীতির সমালোচনা করে বঙ্কিম বলেছেন, 'এক্ষনে একটা কথা উঠিয়াছে, এডুকেসন্ ফিলটার ডৌন করিবে। কথার তাৎপর্য এই যে, কেবল উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা সুশিক্ষিত হইলে অধঃশ্রেণীর লোকদিগকে পৃথক শিখাইবার প্রয়োজন নাই; তাহারা কাজে কাজেই বিদ্বান হইয়া উঠিবে। যেমন শোষক পদার্থের উপরিভাগে জলসেচ করিলেই, নিম্নস্তর পর্যন্ত সিক্ত হয়, তেমনি বিদ্যারূপ জল বাঙালীজাতি রূপ শোষক মৃত্তিকার উপরিস্তরে ঢালিলে নিম্নস্তর অর্থাৎ ইতরলোক পর্যন্ত ভিজিয়া উঠিবে। জল থাকাতে কথাটা একটু সরস হইয়াছে বটে। ইংরাজী শিক্ষার সহিত এরূপ জলযোগ না হইলে আমাদের দেশের উন্নতির এত ভরসা থাকিত না। জলও অগাধ, শোষকও অসংখ্য। এতকাল শুষ্ক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা দেশ উৎসন্ন দিতে ছিল; এক্ষণে নব্য সম্প্রদায় জলযোগ করিয়া দেশ উদ্ধার

করিবেন। কেন না, তাহাদিগের ছিদ্রগুণে ইতর লোক পর্যন্ত রসার্দ্র হইয়া উঠিবে। * * *

সে যাহাই হউক, আমাদিগের দেশের লোকেরা এই জলময় বিদ্যা যে এতদ্দূর গড়াইবে, এমত ভরসা আমরা করি না। বিদ্যা জল বা দুগ্ধ নহে যে, উপরে ঢালিলে নীচে শোষিবে। তবে কোন জাতির একাংশ কৃতবিদ্য হইলে তাহাদিগের সংসর্গ গুণে অন্যাংশের শ্রীবৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু যদি ঐ দুই অংশের ভাষায় এরূপ ভেদ থাকে যে বিদ্যানের ভাষা মূর্খে বুঝিতে পারে না, তবে সংসর্গের ফল ফলিবে কি প্রকারে?[35]

ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে বঙ্গদেশের লোক-শিক্ষার সকল সনাতন আয়োজন কি ভাবে ধীরে ধীরে লুপ্ত হচ্ছিল এবং দেশের অগণিত জনসাধারণ কিভাবে ধীরে ধীরে নিজেদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি হারিয়ে এক অসহণীয় করুণ অবস্থায় উপনীত হচ্ছিল বঙ্কিম তাঁর 'লোকশিক্ষা' প্রবন্ধে তা আলোচনা করেছেন। এই বাংলা দেশে এককালে লোকশিক্ষার জন্য যাত্রা, কথকতা, কবিগান প্রভৃতির প্রচলন ছিল। এককালে এইসব প্রচলিত ব্যবস্থার মাধ্যমে—'যে লাঙ্গল চষে, যে তুলা পেঁজে, যে কাটনা কাটে, যে ভাত পায়, যে না পায়, সেও শিখিত যে ধর্ম নিত্য, যে ধর্ম দৈব, যে আত্মান্বেষণ অশ্রদ্ধেয়, যে পরের জন্য জীবন, যে ঈশ্বর আছেন, বিশ্বসৃজন করিতেছেন, বিশ্ব ধ্বংস করিতেছেন, যে পাপ পুণ্য আছে, যে পাপের দণ্ড, পুণ্যের পুরস্কার আছে। যে জন্মে আপনার জন্য নহে, পরের জন্য, যে অহিংসা পরম ধর্ম, যে লোকহিত পরমকার্য—সে শিক্ষা কোথায়? সে কথক কোথায়? কেন গেল? বঙ্গীয় নব্যযুবকের কুরুচির দোষে * * * এই অল্প ইংরেজীতে শিক্ষিত স্বভ্রষ্ট কদাচার, দুরাশয়, অসার অনালাপ্য, বঙ্গীয় যুবকের দোষে লোকশিক্ষার আকর কথকতা লোপ পাইল। ইংরাজী শিক্ষার গুণে লোকশিক্ষার উপায় ক্রমে লুপ্ত ব্যতীত বর্ধিত হইতেছে না।[36]

কাজেই একদিকে দেখা যায় দেশে ইংরেজী ভাষায় পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে প্রচলিত লোকশিক্ষার স্রোত রুদ্ধ হয়েছে' অন্যদিকে নব্যশিক্ষার স্রোত প্রবাহিত হয়ে জনসাধারণের তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারেনি। বঙ্কিমচন্দ্র এবিষয়গুলির দিকে সচেতন ছিলেন, জানতেন 'শিক্ষিত অশিক্ষিতের বেদনা বুঝে না।' তিনি মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের সমর্থক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের

শিক্ষাচিন্তা এর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না। তিনি শিক্ষার পরমলক্ষ্য বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য সাধন ও মনুষ্যত্ব অর্জনের উপর জোর দেন। ফরাসী দার্শনিক কোঁৎ (comte) ও আচার্য সীলির প্রভাব তাঁর উপরে অবশ্য ছিল, কিন্তু তাঁর সঙ্গে তিনি মিলিয়ে নেন গীতার ঐক্য-আদর্শকে। এই খানে বঙ্কিমের শ্রেষ্ঠত্ব।

ইংরেজী শিক্ষার প্রসার

(১৮৮২—১৯০৬)

১৮৮২ সনে হান্টার কমিশন নিযুক্ত হল। কমিশনকে বলা হল 'To specially bear in mind the great importance which the Government attach to the subject of Primary Education'. তাই কমিশনের প্রধান লক্ষ্য হল এদেশে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ও উন্নতির জন্য পন্থা নির্দেশ করা। কমিশন বললেন, 'সরকারের পক্ষে সেকেণ্ডারী স্কুলগুলি পোষন ও পরিচালন অত্যন্ত ব্যায়সাধ্য, সেইজন্য দেশের সেকেণ্ডারী স্কুলগুলির ভার ও দায়িত্ব বেসরকারী প্রচেষ্টার হাতে ছেড়ে দিয়ে সরকারের কর্তব্য হবে সেকেণ্ডারী স্কুলের দায়-দায়িত্ব থেকে যথাসম্ভব সরে আসা এবং প্রাথমিক শিক্ষার সমগ্র ভার ও দায়িত্ব বহন করা।' আসল কথা, উড্ সাহেবের ডেস্‌প্যাচের পর থেকে ইংরেজী স্কুল বা সেকেণ্ডারী স্কুল প্রতিষ্ঠা নিয়ে এদেশে যে প্রচণ্ড উৎসাহ উদ্দীপনা প্রকাশ পেয়েছিল, তাকে প্রতিরোধ করার সাধ্য সরকারের ছিলনা। তাই সরকারকে শিক্ষার ঐ বিশেষ ক্ষেত্র থেকে সরে আসার পরামর্শ ছাড়া অন্য কোন পন্থা নির্দেশের কথা কমিশন ভাবতে পারলেন না।

কিন্তু মাধ্যমিক শিক্ষাব ক্ষেত্রে একটা মূল্যবান নির্দেশ হান্টার কমিশন দিতে পারতেন। সারা দেশ জুড়ে রাশি রাশি তথ্য সংগ্রহ করে তাদের বোঝা উচিত ছিল যে ১৮৮২ সনে বাংলা ভাষা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি দিক্‌পালের প্রচেষ্টায় এত সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল বঙ্গদেশে মাধ্যমিক শিক্ষার বাহন সার্থক ভাবেই বাংলা ভাষা হতে পারত। কিন্তু এ বোধ কমিশনের হয়নি, হলে বাংলাদেশে বাংলাভাষাকে মাধ্যমিক শিক্ষার বাহন হিসাবে তাঁরা সানন্দে স্বীকৃতি দিতে পারতেন। দেশের দুর্ভাগ্য যে এ-চিন্তার পাশ দিয়ে তাঁরা গেলেন না। এদিকে বাঙালীর ইংরেজী শিখবার আগ্রহ ও উদ্যোগ ক্রমেই বেড়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যাও বাড়তে লাগল।

১৯০২ সনে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বললেন, ইংরেজীর মাধ্যমে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার ফলে ছেলে মেয়েরা ইংরেজীও শিখছে না এবং প্রকৃত

জ্ঞান লাভও করতে পারছে না। ছেলেমেয়েরা প্রধানত মুখস্থ করে শিক্ষার কাজ শেষ করছে।

১৯০৪ সনের ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন মাধ্যমিক স্কুলগুলির শিক্ষা মানের অবনতি প্রতিরোধ করার জন্য ওগুলির উপর সরকারী তদারকের ব্যবস্থা করল। নিয়ম করা হল, দেশের সব মাধ্যমিক স্কুলের জন্যই সরকারী শিক্ষাবিভাগের স্বীকৃতি (Recognition) অবশ্য প্রয়োজন হবে। আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ছাত্র পাঠাতে হলে ঐ সব স্কুলের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতিও চাই।

এত কড়াকড়ি করেও, উপরোক্ত দ্বৈতশাসন প্রবর্তন করেও, মাধ্যমিক শিক্ষা, তথা ইংরেজী শিক্ষার দ্রুত প্রসার রোধ করা গেল না। তাই শিক্ষা বিভাগ পরিচালিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বহুকাল অনেকটা স্থির থাকলেও, বে-সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৮৭০-এ ছিল ১৩২, ১৮৮০-৮১ তে হল ২১৮, ১৮৯১-৯২-তে হল ৩৫৩ এবং ১৯০১-১৯০২-তে দাঁড়াল ৫৩৫।[1]

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এই বিস্ময়কর প্রসারের অবশ্য অন্য কারণ ছিল। ইংরেজ তখন এদেশে তার শাসন কায়েম করেছে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ইংরেজীর মাধ্যমে লেখাপড়া শেখার সঙ্গে চাকরী বা জীবিকার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে। বঙ্গসমাজে সরকারী বা বেসরকারী চাকরীতে ইংরেজী জানা যোগদানকারী নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ও প্রসার হচ্ছে। এরাই সে-দিনের 'বাবু' বা ভদ্রলোক শ্রেণী।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রসার বাংলা সমাজে এই নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রসারের অভ্রান্ত ইঙ্গিত।

প্রাথমিক শিক্ষা (১৮৮২-১৯০৬)

হাণ্টার কমিশন ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মত বাংলাদেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের কাছ থেকেও প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে মতামত সংগ্রহ করলেন। এইসব নেতৃস্থানীয় বাঙালী কমিশনের কাছে যে মতামত ব্যক্ত করেছেন তা থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে তদানীন্তন শিক্ষিত বাঙালীর চিন্তাধারার একটা পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। বাংলাদেশে সে সময় সরকারী উদ্যোগে যে প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন হচ্ছিল তাতে বাংলার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বিশেষ আস্থা

ছিল না। তাঁরা সবাই প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি তদারকি বা কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে মত পোষণ করেছেন। তাঁদের প্রায় সকলেরই মত যে দেশীয় পাঠশালাগুলিকে ভিত্তি করেই তাদের পাঠ্যক্রম, পরিচালনা পদ্ধতি প্রভৃতি বজায় রেখেই বঙ্গদেশে জনশিক্ষার প্রসার বাঞ্ছনীয়।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৯৪) ছিলেন সে যুগে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ-'অথরিটি'। তিনি হাণ্টার কমিশনের কাছে সাক্ষ্যদান কালে বলছেন যে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির ব্যাপারে স্থানীয় জমিদারদের সঙ্গে সহযোগিতা করাই সরকারের পক্ষে যুক্তিযুক্ত। কিন্তু যে ক্ষেত্রে ঐ সহযোগিতা পাওয়া যাবে না, সে ক্ষেত্রে দরিদ্র জনগণকে অজ্ঞানের অন্ধকারে না রেখে সরকারের পক্ষে যতটা সম্ভব প্রত্যক্ষ দায়িত্ব নেওয়াই সমীচীন হবে।[2]

Association for the Cultivation of Science-এর প্রতিষ্ঠাতা (প্রতিষ্ঠা বর্ষ-১৮৭৬) ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার (১৮৩৩-১৯০৪) কমিশনকে বলেন, নিম্নসর্তগুলি পূর্ণ না হলে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা উত্তম ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একথা বলা চলবে না। সর্তগুলি হচ্ছে:

(১) এ শিক্ষা আর্থিক অবস্থা বা সামাজিক মর্যাদা নির্বিচারে সমাজের সকল শ্রেণীর শিশুর পক্ষে সুলভ্য হওয়া প্রয়োজন।

(২) সমাজের যে সব শ্রেণী তাদের সন্তানদের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে না, তাদের সন্তানদের শিক্ষার প্রয়োজন এই প্রাথমিক শিক্ষাকে মিটাতে হবে।

(৩) এ শিক্ষা উচ্চ শিক্ষার ভিত্তি হবে।[3]

প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি বিধান সম্পর্কে তিনি বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা এমনভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত যেন তা দেশের বৃহৎ থেকে বৃহত্তর অংশে পরিব্যাপ্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থায় পৌছায় যেন দেশের কোন শিশুই সে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয়। আর পাঠক্রমও দেশীয় পাঠশালার পাঠক্রমের মতই হওয়া বাঞ্ছনীয় অর্থাৎ লেখা মানসাঙ্ক, ক্ষেত্রতত্ত্ব এবং এগুলির সঙ্গে বিভিন্ন সাধারণ বস্তু ও তাদের গুণ ও ধর্মের আলোচনা। এই শেষোক্ত পাঠ্যবস্তুই হবে প্রকৃত উচ্চ শিক্ষার ভিত্তি।[4]

অল্পকথায় ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার চেয়েছেন দেশীয় পাঠশালার মাধ্যমে প্রকৃত সর্বজনীন শিক্ষা, পাঠশালাতেই প্রাথমিক বিজ্ঞান চর্চা এবং এরই সঙ্গে চাইছেন পাঠশালার শিক্ষা যেন গ্রামজীবনের পক্ষে স্বয়ং সম্পূর্ণ হয় এবং

উচ্চশিক্ষার ভিত্তি হয়।

রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-১৮৮৫) কমিশনকে বলেন : বাংলা দেশের ছোটবড় সব গ্রামেই দেশীয় পাঠশালা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা আছে এবং এই সব পাঠশালার উন্নতির জন্য সরকারের উচিত স্থানীয় জমিদারদের সহযোগিতা যাচ্ঞা করা এবং তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করা। অকালে যদি প্রাথমিক শিক্ষার আমূল পরিবর্তনের চেষ্টা না করা হয় এবং গুরুমশায়দের যদি অপসারিত হওয়ার আশঙ্কা না থাকে, তবে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে সরকারী অর্থ ব্যয় হবে, তার সুফল সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যেতে পারে।[৮]

রেভাঃ কৃষ্ণমোহন সরকার-প্রবর্তিত 'প্রাইমারী স্কুল' চাইছেন না। দেশীয় পাঠশালার দেশব্যাপী প্রসার এবং সরকারী কর্তৃত্ব নয়, সরকারী সহযোগিতা।

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর সাক্ষ্যে বলেন—দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির উন্নতি সাধন করতে হলে দেশবাসীকে সঙ্গে নিতে হবে এবং তাদের ইচ্ছামত স্কুলগুলি গড়বার স্বাধীনতা তাদের দিতে হবে। সমগ্রজাতি যদি এই শিক্ষা-ব্যবস্থা গ্রহণ না করে তবে এর উন্নতি ও প্রসার সম্ভব নয়।

তিনি আরও বলেন, দেশে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারের ব্যাপ্যারে দেশীয় পাঠশালাগুলিকেই আমি যথার্থ 'নিউক্লিয়াস' বা একক মনে করি এবং বঙ্গ-সরকার সে কথা মেনে নিয়েছেন। গ্রাম্য পাঠশালার পরিচালনার ভার আমি গ্রাম-প্রধানদের হাতে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে করি। এর ফলে, তাঁরা পাঠশালার উন্নতির জন্য সচেষ্ট হবেন এবং এ সম্পর্কে দায়িত্ব বোধ করবেন।

তাছাড়া নীতিগত ভাবে আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির জন্য সরকারী অনুদান সমর্থন করি না। এ অনুদান প্রথা সম্পূর্ণ অস্বাস্থ্যকর। সরকারী অনুদান যদি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে নিতেই হয়, তবে তা নেওয়া উচিত স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন সংস্থার কাছ থেকে, সরাসরি সরকারের থেকে নয়।[৯]

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র দেশীয় পাঠশালার প্রসারের দ্বারাই প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেন। তিনি সরকারের প্রাইমারী স্কুল চাইছেন না, সরকারী অনুদানকেও অস্বাস্থ্যকর মনে করছেন।

তিনি পাঠশালার পরিচালনার ভারও গ্রাম প্রধানদের হাতে তুলে দেওয়ার সুপারিশ করছেন। অল্প কথায় প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি

কোনও প্রকার সরকারী হস্তক্ষেপের পক্ষপাতী নন।

'হিন্দু পেট্রিয়ট' সম্পাদক কৃষ্ণদাস পাল (১৮৩৮-১৮৮৪) কমিশনকে বললেন, গুরুমশায়দের পাঠশালাগুলি এযাবৎকাল জনশিক্ষার প্রয়োজন মিটিয়ে এসেছে। ঐ পাঠশালাগুলিতেই দেশের ছেলেরা পাটিগণিত, জমিদারি ও ব্যবসা-সংক্রান্ত হিসাব প্রভৃতি শিখত এবং ঐ বিদ্যা নিয়েই তারা অতীতে জমি জরিপ, ব্যবসা এবং বিচার সংক্রান্ত কাজ চালাতে পারত।

কিন্তু বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা অনেকটা-ভ্রান্তিজনক। বলা হয় যে এ ব্যবস্থায় প্রাচীন ব্যবস্থার সঙ্গে আধুনিক ব্যবস্থায় সংযোজন হয়েছে, কিন্তু বর্তমান প্রাইমারী স্কুলগুলিতে প্রাচীন দেশীয় পাঠশালার কোন লক্ষণই খুঁজে পাওয়া যায় না।***

আমি মনে করি প্রাচীন পাঠশালার প্রকৃষ্ট ধারাগুলি বর্তমান প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতেও অক্ষুণ্ণ রাখা প্রয়োজন অর্থাৎ এগুলিতে পাঠ্য হওয়া উচিত শুভঙ্কর পদ্ধতিতে মানসিক ও লিখিত পাটিগণিত, হস্তলিপি, জমিদারি খাতাপত্র লেখা ও জমিদারি হিসাব রাখা, ব্যবসা সংক্রান্ত হিসাবপত্র ইত্যাদি।[৭]

প্রখ্যাত বঙ্গপ্রধানদের কয়েকজন হাণ্টার কমিশনের কাছে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তার কিছু কিছু অংশ উপরে উদ্ধৃত করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে এরা কেউই সরকারী প্রাইমারী স্কুল চাইছেন না। সরকারী প্রাইমারী স্কুলের উপর এঁদের কারও আস্থা নেই। এঁরা সবাই প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে প্রত্যক্ষ সরকারী তদারকির বিরুদ্ধে মত পোষণ করেছেন; এমন কি, সরকারী অনুদানও পছন্দ করছেন না। সকলেই দেশীয় পাঠশালাগুলিকে ভিত্তি করে, সেগুলির পাঠক্রম, পরিচালনা পদ্ধতি সব অক্ষুণ্ণ রেখেই বঙ্গদেশে প্রাথমিক শিক্ষা তথা জনশিক্ষার প্রসার চাইছেন।

১৮৮৩–১৮৮৪ র মধ্যে আইন সভায় কতগুলি জনহিতকর আইন পাশ হয়। এই আইনগুলির মধ্যে মিউনিসিপাল আইন এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইন উল্লেখযোগ্য। এই দুইটি আইনই দেশে প্রাথমিক শিক্ষা সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। হাণ্টার কমিশন সরকারী আওতা থেকে প্রাথমিক শিক্ষাকে মুক্ত করে উপরোক্ত দুই আইনের বলে প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় সংস্থার হাতে প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করলেন। কমিশন বললেন

জেলা বা মিউনিসিপাল বোর্ডের যে ভৌগোলিক সীমা তাকেই প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপারে এক একটি অঞ্চল বলে ধরে নিতে হবে এবং ঐ বোর্ড বা তার মনোনীত সাবকমিটি এই সব অঞ্চলে স্কুল বোর্ড হিসাবে আখ্যাত হবে এবং প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে সর্বময় কর্তৃত্ব পরিচালনা করবে। কমিশন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকেও স্কুলবোর্ডের কর্তৃত্বাধীনে আনবার সপক্ষে মত দিলেন। শেষোক্ত ব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হল। বহু সরকার পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয় বলিষ্ঠ সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হয়ে দুর্বল স্কুল বোর্ডের অধীনে এল।

প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় নিবাহের জন্য কমিশন সুপারিশ করলেন যে প্রত্যেক জেলা ও মিউনিসিপাল বোর্ডকে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য একটি অর্থ ভাণ্ডার সৃষ্টি করতে হবে, সরকারকে শিক্ষাসংক্রান্ত সকল ব্যয়-ব্যাপারে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়কেই অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং প্রাথমিক শিক্ষার মোট ব্যয়ের এক-তৃতীয়াংশ সরকারকে বহন করতে হবে। কমিশন প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অর্থের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করলেন, কিন্তু পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে স্কুলে গ্রাণ্ট বিতরণের নীতি (Payment of grant by results) অনুসরনের পরামর্শ দিয়ে মারাত্মক ভুল করলেন। এ-নীতির ফলে অনিচ্ছুক শিক্ষক খানিকটা যন্ত্রের মত কর্মলিপ্ত হল বটে, কিন্তু বিদ্যালয়ের শিক্ষা-পরিবেশ যান্ত্রিক ও অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠল।

কমিশন প্রাথমিক পাঠ্যক্রমেরও কিছু পরিবর্তনের নির্দেশ দিলেন। দেশীয় গণিত, হিসাব নিকাশ, জমি-জারপ, সাধারণ বিজ্ঞান ও কৃষি বিদ্যা, স্বাস্থ্যতত্ত্ব এবং শিল্পকলায় বিজ্ঞানের প্রয়োগ সম্পর্কে কিছু শিক্ষা পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হল। শিক্ষক-শিক্ষণ সম্পর্কে কমিশন বললেন, প্রত্যেক মহকুমায় অন্তত একটি করে-শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয় প্রয়োজন।

কমিশনের নির্দেশ অপসরণ করার ফলে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন বা প্রসার যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। ১৮৭০-৭১ থেকে ১৮৮১-৮২ সময় মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা যতটা প্রসারিত ও প্রাণবন্ত হয়েছিল, ১৮৮২-র পর থেকে সে গতি ও সজীবতা মন্থর হয়ে এল।

১৯০৪ সনের ১১ই মার্চ শিক্ষা-সম্পর্কিত প্রস্তাবে (Government Resolution of March 11, 1904) সরকার হতাশার সঙ্গে স্বীকার করলেন :— 4 villages out of 5 are without schools ; 3 boys out

of 4 grow up without education and only 1 girl in 40 attends any kind of school.[৪] অর্থাৎ দেশের যে কোন পাঁচটি গ্রামের মধ্যে চারটিতেই কোন বিদ্যালয় নেই ; যে কোন চারটি ছেলের মধ্যে তিনটিই কোন রকম লেখাপড়া না শিখে বড় হয়, আর চল্লিশটির একটি বালিকা স্কুলে পড়ে।

এ খেদোক্তির অর্থ হচ্ছে ইংরেজ সরকার উনবিংশ শতকে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন সম্পর্কে যা করেছেন তার ফল পুরোপুরি নৈরাশ্য-জনক। সরকারী প্রচেষ্টার এ নিষ্ফলতার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে এ-ব্যর্থতার মূলে আছে সরকার-অনুসৃত ভ্রান্ত শিক্ষানীতি এবং আমলাতান্ত্রিক পরিচালনা।

প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে সরকারের প্রথম ভুল হল দেশীয় পাঠশালাগুলিকে হতাদর করে লোপ করে দেওয়া। এসব পাঠশালার অনেক ত্রুটি থাকলেও এরা আবহমান কাল থেকে এদেশের শিশুদের উপযোগী একটা শিক্ষা ব্যবস্থা করে আসছিল—একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। ইংরেজশাসনের অল্পকাল মধ্যেই দেশের গ্রামগুলি ক্রমশঃ ব্যাধিজর্জরিত, **depopulated** (জনবিরল) হয়ে গেল এবং দেশীয় পাঠশালাগুলি ধীরে ধীরে উঠে যেতে লাগল। মুনরো, এল্‌ফিনস্টোন্, অ্যাডাম্—এঁরা দেশীয় পাঠশালাকে ভিত্তি করেই সরকারী প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে সরকারকে বার বার বলেছিলেন ; কিন্তু সরকার সে কথায় কর্ণপাত করেন নি।

শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের দ্বিতীয় মারাত্মক ভুল হল এক চক্ষু হরিণের মত পরিস্রবণ-নীতি অনুসরণ করা। সরকারের উচ্চ শিক্ষায় (মাধ্যমিক ও কলেজীয়) মনঃসংযোগের ফলে দেশে প্রাথমিক শিক্ষা অবহেলিত হতে লাগল এবং একটি সুসভ্য সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে যে প্রাথমিক কর্তব্য ইংরেজ সরকার তা ভুলে গেলেন। প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করবার কথা একবারও সরকার ভাবলেন না।

১৯০৪ সনে আত্মদর্শনের পরই **Payment by results** প্রথা সরকার পরিহার করলেন এবং অতঃপর সাহায্যদানের ভিত্তি হল বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংখ্যা এবং মোট ছাত্রসংখ্যা। গৃহনির্মাণ, আসবাবপত্র এবং অন্যান্য সাজ-সরঞ্জামের জন্যও সাহায্যদানের ব্যবস্থা হল। কিন্তু এ অভিযান পুরোপুরি যান্ত্রিক। কোন অঞ্চল বা স্থানের বিশেষ গুরুত্ব বা প্রয়োজন সম্পর্কে বিবেচনার অভাব আছে এ ধরণের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে……।

এ ব্যবস্থার ফলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা অতঃপর বেশ বেড়েছিল। কিন্তু বাংলার মত জনবহুল দেশে সে সংখ্যা-বৃদ্ধি প্রাথমিক শিক্ষার প্রান্তদেশ মাত্র স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছিল।

ইংরেজ আমলে ইংরেজ সরকার প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসারের নামে নানা সময়ে যে-সব পথ ও পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন তার আলোচনা করা হল। সরকারের জনশিক্ষা সম্পর্কে প্রচেষ্টার ইতিহাস অনুধাবন করলে দুটি কথা স্পষ্ট হয়ে উঠে। প্রথমতঃ ইংরেজ এদেশে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার, উন্নয়ন কিছুই চাননি। আর, যদি চেয়ে থাকেন তবে বলতে হয় ফিলট্রেশন নীতিতে সরকারের এমন অচল আস্থা ছিল যে এঁরা বিশ্বাস করতেন উচ্চ শ্রেণীর উচ্চশিক্ষাব ব্যবস্থা করলে দেশবাসীর শিক্ষা নিজে থেকেই সাধিত হবে। এছাড়া আরও একটি কথা আছে। সরকার যখন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাইমারী স্কুল স্থাপন করে দেশীয় পাঠশালাগুলি দিনে দিনে অবলুপ্ত করছিলেন, তখন ভেবে দেখেননি গ্রামময় দেশে প্রাথমিক শিক্ষার প্রকৃত প্রাণবস্ত কী? পাঠ্যবস্তু, সংগঠন, দৈনন্দিন পরিচালনা প্রভৃতি ব্যাপারে দেশীয় পাঠশালায় যে নীতি জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে অনুসৃত হত, দেশীয় পাঠশালা লোপ করে দিয়ে সরকারের প্রাইমারী স্কুল যখন সেগুলির স্থান দখল করে নিল, তখন দেশীয় পাঠশালার মূলনীতিগুলিও প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে নির্বাসিত হল।

গ্রামবাংলার প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে সব সময় মনে রাখতে হবে এ শিক্ষা গ্রামবাসী ছেলেমেয়েদের মনে অনাড়ম্বর পল্লীজীবনেব সহজ সুখ ও আনন্দ, পল্লীর শিক্ষা সংস্কৃতি, প্রথা, উৎসব প্রভৃতির প্রতি একটা বিরাগ বা অতৃপ্তির ভাব জাগিয়ে দিচ্ছে কি না এবং তাদের আশা-আকাঙ্খা চরিতার্থতা লাভের উদ্দেশ্যে পল্লী পরিহার করে অন্যত্র যাত্রা করছে কিনা। প্রাথমিক শিক্ষা ঠিক পথে চলছে কিনা এটা জানবার এই হচ্ছে প্রাথমিক পন্থা।

গ্রামবাসীব নিবক্ষরতা ও অজ্ঞতা দূর করা দবকার, গ্রামের বাইরে শহরে যে জীবন সে সম্পর্কে গ্রামবাসীর কিছুটা পরিচয় প্রয়োজন না হলে অনেক বাস্তব অসুবিধায় তাকে পড়তে হবে। এই সবই সত্যিকথা, কিন্তু শিক্ষা একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়া। বিচিত্র বিষয়ে জ্ঞানার্জনের ফলে গ্রামের ছেলে-মেয়েদের নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা দূর হতে পারে, কিন্তু নিরক্ষরতা অপনোদন এবং বুদ্ধির বিকাশই প্রাথমিক শিক্ষাব একমাত্র লক্ষ্য হতে পারে না। গ্রামের

ছেলেমেয়েদের ব্যক্তি-মন তথা চরিত্র প্রকৃত পুষ্টি লাভ করতে পারে গ্রামকে এবং গ্রামজীবনকে পুরোপুরি ভালবেসে। গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়কে গ্রাম্যশিশুর এই চরিত্র গঠন ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের ভিত্তি ভূমি হতে হবে।

বক্তব্যটি আরো স্পষ্ট করা যাক। গ্রামের প্রাথমিক শিক্ষার দুটি দিক। সেখানে লিখন, পঠন, গণিত প্রভৃতি চর্চার সঙ্গে কারিগরি বা জীবিকা সংক্রান্ত এমন সব বিদ্যার চর্চা হবে যা গ্রামজীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত। আর এই শিক্ষার পাশাপাশি গ্রামজীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত এক উদার শিক্ষার (Liberal Education) ব্যবস্থাও রাখতে হবে। সে শিক্ষা গ্রামের নানা প্রথা, পদ্ধতি, উৎসব শিল্প, সংস্কৃতি, গ্রামজীবনের সহজ আনন্দ এবং গ্রামবাসীর সহজ জীবনাদর্শ—কোনটাকেই আঘাত করবে না। সে-শিক্ষা এমন উৎসাহ, আকাঙ্খা এবং জীবনাদর্শ শিক্ষার্থীর চিত্তে সঞ্চারিত করবে যা-গ্রামজীবনে সার্থকতা লাভ করতে পারে।

পল্লীজীবন যে ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তা হচ্ছে অকুণ্ঠ পল্লীপ্রীতি। তাই গ্রাম-বাংলার প্রাথমিক শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য হবে প্রয়োজনীয় শিক্ষণীয় বিষয়গুলি অবলম্বন করে বুদ্ধির চর্চা, জীবন ও জীবিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উদ্যোগ-চর্চা এবং এগুলির সঙ্গে গ্রাম্যজীবনের প্রতি প্রীতির চর্চা। শিক্ষার্থীকে এমন ভাবে গড়ে তুলতে হবে যেন গ্রামকে নিয়েই তার আশা, আকাঙ্খা, উৎসাহ, আনন্দ চরিতার্থতা লাভ করতে পারে। গ্রামকে অবজ্ঞা করে বা পরিহার করে নয়।

গ্রামের প্রাথমিক শিক্ষার এই বিশেষ দিকটি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার চেষ্টা না করে বা এই দিকটিকে অবহেলা করে শুধু প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা বাড়িয়ে জনশিক্ষা প্রসারের চেষ্টা করলে ভবিষ্যতে অনিবার্যভাবে সমগ্রজাতিকে একটা অর্থনৈতিক তথা রাজনৈতিক দুর্দৈবের সম্মুখীন হতে হবে এবং সে দুর্দৈবের সমাধান নিশ্চয়ই সহজ হবে না।

ইংরেজ-প্রবর্তিত জনশিক্ষা ব্যবস্থার ফলে এ দুর্দৈবের পদধ্বনি আমরা শুনছি। তাই সময় অতীত হয়ে যাওয়ার পূর্বেই প্রাথমিক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ও আদর্শকে অবহেলা করে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারের নামে গতানুগতিক প্রাইমারি স্কুলের প্রসার-সাধন সম্পর্কে আমাদের স্বাধীন সরকারকেও অবশ্যই সতর্ক হতে হবে। এ বিষয়ে দেশের দু'জন মনীষী পথ নির্দেশ করেছিলেন, কিন্তু দেশবাসীর দুর্ভাগ্য যে স্বাধীন সরকারও সে নির্দেশ আজও কার্যকর

করেন নি।

রবীন্দ্রনাথ এদেশে জনশিক্ষার একটি সার্থক পূর্ণাঙ্গ রূপের কথা ভেবেছিলেন এবং শ্রীনিকেতনে তাঁর পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপদানের চেষ্টাও করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের জনশিক্ষার আদর্শ সুরু বা শ্রীনিকেতনেই সীমাবদ্ধ হয়ে রইল—গ্রামময় বাংলা বা গ্রাম-সর্বস্ব ভারতে পরিব্যাপ্ত হতে পেল না।

গান্ধীজীও পল্লীময় ভারতের জন্য বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের খসড়া দেশবাসীকে দিয়েছিলেন। কিন্তু বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলি শুধু নামে বুনিয়াদী হয়ে রইল, দেশবাসীর চিত্তে তাদের বুনিয়াদ রচনা হল না।

স্ত্রী–শিক্ষা (১৮৮২-১৯০৬)

কেশব চন্দ্র সেন (১৮৩৮-৮৪) প্রতিষ্ঠিত 'স্ত্রী-শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়' ১৮৭৮ সনে উঠে গেল। বিদ্যালয়টি বন্ধ হওয়ার এক বছরের মধ্যেই কেশবচন্দ্র আর একটি নারী বিদ্যালয়—'মেট্রোপলিটন ফিমেল স্কুল' স্থাপন করলেন।

স্ত্রী শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে কেশবচন্দ্রের নিজস্ব একটা মত ছিল। পুরুষ এবং নারীর প্রকৃতিগত পার্থক্য স্মরণ রেখে তিনি ভিন্ন-পন্থার শিক্ষা-ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন। সে যুগের অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি কেশবচন্দ্রের এই মতবাদ সমর্থন করতেন না। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'আত্মজীবনী'তে স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তাদের এই মতভেদের কথা উল্লেখ করেছেন।[৩]

কেশবচন্দ্র স্ত্রী-শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর মূল ভাবনা অনুযায়ী মেয়েদের জন্য একটি আদর্শ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হলেন। এই উদ্দেশ্যে ১৮৮২ সনের ৩১শে মার্চ তিনি একটি অনুষ্ঠান পত্র প্রচার করেন :

এদেশীয় স্ত্রীশিক্ষা প্রণালী অত্যন্ত অসম্পন্নভাবে অবস্থান করিতেছে। 'ভারত সংস্কার সভার'-র কমিটি সেই গুরুতর অভাব মোচনে অগ্রসর হইয়াছেন। স্ত্রীলোকদিগের মনের বিশেষ উপযোগী একটি শিক্ষা প্রণালী বিধিবদ্ধ করাই তাঁহাদের বিশেষ উদ্দেশ্য। পুরুষ জাতির উপযোগী শিক্ষার দ্বারা তাহাদিগের মত উপাধি এবং সুখ্যাতির অনুসন্ধান করিতে স্ত্রীলোকদিগকে বাধ্য করা অত্যন্ত অনিষ্টকর ও অন্যায় কার্য। এ কারণ, যাহারা

পুরুষের উপযোগী শিক্ষা দিয়া স্ত্রীলোকদিগের স্বভাবকে বিকৃত করে অথবা যাহা তাহাদিগকে কেবল বাহ্য বেশভূষা ও অসার সভ্যতার অনুকরণ করিতে শিক্ষা দিয়া তাহাদিগের দুর্গতি সাধন করে, প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ে তাহা যত্নের সহিত পরিত্যক্ত হইবে এবং সর্বপ্রযত্নে এখানে এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগকে সুশিক্ষিত হিন্দু স্ত্রী এবং হিন্দুমাতা হইবার উপযুক্ত শিক্ষা প্রদত্ত হইবে। *** বিজ্ঞানের সরল সত্য সকল, নীতি, স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যাকরণ এবং রচনা, ইতিহাস, ভূগোল, গৃহকার্য এবং আদর্শ হিন্দু চরিত্র এই সমস্ত উপদেশের অন্তর্গত বিষয় হইবে। তত্ত্ববিদ্যা, চিত্র এবং সূচীর কার্যও শিক্ষা দেওয়া হইবে। পরীক্ষোত্তীর্ণা ছাত্রীদিগকে অলংকাব প্রশংসাপত্র এবং ৫০ টাকা হইতে ২০০ টাকা পর্যন্ত ছাত্রবৃত্তি পুরস্কাররূপে প্রদত্ত হইবে।"[10]

কেশবচন্দ্রের আদর্শ উন্নত বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে পরিচালক সমিতি গঠিত হল। এই সমিতির সভাপতি হলেন কেশবচন্দ্র সেন এবং সম্পাদক তাঁর ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী সেন। ১৮৮২ সনের ১লা মে ১০ নং আপার সার্কুলার রোডে 'ভিক্টোরিয়া কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হল। স্থির হল মেট্রোপলিটন ফিমেল স্কুল এই ভিক্টোরিয়া কলেজের অন্তর্ভুক্ত হবে।

বিদ্যালয়টি দুইভাগে বিভক্ত হল, সিনিয়র ও জুনিয়র বিভাগ। মহিলাদের জন্য পাঠ্যপুস্তক নির্দিষ্ট করা, পাঠ্যপুস্তক অনুসারে কলেজ গৃহে নিয়মিতভাবে সপ্তাহে একবার বক্তৃতা-দানের ব্যবস্থা, বছরে একবার পরীক্ষা গ্রহণ এবং উৎকৃষ্ট ছাত্রীগণকে পুরস্কার বিতরণ। 'অন্তপুর স্ত্রী শিক্ষা', প্রণালীও এখানে অনুসৃত হল। শহরের মত সুদূর মফঃস্বলের নারীদেরও এখানকার বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকের উপর প্রদত্ত প্রশ্ন পাঠান হত। তারা প্রশ্নের উত্তরপত্র পাঠিয়ে দিতেন। তার ভিত্তিতে তাদের ফলাফল স্থির হত।

প্রথম বৎসরে (১৮৮২-৮৩), ফাদার লাফোঁ—বিজ্ঞান, কেশবচন্দ্র সেন—নীতি, কৃষ্ণবিহারী সেন—ঐতিহাসিক তত্ত্ব, প্রতাপ চন্দ্র মজুমদার—নারীজীবন, ডাঃ অন্নদা চরণ খাস্তগীর—শারীরতত্ত্ব এবং গৌরগোবিন্দ রায় (উপাধ্যায়)—প্রাচীন আর্যনারীদিগের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এই বক্তৃতাগুলির সারমর্ম 'পরিচারিকা' শীর্ষক মাসিকপত্রে প্রকাশিত হয়। বক্তৃতাগুলিতে গড়ে চল্লিশজন মহিলা ছাত্রী উপস্থিত হন।

এই ব্যবস্থানুসারে ছাত্রীরা কি রকম শিক্ষা পাচ্ছে তা জানবার জন্য ১৮৮৩

সনের জানুয়ারী মাসে একটি পরীক্ষা নেওয়া হয়। পরীক্ষক মণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক প্রসন্ন কুমার সর্বাধিকারী, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, রেভাঃ কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কেশব চন্দ্র সেন।[11]

বেথুন স্কুল ও ভিক্টোরিয়া কলেজ

১৮৭৮, ১লা আগষ্ট বঙ্গ-মহিল'-বিদ্যালয় ও বেথুন স্কুল সংযুক্ত হওয়ার ফলে বেথুন স্কুল মেয়েদের একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছিল; বেথুন স্কুলে কলেজের ক্লাশ হত ১৮৭৮ সন থেকে। কাদম্বিনী বসু ও চন্দ্রমুখী বসু ১৮৮৩ সনে বেথুন স্কুলের কলেজ বিভাগ থেকে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বেথুন স্কুলের কলেজ বিভাগ ১৮৮৮ সনে প্রথম শ্রেণীর কলেজ রূপে স্বীকৃতি পেল। ফলে বাংলাদেশের মেয়েদের কলেজী শিক্ষার সব রকম বাধা দূর হল। বেথুন স্কুলের প্রতিষ্ঠাতার নির্দেশ অনুসারে স্কুলটিতে শুধু ভদ্র হিন্দু কন্যাদের অধ্যয়নের ব্যবস্থা ছিল। বেথুন কলেজ স্থাপিত হওয়ায় সেখানে ভারতীয় সকল শ্রেণীর কন্যাদের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা হল।

কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যুর পর ভিক্টোরিয়া কলেজ প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ১৮৮৬ সনে কেশবচন্দ্রের জামাতা ও কন্যা কুচবিহারের মহারাজা এবং মহারাণী সুনীতি দেবীর চেষ্টায় কলেজটি পুনরুজ্জীবিত হল।

১৮৯০ সনে ভিক্টোরিয়া কলেজ ২০ নং বীডন্ ষ্ট্রীটে একটি প্রশস্ততর গৃহে স্থানান্তরিত হয় এবং কলেজের কর্তৃপক্ষ লক্ষ্য রাখেন যাতে মহাত্মা কেশব সেনের নির্ধারিত স্ত্রী শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি কার্যকরী করা হয়।

কেশবচন্দ্র ভিক্টোরিয়া কলেজ স্থাপন করেছিলেন বর্তমান যুগের মেয়েদের প্রাচীন ভারতীয় আর্যনারীর আদর্শে গড়ে' তুলবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু ব্যক্তিত্বের জোরে ঘড়ির কাঁটা উল্টোদিকে তিনি ঘোরাতে পারেন নি। পরবর্তীকালে বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তায়ও এই দশা ঘটে ছিল।

মহাকালী পাঠশালা

কেশবচন্দ্র সেন এদেশের মেয়েদের 'সুশিক্ষিত হিন্দু স্ত্রী এবং হিন্দুমাতা তৈরী করার জন্য শিক্ষার কথা ভেবেছিলেন এবং দেশের স্ত্রীলোকদের হিন্দু প্রবৃত্তি বৃদ্ধি করাই শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য বলে মেনে নিয়েছিলেন এবং এই

উদ্দেশ্যে ভিক্টোরিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, (১৮৮২) খ্রীষ্টান মিশনারীদের দ্বারা অথবা ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা পরিচালিত স্ত্রীশিক্ষার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ এরই প্রায় এক দশক পরে মহারানী তপস্বিনী হিন্দুশাস্ত্রের নির্দেশমত হিন্দুনারীর শিক্ষাব্যবস্থার জন্য ১৮৯৩ সনের ১৭শে এপ্রিল আপার সার্কুলার রোডে মহারানী স্বর্ণময়ীর ভবনে মহাকালী পাঠশালা স্থাপন করেন। তাঁর মতে প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতিতে মেয়েদের প্রকৃত জাতীয় শিক্ষার ব্যাঘাত ঘটেছিল। মহাকালী পাঠশালা এই জাতীয় শিক্ষা তথা হিন্দুশাস্ত্র ও ধর্মানুযায়ী শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত। মহারানী স্বর্ণময়ী তাঁর প্রাসাদের একাংশ বিদ্যালয়ের জন্য ছেড়ে দিয়েই ক্ষান্ত হননি; অর্থ প্রভৃতি দিয়েও তিনি নানাভাবে এই পাঠশালাটিকে সাহায্য করতেন। মাতাজীর এই মহৎ কাজে 'ইণ্ডিয়ান মিরর্'-এর সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেনও গোড়া থেকে সাহায্য করেছিলেন।

মহাকালী পাঠশালা প্রথমে ৩০ জন ছাত্রী নিয়ে শুরু হয় এবং দশ বছরের মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা দাঁড়ায় সাড়ে চারশ। পাঠশালাটি বরাবরই অবৈতনিক ছিল। সংস্কৃত এবং বাংলার মাধ্যমে এখানে শিক্ষা দেওয়া হত। ছাত্রীসংখ্যা দ্রুত বেড়ে যাওয়ায় সুকিয়া ষ্ট্রীটে স্কুল ভবনটি স্থানান্তরিত হল ১৮৯৭-১৮৯৮। পাঠশালা প্রথমে ছ' শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। প্রথম শ্রেণীর পাঠ্যতালিকা থেকে বেশ বোঝা যায় ছাত্রীদের ছ' বছরে কতটা লেখাপড়া হত। প্রথম শ্রেণীতে সংস্কৃত রঘুবংশ, সীতার বনবাস, উপক্রমণিকা, পাটীগণিত প্রভৃতি এবং এ সবের সঙ্গে রন্ধনবিদ্যা এবং বিভিন্ন শিল্পের কাজও ছাত্রীদের শিক্ষা দেওয়া হত। উদ্দেশ্য ছাত্রীরা যাতে ভবিষ্যতে যোগ্য গৃহিনী হতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দ ইউরোপ আমেরিকা থেকে ফিরে মাতাজীর আমন্ত্রণে মহাকালী পাঠশালা দেখতে যান। পাঠশালার শিক্ষা প্রণালীর কথা মাতাজীর কাছে শুনে এবং এবং স্বচক্ষে দেখে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন,—'The movement is in the right direction.'

নিবেদিতা স্কুল

স্বামী বিবেকানন্দের (১৮৬৩—১৯০২) শিক্ষা পরিকল্পনায় স্ত্রী-মঠ প্রতিষ্ঠা একটি মূল্যবান চিন্তা। একটি স্ত্রী-মঠ স্থাপন করে সেখানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সর্বোত্তম উপাদানগুলির সমন্বয় সাধন করে আগ্রহশীল স্ত্রী ছাত্রী-

দিগের মধ্যে তা সঞ্চারিত করে দেওয়ার অভিপ্রায় থেকেই নিবেদিতা স্কুলের জন্ম।

স্বামীজীর পরিকল্পনা ছিল একটি নবতর শিক্ষা আন্দোলনের কেন্দ্র হিসাবে এই শিক্ষাশ্রমটি গড়ে তোলা। স্বামীজীর শিষ্যা মার্গারেট্ নোবল্ (নিবেদিতা) স্বামীজীর এ চিন্তাধারায় আকৃষ্ট হলেন এবং ১৮৯৮ সালে ভারতে এলেন। নিবেদিতা প্রথমে কয়েকটি মেয়েকে নিয়ে একটি কিন্ডারগার্টেন স্কুল স্থাপন করলেন—১৬, বোসপাড়া লেনের একটি ছোট বাড়ীতে। ১৯০২ সালে নিবেদিতার সহকর্মী হয়ে এলেন স্বামীজীর অন্য এক শিষ্যা ক্রিষ্টিনা। এবার বয়স্কা মেয়েদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা হল। ব্রাহ্ম-শিক্ষিকা লাবণ্যপ্রভা বসু এসে যোগ দিলেন এঁদের সঙ্গে। পাঠ্যসূচী স্থির হল,— পড়া, লেখা, সেলাই এবং বিভিন্ন ধর্ম প্রবক্তাদের জীবনীপাঠ ও আলোচনা। বয়স্থাদের বিদ্যালয়ে প্রথমেই ৬০ জন মহিলা এসে যোগ দিলেন এবং এক-বছরের মধ্যেই বিদ্যালয়টির উপযোগিতা সবাই অনুভব করতে লাগলেন। তৃতীয় বছর থেকে সেলাই, চিত্রাঙ্কন, ইতিহাস, ভূগোল, 'এনাটমি', ফিজিও-লজি প্রভৃতি পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হল। অল্পকাল মধ্যেই একটি শিক্ষিকা-শিক্ষণ বিভাগ খোলা হল। স্কুলের পাঠ্যসূচীতে প্রথম দুবছরের জন্য অন্তর্ভুক্ত হল বাংলা পড়া ও লেখা, পাটীগণিত মৌখিক ভূগোল, রামায়ণ মহাভারতের গল্প, ছবি আঁকা, মাদুর বোনা, মাটির কাজ প্রভৃতি। তৃতীয় বছরে ইংরেজী পড়ানো শুরু হত এবং তার সঙ্গে ব্যাকরণ ইতিহাস প্রভৃতি। উঁচু ক্লাস গুলিতে নিয়মিত সংস্কৃত পড়ানো হত।

নিবেদিতা পরিচালিত বিদ্যালয়টি সে যুগে সরকারী বেসরকারী সব বিদ্যালয় থেকে সম্পূর্ণ পৃথক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের ছিল। প্রতিষ্ঠানটি একাধারে শিশু এবং বয়স্থা উভয়েরই শিক্ষা ক্ষেত্র ছিল। তাছাড়া ভারতীয় জীবনধারা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এখানে শিক্ষা দেওয়া হত।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯১০ সালে এণ্ট্রান্স পরীক্ষার বদলে ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষার প্রবর্তন করেন। এযাবৎ স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ নিয়ে যে সব বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল (যেমন কেশবচন্দ্রের 'ভিক্টোরিয়া কলেজ', মাতাজীর 'মহাকালী পাঠশালা অথবা স্বামীজীর 'নিবেদিতা স্কুল') প্রবেশিকা পর্যন্ত শিক্ষা দিতে গিয়ে তাদের সবাইকে শেষ পর্যন্ত একটি গতানুগতিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত হতে হল। ফলে স্ত্রী ও পুরুষদের

শিক্ষা ভিন্ন হওয়া প্রয়োজন এই মূল কথাটি বালিকা বিদ্যালয়গুলির পঠন-পাঠন এবং পরিচালন ব্যবস্থা থেকে প্রায় লুপ্ত হয়ে গেল।

রবীন্দ্রনাথ [শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম–পূর্বযুগ]

যে যুগে বাঙালী বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সর্বথা অগ্রাহ্য করে ইংরেজী শিখে সাহেব হওয়ার জন্য লালায়িত' প্রমত্ত, সে সময় শিক্ষার সর্বাঙ্গীণ সার্থকতার জন্য মাতৃভাষার অনিবার্য প্রয়োজনীয়তা এবং শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে বিদেশী ভাষার নিশ্চিত ব্যর্থতার কথা দেশবাসীকে যুবক রবীন্দ্রনাথই শুনিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-ভাবনার প্রথম সাক্ষাৎ পাই ১৮৮৩ সালে, যখন তার বয়স মাত্র বাইশ বছর। 'ভারতী' পত্রিকায় তিনি লিখেছেন, "ইংরেজীতে যাহা শিখিয়াছ তাহা বাংলায় প্রকাশ কর, বাংলা সাহিত্য উন্নতি লাভ করুক ও অবশেষে বাংলা বিদ্যালয়ে দেশ ছাইয়া সেই সমুদয় শিক্ষা বাংলায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ুক। ইংরাজীতে শিক্ষা কখনই দেশের সর্বত্র ছড়াইতে পারিবে না"[12]

এর দশ বছর পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষাচিন্তা আরও বিশদ করে আরও জোরের সঙ্গে প্রকাশ করেন তিনটি প্রবন্ধে।

১২৯৯, পৌষে (ডিসেম্বর,১৮৯২—জানুয়ারী ১৮৯৩) 'সাধনা' পত্রিকায় তিনি 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন। বাঙালী ছেলের শিক্ষার ব্যর্থতার এক অতি করুণ চিত্র তিনি উপস্থিত করেছেন ঐ প্রবন্ধে। তিনি লিখেছেন,—

'একে তো, ইংরেজী ভাষাটা অতিমাত্রায় বিজাতীয় ভাষা। শব্দবিন্যাস, পদবিন্যাস, সম্বন্ধে আমাদের ভাষার সহিত তাহার কোন মিল নাই। তাহার পরে আবার ভাববিন্যাস এবং বিষয়-প্রসঙ্গও বিদেশী। আগাগোড়া কিছুই পরিচিত নহে, সুতরাং ধারণা জন্মিবার পূর্বেই মুখস্থ আরম্ভ করিতে হয়। তাহাতে না চিবাইয়া গিলিয়া খাইবার ফল হয়। আবার নিচের ক্লাসে যে মাষ্টার পড়ায় তাহারা কেহ এণ্ট্রান্স পাশ, কেহ বা এণ্ট্রান্স ফেল; ইংরেজী ভাষা, ভাব, আচার, ব্যবহার এবং সাহিত্য তাহাদের নিকট কখনোই সুপরিচিত নহে।

***আমরা বাল্য হইতে কৈশোর এবং কৈশোর হইতে যৌবনে প্রবেশ করি কেবল কতকগুলো কথার বোঝা টানিয়া। সরস্বতীর সাম্রাজ্যে কেবলমাত্র

মজুরী করিয়া মরি ; পৃষ্ঠের মেরুদণ্ড বাঁকিয়া যায় এবং মনুষ্যত্বের —সর্বাঙ্গীণ বিকাশ হয় না। *** আমাদের সমস্ত জীবনের শিকড় যেখানে, সেখান হইতে শত হস্ত দূরে আমাদের শিক্ষার বৃষ্টিধারা বর্ষিত হইতেছে ; বাধা ভেদ করিয়া যেটুকু রস নিকটে আসিয়া পৌঁছিতেছে সেটুকু আমাদের জীবনের শুষ্কতা দূর করিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। *** এজন্য আমাদের ছাত্রদিগকে দোষ দেওয়া অন্যায়। তাহাদের গ্রন্থ-জগৎ এক প্রান্তে, মাঝখানে কেবল ব্যাকরণ-অভিধানের সেতু। *** এইরূপে জীবনের এক তৃতীয়াংশকাল যে শিক্ষায় যাপন করিলাম তাহা যদি চিরদিন আমাদের জীবনের সহিত অসংলগ্ন হইয়া রহিল এবং অন্য শিক্ষালাভের অবসর হইতেও বঞ্চিত হইলাম, তবে আর আমরা কিসের জোরে একটা যাথার্থ্য লাভ করিতে পারিব।

আমাদের এই শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্য সাধনই এখনকার দিনের সর্বপ্রধান মনোযোগের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে. কিন্তু এ মিলন কে সাধন করিতে পারে। বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য।"[13]

'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধের বক্তব্য সমর্থন করে সে যুগের তিন জন মনস্বী বঙ্কিমচন্দ্র, স্যার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় এবং আনন্দমোহন বসু রবীন্দ্রনাথকে পত্র লিখেছিলেন। স্যার গুরুদাস লিখেছিলেন যে ঐ প্রবন্ধের কথাগুলি তাঁহারও একান্ত মনের কথা।[14]

এঁদের কাছ থেকে পত্র পাওয়ার পর 'সাধনা' পত্রিকায় (১২৯৯ এর চৈত্র সংখ্যায়) রবীন্দ্রনাথ আবার লিখলেন, "স্বদেশী ভাষার সাহায্য ব্যতীত কখনোই স্বদেশের স্থায়ী কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না, এ কথা কে না বুঝে?*** দেশের অধিকাংশ লোকের শিক্ষার উপর যদি দেশের উন্নতি নির্ভর করে এবং সেই শিক্ষার গভীরতা ও স্থায়িত্বের উপর যদি উন্নতির স্থায়িত্ব নির্ভর করে, তবে মাতৃভাষা ছাড়া যে আর কোন গতি নাই, এ কথা কেহ না বুঝিলে হাল ছাড়িয়া দিতে হয়।"[15]

রবীন্দ্রনাথের বন্ধু লোকেন্দ্রনাথ পালিত আই, সি, এস (১৮৬৫-১৯১৭) রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য সমর্থন করেন।

উপরোক্ত প্রবন্ধের কয়েকমাস পরেই তিনি লিখলেন, "মনে আছে আমরা বাল্যকালে কেবলমাত্র বাংলা ভাষায় শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলাম। বিদেশী ভাষার পীড়নমাত্র ছিল না। আমরা পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট পাঠ সমাপন করিয়া কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত পড়িতে

বসিতাম। রামচন্দ্র ও পাণ্ডবদিগের বিপদে অশ্রুপাত ও সৌভাগ্যে কি নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিয়াছি, তাহা আজিও ভুলি নাই। কিন্তু আজকাল আমার জ্ঞানে আমি একটি ছেলেকেও ঐ দুই গ্রন্থ পড়িতে দেখি নাই। অতি বাল্যকালেই ইংরেজীর সহিত মিশাইয়া বাংলা তাহাদের তেমন সুচারুভাবে অভ্যস্ত হয় না এবং ইংরেজীতেও শিশুবোধ্য বহি পড়া তাহাদের পক্ষে অসাধ্য। অতএব দায়ে পড়িয়া তাহাদের পড়াশুনা কেবলমাত্র কঠিন শুষ্ক অত্যাবশ্যক পাঠ্যপুস্তকেই নিবদ্ধ থাকে এবং তাহাদের চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তি বহুকাল পর্যন্ত খাদ্যাভাবে অপুষ্ট অপরিণত থাকিয়া যায়।”[16]

নিজের জীবনে শুধু বাংলা ভাষায় শিক্ষালাভের কথা এবং মাতৃভাষাকে সুচারুরূপে আয়ত্ব করার ফলে তাঁর বাল্যকালে চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তি যে অপরিণত থাকতে পারেনি এ কথা পরিবর্তীকালে ‘জীবনস্মৃতি’ গ্রন্থে (১৯১২) এবং ‘শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ’ প্রবন্ধে (১৯৩৭) রবীন্দ্রনাথ বর্ণনা করেছেন। ‘সাধনা’ পত্রিকার ১৩০০ আষাঢ় সংখ্যায় তিনি শিক্ষায় মাতৃভাষার স্থান সম্বন্ধে যা বলেছিলেন তাও উদ্ধৃতিযোগ্য।

“কোন শিক্ষাকে স্থায়ী করিতে হইলে, গভীর করিতে হইলে, ব্যাপক করিতে হইলে তাহাকে চিরপরিচিত মাতৃভাষায় বিগলিত করিয়া দিতে হয়। যে ভাষা দেশের সর্বত্র সমীরিত, যাহাতে সমস্ত জাতির মানসিক নিশ্বাসপ্রশ্বাস নিষ্পন্ন হইতেছে, শিক্ষাকে সেই ভাষার মধ্যে মিশ্রিত করিলে তবে সমস্ত জাতির জীবন ক্রিয়ার সহিত তাহার যোগসাধন করিতে সেই জন্য পালি ভাষায় ধর্মপ্রচার করিয়াছেন। চৈতন্য বঙ্গভাষায় তাঁর প্রেমাবেগ সর্বসাধারণের অন্তরে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিলেন। *** আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের জাতীয় জীবনের অন্তরে মূল প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই।”[17]

উপরে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা ভাবনা সম্পর্কে যে আলোচনা হল তার স্বরূপ তাঁরই ভাষায় সংক্ষেপে উদ্ঘাটিত করা যেতে পারে :

‘বাংলা বিদ্যালয়ে দেশ ছাইয়া সমুদয় শিক্ষা বাংলায় ব্যপ্ত হইয়া পড়ুক। ইংরেজীতে শিক্ষা কখনোই দেশের সর্বত্র ছড়াইতে পারিবে না’।

এই একটি বিশেষ ভাবনা অর্থাৎ মাতৃভাষার মাধ্যমে এদেশে সমুদয় শিক্ষার ব্যবস্থা রবীন্দ্রনাথকে চিরজীবন উদ্বিগ্ন করেছে। দেখা যাচ্ছে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত শিক্ষা সম্পর্কে যে সব চিন্তা রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেছেন তার মধ্যে উপরোক্ত চিন্তাই প্রধান।

ব্রাহ্মসমাজের নেতৃস্থানীয়দের শিক্ষাচিন্তা ও প্রচেষ্টা

এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই রাজা রামমোহনের নাম উল্লেখ করতে হয়। বেশীরভাগ দেশবাসী রামমোহনকে কটি সোজা কথার মধ্যে ধরে রাখবার চেষ্টা করে থাকেন,

রামমোহন হিন্দুর প্রচলিত পূজা উপাসনার বিরোধিতা করে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার প্রবর্তন করে গেছেন, তিনি পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার স্বপক্ষে আন্দোলন করেছেন—এই তিনটি অবশ্যই তাঁর জীবনের প্রধান কর্ম। তবু একটু ভাবলেই বোঝা যাবে যে সমাজশিক্ষা, সংস্কৃতি—সর্বদিক থেকেই শুধু বঙ্গ ভূমিকেই নয়, গোটা ভারতবর্ষকে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে টেনে আনায় তাঁর ভূমিকা সর্বাগ্রগণ্য। তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে বড় মানুষ আরও কয়েকজন ছিলেন কিন্তু রামমোহনই আমাদের ইতিহাসে প্রথম সত্যিকার আধুনিক মানুষ। তাঁর আধুনিকতা সমগ্র শতাব্দীকে বিপুলভাবে স্পর্শ করেছে এবং এই আধুনিকতার বলিষ্ঠ প্রকাশ হয়েছে তাঁর ধর্ম ও শিক্ষা সম্পর্কে চিন্তায়।

সে-যুগের টুলো পণ্ডিতদের তিনি মধ্যযুগীয় ইউরোপের 'স্কুলমেনদের' সঙ্গে তুলনা করেছেন। টুলো পণ্ডিতরা তাঁদের টোল চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ, যুক্তিবিদ্যা, দর্শন প্রভৃতির আলোচনা নিয়ে ছাত্রদের জীবনের প্রচুর সময় অপচয় করতেন। এ অপচয় রামমোহন বরদাস্ত করতে পারেন নি। যে বেদান্ত শেখায় 'দৃশ্যমান্ জগৎ মিথ্যা' বা মায়া এবং এ জগৎ থেকে যত শীঘ্র মুক্ত হওয়া যায় ততই মঙ্গল'—সে বেদান্তের চর্চাও তিনি সহ্য করতে পারেন নি। এইসব কারণে লর্ড আমহার্স্ট'কে তিনি লিখেছিলেন—'The Sanskrit system of education would be the best calculated to keep the country in darkness.' আজ ভেবে বিস্মিত হতে হয় যে ঐরকম একটা মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষে তিনি চেয়ে ছিলেন—'A more liberal and enlightened system of instruction embracing Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry, Anatomy and other useful science'—এর চর্চা।

রামমোহন দেশবাসীর হিতার্থে 'Sanskrit system of education' পরিহার করা কর্তব্য বলে সরকারকে জানিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তিনি দেশবাসীর ধর্মশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষা করেছেন। হিন্দু কলেজে ধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। ধর্মশিক্ষা ব্যবস্থার অভাবকে তিনি একটি মারাত্মক ত্রুটি বলে গণ্য করেছেন এবং নিজের অ্যাংলো-হিন্দু স্কুলে তিনি ধর্ম ও নীতি শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। যে মিশনারীদের সঙ্গে তিনি তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাদেরও এদেশে স্কুল প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেছেন। এই সহায়তার মূলেও ছিল ধর্ম ও নীতি-শিক্ষা প্রসারের জন্য তাঁর আগ্রহ।

রামমোহনের শিক্ষাচিন্তা ও প্রচেষ্টা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তিনি চেয়েছিলেন (১) ভারতের ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমাজ ব্যবস্থার যেটুকু যুক্তি ও প্রয়োজনীয়তার দিক দিয়ে রক্ষা করা সমীচীন, সেটুকু রক্ষা করতে। (২) পাশ্চাত্ত্যের বিজ্ঞান ও সাহিত্যচর্চা যা আমাদের পক্ষে হিতকর তা গ্রহণ করতে (৩) শিক্ষার্থীর নৈতিক ও আত্মিক বিকাশের ব্যবস্থা করতে।

শিক্ষাসংস্কার, সমাজ সংস্কার প্রভৃতি সকল বিষয়ই রামমোহনকে সরাসরি অনুসরণ করেছেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনিও বেদান্ত ধর্মের প্রতি মিশনারীদের আক্রমণ প্রতিহত করেছেন এবং রামমোহনের অ্যাংলো হিন্দুস্কুলের মত 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' স্থাপন করে ভারতীয় ধর্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্য এবং তৎসহ পাশ্চাত্ত্যের বিজ্ঞান চর্চার ব্যবস্থা করেছেন এবং শিক্ষার্থীর নৈতিক এবং আত্মিক উন্নতিবিধানকে শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য বলে গ্রহণ করেছেন। বাঙালীর শিক্ষাচিন্তায় ও শিক্ষাপ্রসার প্রচেষ্টায় দেবেন্দ্রনাথের পরেই উল্লেখযোগ্য দু'জন ব্রাহ্মনেতার নাম হচ্ছে আনন্দমোহন বসু ও শিবনাথ শাস্ত্রী।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭৮ সনে আর ১৮৭৯ সনে আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় 'সিটি স্কুল' স্থাপন করেন। এই সিটি স্কুল অল্প সময়ের মধ্যেই সিটি কলেজে রূপান্তরিত হয়। সিটি কলেজে প্রচলিত পাঠ্যক্রমের সঙ্গে যে নূতন বিষয়গুলি শিক্ষণীয় বলে গ্রহণ করা হয়েছিল সেগুলি হচ্ছে—

(১) কাঠের কাজ,
(২) শরীর চর্চা,
(৩) নীতি শিক্ষা,

১৮৮৪ সনে লর্ড রিপন কলেজ ভবন উদ্বোধনের সময় বলেছিলেন, এই কাঠের কাজ শিখানোর ব্যবস্থা হচ্ছে —'**A forward step in the direction of technical education**' [18] অর্থাৎ কারীগরী শিক্ষার দিকে একটি অগ্রসর পদক্ষেপ।

সিটি স্কুল প্রতিষ্ঠার কয়েক মাস পরেই শাস্ত্রী মহাশয় ১৮৭৯ সনে আনন্দমোহন বসুর সহযোগিতায় বহুদিনের সংকল্পিত 'ছাত্রসমাজ' স্থাপন করেছিলেন। আত্মজীবনীতে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, 'স্কুল-কলেজে ধর্মবিহীন শিক্ষা দেওয়া হয়, সেই অভাব কিয়ৎ পরিমানে দূর করা আমাদের উদ্দেশ্য ছিল ***পাঁচ প্রকারের ছাত্রসমাজের কার্য চলিল—

(১) প্রথমে পাক্ষিক তারপরে সাপ্তাহিক উপাসনা ও বক্তৃতা।
(২) ছাত্রাবাস পরিদর্শন।
(৩) মধ্যে মধ্যে সদলে শহরের সন্নিকটস্থ উদ্যানাদিতে গমন।
(৪) পুস্তকাদি মুদ্রাঙ্কন ও প্রচার।
(৫) মধ্যে মধ্যে সান্ধ্যসমিতির ব্যবস্থা।

এই পাঁচ প্রকার কর্মদ্বারা প্রভূত ফল লাভ করা গেল। *** তখন ছাত্র সমাজ ভিন্ন যুবকদিগের ধর্ম নীতি শিক্ষার উপযোগী অন্য সভা-সমিতি ছিল না। [19]

১৮০৪ সনে শাস্ত্রীমশায় ব্রাহ্মসমাজের নেতা গুরুচরণ মহলানবিশের সহযোগিতায় মেয়েদের জন্য একটি নীতিবিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং প্রমদাচরণ সেন বালকদের জন্য সিটি স্কুল ভবনে একটি নীতিবিদ্যালয় স্থাপন করেন। মেয়েদের নীতিবিদ্যালয়টি সম্পর্কে শাস্ত্রীমশায় আত্মচরিতে লিখছেন, "যে নীতিবিদ্যালয়টির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ যোগ ছিল, তাহা ১৮৮৪ সাল হইতে আমাদের উপাসনা মন্দিরে বসিল। ইহার প্রধান উদ্যোগকারিনী ও শিক্ষয়িত্রী ছিলেন, আমাদের কয়েকটি কন্যা। গুরুচরণ মহলানবিশ মহাশয়ের কন্যা সরলা, ভগবানচন্দ্র বসু মহাশয়ের কন্যা লাবণ্যপ্রভা, চণ্ডীচরণ সেনের কন্যা যামিনী এবং আমার কন্যা হেমলতা। ***এই কন্যাদের সঙ্গে বসিয়া ধর্মগ্রন্থাদি পাঠ করিতাম, নীতিবিদ্যালয়ের কর্মাদি বিষয়ে পরামর্শ করিতাম, ইহাদের সকল কাজে সঙ্গে থাকিতাম।[20]

শাস্ত্রীমহাশয় ১৮৯১ সনে 'ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়' স্থাপন করেন। ঐ বিদ্যালয়ে প্রচলিত পাঠ্যসূচী ছাড়া মেয়েদের পক্ষে প্রয়োজনীয় কতগুলি

সহপাঠ্যক্রমিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, যেমন সেলাই শিক্ষা এবং গার্হস্থ্য বিজ্ঞান। পরবর্তীকালে বালিকা বিদ্যালয়গুলিতে এ ধরণের বিষয় অন্তর্ভুক্তির সূচনা এই ব্রাহ্মবিদ্যালয় থেকেই।

এদেশে কিন্ডারগার্টেন বিদ্যালয় শাস্ত্রীমশায়ই প্রথম স্থাপন করেছিলেন, এবং এ বিদ্যালয়ে একটি মন্টেসরি বিভাগ সংযুক্ত করা হয়েছিল। শিশু শিক্ষার জন্য কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতির মাহাত্ম্য এদেশে শাস্ত্রীমশায়ই প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন। উত্তরকালে এদেশে এজাতীয় শিশু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার তিনি অন্যতম পথ-প্রদর্শক। শাস্ত্রীমশায় কতকগুলি যুবককে নিয়ে একটি গোপন সমিতি স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর আত্মজীবনীতে সেই সমিতির প্রতিজ্ঞা পত্রের যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে দেখা যায় 'লোকশিক্ষা প্রচার' সমিতির একটি মুখ্য প্রতিজ্ঞা ছিল। হিন্দু কলেজের ছাত্র শিবচন্দ্র দেব (১৮১১—১৮৯০) ছিলেন ডেপুটি কালেক্টর। তাঁর বাসস্থান হুগলী জেলার কোন্নগর গ্রাম। সে গ্রামে ১৮৫৪ সনে তিনি একটি ইংরেজী স্কুল স্থাপন করেছিলেন এবং ঐ স্কুল স্থাপনের পর ১৮৫৬ সনে সরকার গ্রামের মডেল বাংলা স্কুলটি তুলে দেন। শিবচন্দ্র গ্রামে একটি বাংলা স্কুলও স্থাপন করেন। অতঃপর তাঁর চেষ্টাতেই ১৮৮৫ সনে ঐ গ্রামে একটি সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। হিন্দু কলেজে ছাত্রাবস্থায় শিবচন্দ্র স্ত্রী শিক্ষার আবশ্যকতা তীব্রভাবে অনুভব করেছিলেন। নিজের বাসগ্রামে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সরকারের কাছে তিনি অনেক লেখালেখি করে এবং আংশিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পেয়েও ব্যর্থ হলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখছেন,—'শিবচন্দ্রবাবু তাহাতে নিরুদ্যম না হইয়া স্বীয় চেষ্টায়, স্বীয় অর্থে, স্বীয় ভবনে ১৮৬০ সনে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন; কিছুদিন পরে তাঁহারই প্রদত্ত ভূমিখণ্ডের উপর তাঁহারই ব্যয়ে ঐ বিদ্যালয়ের জন্য একটি গৃহ নির্মিত হইল।'[৪১]

ব্রাহ্মনেতা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ধর্মীয় আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের চেষ্টা করে গেছেন। ১৮৬২ তে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মবন্ধুসভার পরিচালনায় 'অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা' নামে একটি সভা স্থাপিত হয়। এই সভার প্রচেষ্টায় বাংলা দেশের মেয়েরা বিয়ের আগে ও পরে ঘরে বসে বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ পেয়েছিল।

ইংলণ্ড থেকে ফিরে কেশবচন্দ্র "ভারতসংস্কার সভা" স্থাপন করেন। এই

সভার আনুকূল্যে ১৮৭১ সনে স্ত্রী-শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। প্রধানতঃ প্রাপ্ত বয়স্ক ব্রাহ্মমহিলাদের জন্য এ বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়েছিল। এ বিদ্যালয়ে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী, পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায়, প্রভৃতি মনীষিগণ পাঠদান করতেন।

নেতৃস্থানীয় ব্রাহ্মদের শিক্ষাপ্রচেষ্টা সম্পর্কে আলোচনা করা হল। এদের শিক্ষাচিন্তার প্রথম কথাটি হল, শিক্ষার্থীর নৈতিক ও আত্মিক বিকাশে সহায়তা করা। এ জন্য শিক্ষা প্রচেষ্টায় সর্বত্রই ব্রাহ্মরা নীতি ও ধর্ম শিক্ষার উপর প্রচণ্ড গুরুত্ব দিয়েছেন। ব্রাহ্ম কথাটি আসছে ব্রহ্ম থেকে। জীবনের কেন্দ্রস্থলে ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠিত করাই ব্রাহ্মজীবনের লক্ষ্য। তাই নীতি, ধর্ম' বা আত্মিক চর্চা বাদ দিয়ে তাঁরা শিক্ষার কথা ভাবতে পারেন নি। আর একটি লক্ষণীয় বিষয় যে ব্রাহ্মনেতৃগণ নানা বিদ্যার চর্চার সঙ্গে বালক ও বালিকাদের জীবনে কার্যকরী বিভিন্ন উদ্যোগ শিক্ষাকে শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করে শিক্ষাকে বাস্তব জীবনের অনুসারী করতে চেয়েছেন। দেশের প্রচলিত পাঠ্যক্রমের সঙ্গে নীতি ও ধর্ম শিক্ষা উদ্যোগশিক্ষা (manual training) শরীর শিক্ষা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করে ব্রাহ্মনেতারা তাঁদের শিক্ষাচিন্তায় যে পুরো মানুষটির (The whole man) কথা ভেবেছেন তারই পরিচয় দিয়ে গেছেন।

নেতৃস্থানীয় ব্রাহ্মদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যায়তনগুলি ছাড়াও বাংলাদেশ ব্রাহ্মরা আরও স্কুল স্থাপন করেছেন। এজন্যই বোধহয় ব্রাহ্মদের সম্পর্কে একটি কথা প্রচলিত আছে—'যেখানেই কোন ব্রাহ্ম গিয়েছেন, সেখানে তিনি এক পকেটে একটি 'সমাজ' অন্য পকেটে একটি বিদ্যালয় নিয়ে গেছেন।[২২]

স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৪-১৯১৮)

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম জীবনে বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করেছেন এবং তারপর বেশ কিছুকাল (১৮৮৮-১৯০৪) কলকাতা হাইকোর্টে জজিয়তি করেছেন। তবু শিক্ষাচিন্তাই আজীবন তাঁর সর্বচিন্তার পুরোভাগে ছিল। আর শুধু চিন্তা নয়, শাসকগোষ্ঠী পরিচালিত শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষা উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পেয়ে প্রচলিত শিক্ষা সম্পর্কে প্রচুর বাস্তব জ্ঞানও তিনি অর্জন করেছিলেন।

১৮৯০-৯১ ও ৯২ সনে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। ঐ সময় বাৎসরিক সমাবর্তন ভাষণে তিনি নীতি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা-

ভারতের প্রধান প্রধান ভাষাগুলির (Vernaculars) চর্চার আবশ্যকতা, কারিগরীবিদ্যা, স্ত্রীশিক্ষা, শরীরচর্চা প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা, প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন চিঠি এবং মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃতিদানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

১৮৯১ সনে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সহযোগিতায় 'Society for Higher Training of Men' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার ত্রুটিগুলি বর্জন করে দেশের যুবকদের জন্য একটি উচ্চ শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠাই ছিল ঐ সোসাইটির উদ্দেশ্য।

১৯০২ সনে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সদস্য নিযুক্ত হয়েছিলেন তিনি। সে সময় তাঁর নোট্ অব্ ডিসেণ্টে' তিনি যে মত ব্যক্ত করেছিলেন তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে জনগণের প্রতিনিধিত্ব হ্রাস করতে এবং মান উন্নয়নের অজুহাতে শিক্ষার প্রসার খর্ব করতে তিনি চাননি। এর পরই আমরা স্যার গুরুদাসকে দেখছি এক নবতর ভূমিকায়। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের উদ্দেশ্যে পাঠক্রম পরিচালনানীতি—এ সবের অন্যতম প্রধান নির্মাতা (architect) তিনি। অবশ্য এই নবতর ভূমিকার জন্য তাঁর প্রস্তুতি ছিল দু'দিক থেকে। ছাত্র ও অধ্যাপকরূপে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো এবং উপাচার্যরূপে এবং বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সদস্যরূপে রাষ্ট্রপরিচালিত শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট পরিচয় ছিল। এদিকে, ১৯০২ সনে তিনি সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত 'ডন সোসাইটির' সভাপতি হন। এই 'ডন সোসাইটি'তে বছরের পর বছর সপ্তাহে দু'দিন যে বক্তৃতাদি হত তাতে গীতার নিষ্কাম কর্মের সঙ্গে ভারতের শিল্পোন্নতি, জাতীয়ভাষা, পল্লীসংগঠন, ভারতীয় ঐক্য, প্রভৃতি সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় আলোচিত হত।

এইসব আলোচনায় গুরুদাস অনেক সময়ই উপস্থিত থাকতেন। তাছাড়া 'ডন সোসাইটি'তে তিনি শুধু দৈহিক সঙ্গ নয়, চিন্তার আদান-প্রদানের অবারিত সুযোগ পেয়েছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভগিনী নিবেদিতা, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, ব্যারিস্টার আব্দুল রসুল, মতিলাল ঘোষ, দীনেশচন্দ্র সেন, দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, ব্রহ্ম-বান্ধব উপাধ্যায়, প্রভৃতি দিকপালদের সঙ্গে। এ'সবের পরেও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি সহযোগী সদস্য হিসাবে পেয়েছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং ঈশ্বরচন্দ্র

বিদ্যাসাগর মহাশয়কে এবং বয়ঃকনিষ্ঠ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে।

'ডন সোসাইটি'তে ভারত আলোচনা এবং বিভিন্ন বঙ্গ মনীষীর সঙ্গে নিবিড় সঙ্গ লাভের সুযোগ গুরুদাসের শিক্ষাচিন্তায় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছিল এ কথা অনুমান করা অসঙ্গত হবে না।

গুরুদাস ১৯০৬ সনের ১৫ই আগস্ট টাউন হলে জাতীয় পরিষদের উদ্দেশ্যে, কর্ম-প্রণালী, পাঠ্যক্রম, পাঠন ও পরীক্ষা পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয় সবিস্তার আলোচনা করেন। 'ডন সোসাইটি যে শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য আন্দোলন করছিল এবং তার পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ যে শিক্ষার কথা বলেছিলেন (Education on national lines through national methods, complete world of Vivekananda Vol III, P. 302) গুরুদাসের বিবৃতিতে সেই শিক্ষাচিন্তার পরিপূর্ণ প্রতিফলন আশা করা স্বাভাবিক। কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার কাঠামো তাঁকে প্রচুর-ভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল বলেই সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার উদ্দেশ্য, পাঠক্রম, পরীক্ষা পদ্ধতি প্রভৃতির ক্ষেত্রে যেখানে জাতীয় ভাবের অভাব বা অন্যকোন ত্রুটী বর্তমান, তিনি সেইসব ক্ষেত্রে জাতীয়তা বা ভারতীয়তার প্রবর্তন করে এবং ত্রুটিগুলি বর্জন করে জাতীয় শিক্ষা-পর্ষদের শিক্ষার কাঠামো দাঁড় করিয়েছিলেন। গুরুদাস যখন জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের নির্মাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন, তখন তাঁর বয়স ষাট অতিক্রম করেছে। এ বয়সে জাতীয় শিক্ষা সম্পর্কে কোন বৈপ্লবিক চিন্তা বা কর্ম পদ্ধতি তাঁর কাছে আশা করাও সঙ্গত নয়। এ প্রসঙ্গে আরও একটি কথা প্রয়োজন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা নিম্ন পরিস্রবণ নীতিতে অখণ্ড আস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত। এজন্য জনশিক্ষার সবিস্তার আয়োজনের কথা বিশ্ববিদ্যালয় কোনদিন ভাবেনি; আর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামো অনুসরণ করে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের শিক্ষা ব্যবস্থাতেও গুরুদাস প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা অনুসারে প্রাইমারী, সেকেণ্ডারী, কলেজিয়েট শিক্ষার কথা ভাবলেন, অথচ যে জনশিক্ষার ব্যবস্থা বাদ দিয়ে কোন দেশে কোন শিক্ষাই পুরোপুরি জাতীয় শিক্ষা হতে পারে না; সেই জনশিক্ষার কোন ব্যবস্থা করলেন না।

একথা স্বতঃই মনে হয় যে গুরুদাস নিম্ন পরিস্রবণ নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। সে জন্যই হয়ত জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার নির্মাতা হয়েও তিনি

ইংরেজদের দেওয়া শিক্ষার কাঠামোকে আঘাত করেননি, সে শিক্ষা ব্যবস্থায় কেবল ভারতীয় ভাবধারা সঞ্চার করতে চেয়েছেন।

পরিশেষে স্যার গুরুদাসের কতগুলি শিক্ষা সম্পর্কিত পুস্তক সম্পর্কে কিছু বলা প্রয়োজন। বিভিন্ন সময়ে কয়েকটি পুস্তক রচনা করেও গুরুদাস তাঁর শিক্ষা ভাবনা দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত করেছিলেন।

১৯০৪ সনে তাঁর 'A few thoughts on Education' পুস্তকটি প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে তিনি শিক্ষার্থীর জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে (যথা শৈশব, কৈশোর, যৌবন) শিক্ষা ব্যবস্থা কি হওয়া উচিত সে সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা, কারিগরী শিক্ষা এবং জাতীয় শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর মতগুলি লিপিবদ্ধ করেছেন।

১৯০৭ সনে তাঁর 'শিক্ষা' নামক পুস্তক প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের দু'টি অধ্যায়ে তিনি শিক্ষার লক্ষ্য, শিক্ষার্থীর প্রকৃতি, প্রকৃত শিক্ষকের লক্ষণ; পাঠসূচী, পাঠ্যবস্তু এবং পাঠন প্রণালী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

'জ্ঞান ও কর্ম' নামে ১৯১০ সনে তিনি যে পুস্তকটি লিখেছিলেন, তারও ষষ্ঠ অধ্যায়ে তিনি শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

১৯১৪ সনে 'The Education Problem in India' নামে যে পুস্তকটি তিনি রচনা করেন তাতে শিক্ষা সংস্কার সম্পর্কে তাঁর মতগুলির সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি আছে। ঐ পুস্তকটি প্রকাশের ফলেই শিক্ষা সংস্কার ব্যাপারটা সরকার তথা দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।[২৪]

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় উপাচার্য। ১৮৯০, ১৮৯১ ও ১৮৯২ এই তিন বছরের সমাবর্তন ভাষণে তিনি তাঁর শিক্ষাচিন্তার মূল সূত্রগুলি দেশবাসীর কাছে ব্যক্ত করেছেন।

১৮৯০ সনের সমাবর্তন ভাষণে তিনি একটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সেটি হচ্ছে 'নীতি শিক্ষা' (Moral Education) এ সম্বন্ধে কিভাবে সার্থক ব্যবস্থা হতে পারে তার নিশানাও তিনি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন—'নীতির সঙ্গে ধর্মের ঘনিষ্ট যোগ আছে এবং ধর্ম বিষয়ে নিরপেক্ষতা বজায় রাখা কর্ত্তব্য—এই ভেবে আমরা শিক্ষা ক্ষেত্র থেকে নীতি শিক্ষাকে নির্বাসিত করেছি। কিন্তু শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি হয় সুনাগরিক তৈরী করা, তাহলে যে শিক্ষা কেবলমাত্র বুদ্ধিবৃত্তির চর্চাতেই সীমাবদ্ধ সে শিক্ষা অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য। এরকম অনেক সময়ই দেখা গেছে যে তীক্ষ্ণ-

বুদ্ধি মানুষের বুদ্ধির অপচয় ঘটছে, নয়তোযে বুদ্ধি নানা ক্ষতিকর কাজে প্রযুক্ত হয়েছে, অথচ মাঝারি গোছের বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা কেবল দৃঢ়সংকল্প ও চরিত্র শক্তির বলে মহৎ কাজ সম্পন্ন করছেন। আসল কথা নীতিবোধ বিবর্জিত তীক্ষ্ণবুদ্ধি মানুষ ও দেশের দশের হিতসাধন করতে পারে না, অস্ত্র তীক্ষ্ণধার হলেও কাঠ যদি পচা হয়, তাহলে তা দিয়ে সুন্দর মূর্তি গড়া যেতে পারে না।'[24]

নীতি শিক্ষার ব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি বললেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য হিসাবে যে সব সাহিত্য সংকলন নির্ধারিত হয়, তাতে এমন সব রচনা অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে যাতে শুধু রচনাশৈলীর উৎকর্ষ থাকবে না, চরিত্রোৎকর্ষেরও উদাহরণ থাকবে। এই সব সাহিত্য সংকলন পড়ানোর সময় শিক্ষক মহাশয়রা শুধু ব্যাকরণ ও ভাষা চর্চা করবেন না, পাঠ্যবস্তুতে যে নীতিশিক্ষা পাওয়া যাবে, তারও আলোচনা করবেন। সে আলোচনাই হবে নীতিশিক্ষার বিকল্প স্বরূপ। অবশ্য এ ব্যবস্থার সঙ্গে চাই শিক্ষকের আদর্শ জীবন যার প্রভাব পড়বে ছাত্রের জীবনের উপর। ডাঃ আরনল্ড তার চরিত্র মাহাত্ম্য দিয়ে 'রাগবী'র ছাত্রদের জন্য যা করেছিলেন এক লাইব্রেরী নীতিশিক্ষার ব'য়ের চেয়েও তার মূল্য বেশী।'[25]

১৮৯১ সনের ভাষণে তিনি ভারতের প্রধান প্রধান ভাষাগুলির (Vernacular) আবশ্যিক চর্চা, প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি, কারিগরী বিদ্যার প্রয়োজনীয়তা এবং স্ত্রী-শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, 'আমি মনে করি যে-সব ভারতীয় ভাষায় উল্লেখযোগ্য সাহিত্য আছে, সেগুলি এবং তৎসংশ্লিষ্ট প্রাচীন ভাষাগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবশ্য পাঠ্য হওয়া উচিত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে মাতৃভাষার মাধ্যমে জ্ঞান সঞ্চারিত না হলে জাতি হিসেবে আমাদের গভীর ও ব্যাপক সংস্কৃতি (Thorough and extensive culture) অর্জন করা সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যতদিন মাতৃভাষার মাধ্যমে জ্ঞানার্জনের ব্যবস্থা হয়নি, ততদিন মধ্য-যুগীয় ইউরোপের অজ্ঞানতা দূর হয়নি। তেমনি ভারতীয় জনগণের অজ্ঞানতা কিছুতেই দূর হবে না, যদি জনগণের কাছে তাদেরই মাতৃভাষায় জ্ঞানের আলো পৌঁছে দিই।'[26]

পরীক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি সম্পর্কে তিনি বললেন, 'আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে অধ্যয়ন অধ্যাপনার চেয়ে পরীক্ষাই বেশী প্রাধান্য পেয়ে থাকে, ফলে না

বুঝে মুখস্থ করার নীতি ছাত্রসমাজে বেড়ে চলেছে। কারণ মুখস্থ করার ফলে প্রকৃত জ্ঞানার্জনের জন্য চিন্তাশক্তির ব্যবহার না করেই পরীক্ষায় পাশ করা যায়। আমাদের মনে রাখতে হবে যে প্রশ্নপত্র যদি এমন দীর্ঘ বা দুরূহ হয় যার ফলে ছাত্ররা নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে, অধ্যয়ন ও চিন্তা দিয়ে তার উত্তর করতে পারছে না, তাহলে পাঠ্যবস্তু মুখস্থ না করে তাদের গত্যন্তর থাকে না। কিন্তু মুখস্থ করার রীতি ছাত্র সমাজে প্রচলিত হলে শিক্ষাক্ষেত্রে দুটো মারাত্মক কুফল অবশ্যম্ভাবী—এতে পরীক্ষকরা প্রবঞ্চিত হন এবং পরীক্ষার উপযোগিতা নষ্ট হয়। তাই মুখস্থ করার কুপ্রথা বন্ধ করতে হলে খুব দীর্ঘ বা দুরূহ প্রশ্নপত্র রচনা বা এমন প্রশ্নপত্র রচনা যাতে মুখস্থ করে পাশ নম্বর পাওয়া যায়—আমাদের পরিহার করতে হবে।[৯৭]

যে সময় ভারতবর্ষে কারিগরী বিদ্যাচর্চার উল্লেখযোগ্য সূচনা পর্যন্ত হয়নি, সে সময় কারিগরী বিদ্যাচর্চার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি বলেন, ‘এই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও কঠোর জীবন সংগ্রামের যুগে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদগুলি যদি আমরা কাজে লাগাতে না পারি, আমাদের কারুশিল্পীরা যদি তাদের বৃত্তিতে বিজ্ঞানের প্রয়োগ না শেখে, তাহলে দেশবাসীর বৈষয়িক উন্নতির আশা আমরা কখনোই করতে পারব না। তাই সরকার অথবা কোন বে-সরকারী সংস্থা যদি কারিগরী শিক্ষাদানের জন্যে উপযুক্ত বিদ্যালয় স্থাপন করেন তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিনা দ্বিধায় সে সব বিদ্যালয়কে উৎসাহিত করা উচিত হবে। এই উৎসাহদানের পথ হচ্ছে একটি বিকল্প ব্যবহারিক প্রবেশিকা পরীক্ষার (**Alternative practical Entrance Examination**) ব্যবস্থা করা অথবা ঐ সব বিদ্যালয়ে শিক্ষিত যোগ্য ছাত্রদের অর্জিত বিদ্যার যথোপযুক্ত স্বীকৃতিদান।[৯৮]

স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে তিনি বলেন, ‘স্ত্রীশিক্ষা উৎসাহিত করা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি মহৎ কর্তব্য।’ যে সমাজে স্ত্রীজাতি প্রকৃত শিক্ষিত নয়, সে সমাজ শিক্ষিত সমাজ হিসাবে গণ্য হওয়ার অযোগ্য। মানুষের প্রকৃত শিক্ষা হয় মায়ের কাছে। মানুষের কোমল বৃত্তিগুলির বিকাশে জননী, ভগিনী, স্ত্রী বা কন্যার চেয়ে কোন নীতিবিদ্‌ই বেশী সহায়তা করতে পারেন না। আর এজন্যেই আমরা জ্ঞানের দেবতাকে দেবী হিসাবে কল্পনা করেছি। এজন্যে মনু বলেছেন, ‘যেখানে নারীজাতি সম্মানিত; সেখানে দেবতারা আনন্দিত। যে সমাজে তাঁরা সম্মানিত নন, সেখানে সকল আচার অনুষ্ঠান নিষ্ফল।’[৯৯]

১৮৯২ সনের সমাবর্তন ভাষণে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষা পরিহার করে বিদেশীভাষার ব্যবহারের কুফল সম্পর্কে তিনি বলেন, এদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ছাত্রচিত্তে মৌলিক চিন্তার উদ্বোধন করতে পারে না, তার কারণ হচ্ছে আমাদের শিক্ষার মাধ্যম একটি দুরূহ বিদেশীভাষা যার প্রকৃতি আমাদের মাতৃভাষার প্রকৃতি থেকে বহুলাংশে ভিন্ন। এরকম একটা ভাষাকে অনুকরণ করেই আয়ত্ত করতে হয়। আর এই অনুকরণের অভ্যাস তার মূল ছাত্র-চিত্তে এমনভাবে চালিয়ে দেয়, যে তাদের বুদ্ধি পরিচালনার ক্ষমতাও বিপর্যস্ত হয়ে যায়। তাছাড়া যে দামী পোষাকে (ভাষায়) তাদের চিন্তাগুলি সাজাতে হয়, তাতে তাদের সীমিত মানসিক শক্তির এমন ভাবে ব্যয় হয়, যে চিন্তার পুষ্টির জন্য সে শক্তির সামান্যই অবশিষ্ট থাকে।'[৪০]

শরীর চর্চার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, 'এদেশে শিক্ষা শিক্ষার্থীর মানসিক উন্নতি সাধন করতে পারেনা, মানসিক বৃত্তিগুলিকে শক্তিশালী করতে পারে না, কারণ শিক্ষার্থীর শরীর চর্চা সম্পর্কে আমাদের অবহেলা। আমরা তাদের নানা বৌদ্ধিক কাজে প্রবৃত্ত করি, কিন্তু বুদ্ধি চর্চার নিদারুণ চাপ সহ্য করবার জন্য শরীরটিকে পটু করবার কথা চিন্তা করিনা। ফলে বুদ্ধির চর্চা করে ডিগ্রী ডিপ্লোমা পাওয়া শেষ হলেই দেখা যায়, ছাত্রদের দেহশক্তি, কর্মশক্তি চিরদিনের মত পঙ্গু হয়ে গেছে।'[৪১]

স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২)

রামমোহন স্বর্গত হলেন ১৮৩৩ সনে, ঈশ্বরচন্দ্র এলেন ১৮২০ সনে, আর ১৮৩৬ সনে হল রামকৃষ্ণের আবির্ভাব।

ইংরেজদের সাহিত্য, তাদের যুক্তিবাদ, বিজ্ঞান-প্রীতি একদিন রামমোহনকে নতুন জগতের সন্ধান দিয়েছিল। রামমোহনের উত্তর সাধক বিদ্যাসাগরের মানসলোকেও সেই নতুন জগতের চিত্র অবশ্যই ছিল এবং দুজনেই মাতৃভূমিকে সেভাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। রামমোহন-বিদ্যাসাগরের অনেক পরে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে এলেন নরেন্দ্রনাথ। পাশ্চাত্য দর্শন, পাশ্চাত্য বস্তুবাদ, যুক্তিবাদ ইত্যাদি অবলম্বন করে নরেন্দ্রনাথের জীবনের অনেক বছরই কেটে গিয়েছিল। তিনি ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করেও কিছুকাল কাটালেন। তারপর তাঁর চিত্তে এল আধ্যাত্মিক সঙ্কট।

এই সঙ্কটের সময়ে দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ দেবীভবতারিনীর মৃন্ময়ী মূর্তি সামনে রেখে আধ্যাত্মিক সাধনা করছেন। এই আত্মিক সঙ্কটের মুহূর্তে ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের দেখা হল। নরেন্দ্র নিজের বিদ্যাবুদ্ধি যুক্তি নিয়ে বাইরে ভিতরে অনেক লড়াই করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রামকৃষ্ণের কাছে তাঁর পরাভব ঘটল।

যে পটভূমিতে নরেন্দ্রের এই পরাজয়, এই রামকৃষ্ণানুগ ভারত-ভাবনা, তা বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে এপথ ছাড়া অন্যপথ নরেন্দ্রের ছিল না। ব্রিটিশ অধিকারের আগেও নানা জাতি নানা দেশ থেকে এসে ভারতের বুকে দৌরাত্ম্য করেছে, তার ধর্মে (Religion) আঘাত করেছে, কিন্তু এদের ভারত-অধিকার থেকে ব্রিটিশের ভারত-অধিকার ভিন্ন ধরণের। ব্রিটিশ এসে ভারতবর্ষকে এক অভাবিতপূর্ব সঙ্কটের মধ্যে ফেলে দিল—ভারতের অন্তরে-বাইরে সংস্কৃতির সঙ্কট দেখা দিল। ব্রিটিশ আমলেই দেশের চিন্তাশীলরা দেখলেন এদেশে নানা জঘন্য কুসংস্কার ধর্মের নামে প্রচলিত আছে। সতীদাহ প্রথা এদেশে প্রচলিত, সমুদ্রযাত্রা ও বালবিধবার পুনর্বিবাহ এদেশে নিষিদ্ধ। উদার হিন্দুরা সেদিন হিন্দুপ্রথা ও হিন্দুধর্মের ধিক্কারে সোচ্চার।

ভারতের এমনি দুর্যোগের দিনে রামমোহন এসেছিলেন। অসাধারণ তাঁর পাণ্ডিত্য, অসাধারণ তাঁর স্বাধীন চিন্তার ক্ষমতা। তিনি হিন্দুদের মূর্তিপূজাকে ধিক্‌কৃত করলেন, সতীদাহ রহিত করালেন, কিন্তু দেশের সর্বজনচিত্তে তাঁর আসন প্রতিষ্ঠিত হল না। ১৮৩৩ সনে বিদেশে তিনি দেহ রাখলেন। প্রিন্স দ্বারকানাথ হয়ত তাঁর কাজ কিছু এগিয়ে দিতে পারতেন, কিন্তু তিনিও বিদেশে গত হলেন ১৮৪৬ সনে।

দেবেন্দ্রনাথ মিশনারীদের গ্রাস থেকে হিন্দু ধর্ম ও সমাজকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে ১৮৫০ সনে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করলেন, কিন্তু সেইসঙ্গে তার সমগ্র শক্তি এবং প্রচেষ্টাকে বহুল পরিমাণে সীমাবদ্ধ করে দিলেন। ব্রাহ্ম হিসেবে তিনি গোঁড়া হিন্দুর কাছে ঠিক স্বধর্মাবলম্বী নন, তাই হিন্দুধর্মের সংস্কার সম্পর্কে কিছু বক্তব্যের অধিকার তাঁর রইল না। তা ছাড়া ব্রাহ্মধর্ম বহু হিন্দুকে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ থেকে নিবৃত্ত করে থাকলেও কিছু সংখ্যক নেতৃস্থানীয় ব্রাহ্মদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্মের কতকগুলি বিষয়ে বিশেষ অনুরাগ ছিল এবং সকল ব্রাহ্মের মধ্যেই প্রচলিত হিন্দুধর্মের প্রতি বিরাগ ছিল। হিন্দুসমাজের এই আধ্যাত্মিক বিপর্যয় বিবেকানন্দের চিত্তে অবশ্যই সঙ্কট এনেছিল এবং

তিনি এই সঙ্কট ত্রাণের নেতা খুঁজে পেলেন শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে।

রামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসবার পর থেকেই বিবেকানন্দ সনাতন হিন্দুধর্ম তথা ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা নিয়ে মেতে গেলেন এবং ভারতবর্ষকে তার নিজস্ব আধ্যাত্মিকতায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবার ব্রত নিয়ে সমগ্র শক্তি সে-ব্রত উদ্‌যাপনে নিয়োগ করলেন। গভীর চিন্তার ফলে তাঁর প্রতীতি হল যে, ভারতবাসীর জীবনের কেন্দ্র হচ্ছে Religion বা ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতার বাণী বিশ্বকে শোনাবার দায়িত্ব ভারতবর্ষের। এই প্রতীতির ফলেই দেশে বিদেশে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার প্রচার ও প্রসারে তিনি জীবন উৎসর্গ করলেন।

এই আধ্যাত্মিকতা পুনরুজ্জীবনের ব্রত নিয়ে চলতে চলতে স্বামীজী মাঝে মাঝে ভারতবাসীর শিক্ষা সম্পর্ক চিন্তা করেছেন। কথায়, বার্তায়, পত্রে, রচনায় তাঁর শিক্ষাচিন্তা বিক্ষিপ্ত রয়েছে। তাঁর শিক্ষাচিন্তার মূলেও তাঁর অধ্যাত্মচিন্তা এবং ভারতে আধ্যাত্মিক জীবনের পুনঃ প্রতিষ্ঠাই সে শিক্ষা চিন্তার প্রথম ও শেষ কথা।

১৮৯৭-তে মাদ্রাজে শেষ বক্তৃতায় স্বামীজী বলেছিলেন, আমরা যে শিক্ষা পাচ্ছি তাতে কতকগুলি গুণ আছে, বিশেষ দোষও আছে। এ সব দোষ এত বেশী যে গুণগুলি তাতে ম্লান হয়ে যায়। প্রথমতঃ এ শিক্ষায় মানুষ তৈরী হয় না, এ শিক্ষা সম্পূর্ণ নাস্তিভাবপূর্ণ। এই নাস্তিভাবপূর্ণ শিক্ষা মৃত্যুর চেয়ে ভয়ানক। বালক স্কুলে গেল, সে প্রথম শিখল তার বাপ একটা মূর্খ; দ্বিতীয়তঃ তার পিতামহ একটা পাগল, তৃতীয়তঃ প্রাচীন আর্যগণ সব ভণ্ড (hypocretes) আর চতুর্থতঃ তার পবিত্র শাস্ত্রগুলি সব মিথ্যা। ষোল বছর বয়স হবার পূর্বেই সে একটা প্রাণহীন, মেরুদণ্ডহীন 'না'-এর সমষ্টি (Bundle of negation) হয়ে দাঁড়ায়। আর এ ধরনের শিক্ষার ফল হয়েছে যে পঞ্চাশ বছরের ভিতর দেশে সত্যিকারের মৌলিকতা-পূর্ণ মানুষ জন্মাল না।

এই জন্যই আমাদের ঐহিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষাকে আমাদের আয়ত্তাধীনে আনতে হবে, আর ঐ শিক্ষা চলবে যথাসম্ভব জাতীয় পথে, জাতীয় পদ্ধতিতে (On national lines, through national methods)।[৩৯]

শিক্ষা সম্পর্কে স্বামীজীর সর্বজন-বিদিত উক্তি **'Education is the perfection already in man. Like fire in a piece of flint,**

knowledge exists in the mind. Suggestion is the friction which brings it out.'—অর্থাৎ শিক্ষা হচ্ছে মানুষের ভিতর যে পূর্ণতা প্রথম থেকেই বর্তমান তারই প্রকাশ। চকমকি পাথরের অন্তর্নিহিত আগুনের মত জ্ঞান মানুষের মনের মধ্যে নিহিত থাকে। শিক্ষা ঘর্ষণের কাজ করে সে আগুনকে প্রকাশ করে।[৩৩]

স্বামীজী বলেছেন, প্রতিটি মানুষের মধ্যে ব্রহ্ম আছেন। সেই ব্রহ্মকে উদ্ভাসিত করে তোলাই হবে শিক্ষার কাজ। 'জ্ঞানযোগ' গ্রন্থে স্বামীজী এই বক্তব্যকেই উদাহরণ দিয়ে পরিস্ফুট করেছেন এইভাবে—'এই যে ক্রোশ ব্যাপী বৃহৎ বৃক্ষ রহিয়াছে তাহাতে সর্ষপ বীজের অষ্টমাংশের তুল্য ক্ষুদ্র বীজ রহিয়াছে ঐ মহাশক্তিরাশি তথায় নিহিত রহিয়াছে। আমরা জানি একটি জীবাণু কোষের ভিতর অত্যদ্ভুত প্রখরা বুদ্ধি কুণ্ডলীকৃত হইয়া রহিয়াছে, তবে অনন্ত শক্তি কেন না তাহাতে থাকিতে পারিবে? আমরা জানি ইহা সত্য।....আমাদের ভিতর শক্তি পূর্ব হইতে অন্তর্নিহিত ছিল অব্যক্তভাবে, কিন্তু উহা ছিল নিশ্চয়ই। অতএব সিদ্ধান্ত এই মানুষের আত্মার ভিতর অনন্ত শক্তি রহিয়াছে। মানুষ উহার সম্বন্ধে না জানিলেও উহা রহিয়াছে, কেবল উহাকে জানিবার অপেক্ষা মাত্র।'[৩৪]

শিক্ষার্থীর আত্মার এই বিকাশের জন্য প্রথম প্রয়োজন স্বাধীনতা।[৩৫]

স্বামীজী বলছেন, 'কারও কল্যাণ করতে পার এ ধারণা ছেড়ে দাও, তবে যেমন বীজকে জল, মাটি, বায়ু প্রভৃতি তার বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি জুগিয়ে দিলে সে নিজ প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী যা কিছু আবশ্যক গ্রহণ করে ও নিজের স্বভাবানুযায়ী বেড়ে থাকে, তুমিও সেইভাবে অপরের কল্যাণ সাধন করতে পার।'[৩৬]

'স্বামীজী বলছেন, জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায় একাগ্রতা। মনের একাগ্রতা শক্তি দিয়েই মানুষ জ্ঞান লাভ করতে পারে। প্রকৃতির দ্বারদেশে আঘাত করতে জানলে প্রকৃতি তার রহস্য উদঘাটিত করে দেন এবং সেই আঘাতের শক্তি ও তেজ একাগ্রতা থেকেই আসে।'[৩৭]

'একাগ্রতা অর্জনের একটি উপায় হচ্ছে প্রতিদিন নিয়মিত অভ্যাস। এই অভ্যাসের দ্বারা মন স্থিরতা লাভ করে।[৩৮]

আবার এক বিষয়ে মন একাগ্র করতে পারলে যে কোন বিষয়ে তাকে একাগ্র করতে পারা যায়।[৩৯]

এই একাগ্রতা অর্জনের জন্য চাই ব্রহ্মচর্য-পালন। তাই শিক্ষার্থীর পক্ষে ব্রহ্মচর্য অপরিহার্য। স্বামীজী বলছেন, কর্মশক্তিকে আধ্যাত্মিক শক্তিতে পরিণত কর। এই শক্তিটি যত প্রবল থাকবে এর দ্বারা তত অধিক কাজ হতে পারবে। প্রবল জলের স্রোত পেলেই তার সহায়তায় খনির কার্য হতে পারে।[40]

'ব্রহ্মচর্যবান ব্যক্তির মস্তিষ্কে প্রবল শক্তি, মহতী ইচ্ছাশক্তি সঞ্চিত থাকে। ব্রহ্মচর্য ছাড়া মানসিক তেজ লাভ করা সম্ভব নয়। পৃথিবীতে যাঁরা মহা মহা মস্তিষ্কশালী মানুষ তাঁরা সকলেই ব্রহ্মচর্যবান ছিলেন। মানব সমাজের নেতৃস্থানীয়ব্যক্তিদের সকল শক্তি এই ব্রহ্মচর্যের দ্বারাই তাঁরা লাভ করেছিলেন।'[41]

কুম্ভকোনাম্ বক্তৃতায় (The mission of Vedanta) ১৮৯৭ সনে স্বামীজী বলেছেন, আমি প্রাচ্য ও পাশ্চত্ত্য দেশে প্রচুর ঘুরেছি, দেখেছি সকল জাতির একটা প্রধান আদর্শ আছে। সে আদর্শই জাতির মেরুদণ্ড স্বরূপ। কোন কোন জাতির জীবনের মূল ভিত্তি রাজনীতি, কারও বা সামাজিক উন্নতি, কারও বা সাংস্কৃতিক উন্নতি। কিন্তু আমাদের জাতীয় জীবনের মূলভিত্তি ধর্ম, একমাত্র ধর্ম। এই ধর্মই আমাদের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড। আমাদের জীবনরূপ প্রাসাদের মূল ভিত্তি।'[42]

আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তি ধর্ম বলে স্বামীজী ধর্মকে আমাদের শিক্ষার ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু এ ধর্ম যে বেদান্ত বা উপনিষদের ধর্ম, সে কথা বহুবার স্পষ্ট করেই বলেছেন। বর্তমান যুগের ভারতবাসীকে তিনি বলেছেন, তোমাদের সেই অতি প্রাচীন সনাতন প্রথা অবলম্বন কর, কারণ তখনকার শাস্ত্রের প্রত্যেক বাণী বীর্যবান, স্থির, অকপট, হৃদয় থেকে উত্থিত, তার প্রত্যেকটি সুর অমোঘ। ...সেই প্রাচীন নির্ঝরিনীর জল আবার প্রাণ ভরে পান কর। এ ছাড়া ভারতের বাঁচবার উপায় নেই।[43]

স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে স্বামীজী বলছেন, ধর্ম, শিল্প, বিজ্ঞান, ঘরকন্না, রন্ধন, সেলাই, শরীর পালন, এই সকল বিষয়ের স্থূল স্থূল মর্মগুলিই মেয়েদের শেখানো উচিৎ। আদর্শ নারী চরিত্র সকল ছাত্রীদের সামনে সর্বদা ধরে উচ্চ ত্যাগরূপ ব্রতে তাদের অনুরাগ জন্মে দিতে হবে। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, লীলাবতী, খনা, মীরা, এঁদের জীবনচরিত মেয়েদের বুঝিয়ে দিয়ে তাদের নিজেদের জীবন এইরূপে গঠিত করতে হবে।[44]

আবার তিনি বলেছেন, 'শিক্ষাই বলিস আর দীক্ষাই বলিস ধর্মহীন হলে

তাতে গলদ থাকবেই থাকবে। এখন ধর্মকে centre করে স্ত্রী শিক্ষার প্রচার করতে হবে। ধর্ম ভিন্ন অন্য শিক্ষাটি Secondary হবে। ধর্মশিক্ষা, চরিত্র-গঠন, ব্রহ্মচর্যব্রতোদ্‌যাপন এজন্য শিক্ষার দরকার, বর্তমান কালে এ পর্যন্ত ভারতে যে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার হয়েছে তাতে ধর্মটাকেই Secondary বা গৌন করে রাখা হয়েছে। তাইতেই তুই যে সব দোষের কথা বললি সেগুলি হয়েছে।'[45]

স্ত্রীশিক্ষা প্রসঙ্গে স্বামীজী বলছেন, সে জন্য আমার ইচ্ছা আছে কতকগুলি ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণী তৈরী করব। ব্রহ্মচারীরা কালে কালে সন্ন্যাস গ্রহণ করে দেশে দেশে গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে mass-এর মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে যত্নপর হবে। আর ব্রহ্মচারিণীরা মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করবে। কিন্তু দেশী ধরনে এই কাজ করতে হবে। পুরুষদের জন্য যেমন কতকগুলি centre (শিক্ষাকেন্দ্র) করতে হবে, মেয়েদের শিক্ষাদিতেও সেইরূপ কতকগুলি কেন্দ্র করতে হবে, শিক্ষিকা ও সচ্চরিত্রা ব্রহ্মচারিণীরা ঐ সকল কেন্দ্রে শিক্ষার ভার নিবে।'[46]

শিক্ষার মাধ্যমে মেয়েদের আদর্শ চরিত্রের অধিকারী করে তুলতে হবে। আর স্বামীজীর মতে রমণী চরিত্রের যত রকম ভারতীয় আদর্শ আছে সবই সীতা চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। তাই স্বামীজী মাদ্রাজে ভারতীয় মহাপুরুষগণ (The sages of India) সম্পর্কে বক্তৃতায় বলেন, আমাদের নারীদের আধুনিকভাবে গঠিত করবার যে সব চেষ্টা হচ্ছে সে সব চেষ্টার মধ্যে তাদের সীতা চরিত্রের আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট করবার চেষ্টা যদি থাকে, তবে সেগুলি অবশ্যই বিফল হবে। ভারতীয় নারীদের সীতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিজেদের উন্নতি বিধানের চেষ্টা করতে হবে। ভারতীয় নারীর উন্নতির এই একমাত্র পথ।'[47]

জনশিক্ষা সম্পর্কে স্বামীজী বলেছেন আমাদের মস্ত জাতীয় পাপ হচ্ছে জনগণকে অবহেলা করা, আর এই অবহেলার ফলেই আমাদের পতন। যতদিন ভারতের জনগণ সুশিক্ষিত না হবে, বা আমাদের যত্ন পরিচর্যার থেকে বঞ্চিত থাকবে, ততদিন রাজনীতি দিয়ে কোন ফল হবে না। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে পরিভ্রমণ করতে করতে স্বামীজী দেখেছেন সে সব দেশে দরিদ্রেরও কিছু শিক্ষাদীক্ষা আছে। আমাদের অগণ্য দুর্দশাগ্রস্ত জনগণের কথা ভেবে তাঁর মনে হয়েছে যে শিক্ষার অভাবেই আমাদের দেশের

জনসাধারণের এ ধরনের দুরবস্থা। তিনি বুঝেছেন শিক্ষার ফলেই পাশ্চাত্যের জনসাধারণ আত্মবিশ্বাসের অধিকারী হয়েছে। আত্মবিশ্বাসের ফলেই তাদের অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম জেগে উঠেছে আর আমাদের দেশের জনসাধারণের অন্তরস্থিত ব্রহ্ম দিনে দিনে সুপ্ত হয়ে পড়ছে।

স্বামীজী বলেছেন, 'প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে-জাতির মধ্যে জনসাধারণের ভিতর বিদ্যাবুদ্ধি যত পরিমাণে প্রচারিত সে-জাতি তত পরিমাণে উন্নত। ভারতবর্ষের যে সর্বনাশ হইয়াছে তাহার মূল কারণ ঐটি, দেশীয় সমগ্র বিদ্যাবুদ্ধি এক মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে রাজশাসন ও দম্ভবলে আবদ্ধ করা। যদি পুনরায় আমাদিগকে উঠিতে হয় তাহা হইলে ঐ পথ ধরিয়া অর্থাৎ সাধারণ জনগণের মধ্যে বিদ্যার প্রচার করিয়া।'[৪৮]

জনশিক্ষাকে স্বামীজী জাতির সব সমস্যা সমাধানের প্রকৃষ্টতম উপায় বলে মনে করতেন। ভারতের আশ্রমে ও তপোবনে যে আধ্যাত্মিক শিক্ষা লুকিয়ে আছে সেগুলিকে সাধারণের গোচরে আনতে হবে, অর্থাৎ উপনিষদের মূল কথাগুলি ভারতের কুটীরে কুটীরে কোটি কোটি অশিক্ষিত জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। আমাদের উপনিষদে, আমাদের পুরাণে, আমাদের অন্যান্য শাস্ত্রে যে সব অপূর্ব সত্য নিহিত আছে, সে-সব মঠ সমূহ থেকে, অরণ্য থেকে সম্প্রদায় বিশেষের অধিকার থেকে বের করে সমগ্র ভারতভূমিতে ছড়িয়ে দিতে হবে। যেন ঐসব শাস্ত্রে নিহিত মহাবাক্যের ধ্বনি উত্তর থেকে দক্ষিণে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে, হিমালয় থেকে কুমারিকা, সিন্ধু থেকে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত ছুটতে থাকে। সকলকেই এই সব শাস্ত্রে নিহিত উপদেশ শোনাতে হবে।[৪৯]

জনশিক্ষা সম্পর্কে স্বামীজী আরও বলেছেন যে, উপনিষদের বাণী রয়েছে সংস্কৃত ভাষায় কিন্তু তা জনগণের মাঝে প্রচার করতে হবে মাতৃভাষার মাধ্যমে। জনশিক্ষার ব্যবস্থা মাতৃভাষার মাধ্যমেই করতে হবে। কিন্তু তারই পাশাপাশি চলবে সংস্কৃত চর্চা। দেশের দীনতম মানুষটিকেও সংস্কৃতিবান করে তুলতে হবে। লোকশিক্ষার এই হচ্ছে আদর্শ। সংস্কৃত চর্চার ব্যবস্থা করেই এ সংস্কৃতি সম্ভব হবে। তিনি বলেছেন দেশীয় ভাষায় জনসাধারণের শিক্ষা চললেও সংস্কৃত শিক্ষা তার সঙ্গে চলা চাই। কারণ সংস্কৃত শব্দগুলির উচ্চারণ মাত্রই জাতির মধ্যে একটা গৌরব, একটা শক্তির ভাব জাগবে।[৫০]

পূর্বেই বলা হয়েছে বিবেকানন্দের শিক্ষা চিন্তার মূলে তাঁর অধ্যাত্মচিন্তা এবং ভারতে তথা বিশ্বে আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতিষ্ঠাই সে শিক্ষা চিন্তার প্রথম ও শেষ কথা। আর এ অধ্যাত্মিকতা উপনিষদকে ভিত্তি করে, অবলম্বন করে।

অল্প কথায়, উপনিষদের বাণীতে শিক্ষার্থীকে অনুপ্রাণিত করাই হল বিবেকানন্দের শিক্ষা চিন্তার মূল কথা। বেদান্তের বাণীতে অনুপ্রাণিত হলে শিক্ষার্থীর সর্বজীবে ঈশ্বরানুভূতি আসবে এবং এই অনুভূতি তাকে বিশ্বের মানুষের সঙ্গে প্রেম ও সেবার বন্ধনে আবদ্ধ করবে। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক প্রেম ও সেবার উপর প্রতিষ্ঠিত হলে, ভারতে তথা বিশ্বে এক নতুন মানব সমাজ ভবিষ্যতে গড়ে উঠবে।

এই মানব সমাজের আবির্ভাব সত্য ও ত্বরান্বিত করে তোলার আকাঙ্খাই বিবেকানন্দের শিক্ষা চিন্তার মূলে কাজ করেছে।

সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৮৬৫-১৯৪৮

বাঙালীর স্বদেশী আন্দোলন এবং জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দান সম্পর্কে মুষ্টিমেয় ইতিহাস-সচেতন শিক্ষিত ব্যক্তি ছাড়া কেউ খবর রাখেন না।

১৮৯৩ সনে সতীশচন্দ্র বিজয় গোস্বামীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং দীক্ষার পর তিনি সন্ন্যাস গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাঁর গুরুদেব তাঁকে সন্ন্যাসের পথ পরিহার করে স্বদেশে শিক্ষাবিস্তার ও ছাত্র গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করতে নির্দেশ দেন। গুরুদেবের এই নির্দেশের পর থেকে সতীশচন্দ্রের সকল প্রচেষ্টা বাংলাদেশে শিক্ষাবিস্তার এবং ছাত্রগঠনের কাজে মুখ্যতঃ নিয়োজিত হয়েছিল।

১৮৯৫ সনে স্যার রমেশ চন্দ্র মিত্রের সহযোগিতায় সতীশচন্দ্র ভবানীপুরে 'ভাগবত চতুষ্পাঠী' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই চতুষ্পাঠীর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বিশুদ্ধ প্রাচীন পদ্ধতি (Ancient or hodox method) অনুসারে বিনা বেতনে উপযুক্ত অভিজাত শিক্ষকবৃন্দের তত্ত্বাবধানে সকল আগ্রহশীল ছাত্রকে হিন্দুধর্মীয় দর্শন ও অন্যান্য হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়নে সহায়তা করা; কিন্তু এর মূল লক্ষ্য হল হিন্দু শৃঙ্খলা অনুযায়ী প্রাচীন গুরুগৃহবাসের আদর্শ অনুসরণ করে শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন জীবন ও অভ্যাস নিয়ন্ত্রণ। উপরোক্ত উদ্দেশ্যের সঙ্গে

একটি আধুনিক জীবনোপযোগী উদ্দেশ্য সংযুক্ত করেছিলেন সতীশচন্দ্র ব্যবহারিক ও কারিগরী শিক্ষাদান।

সতীশচন্দ্রের কর্মজীবনে 'ভাগবত চতুষ্পাঠীর' প্রতিষ্ঠার পরবর্তী উল্লেখ যোগ্য ঘটনা 'ডন সোসাইটির' প্রতিষ্ঠা। লর্ড কার্জন ১৯০২ সনের জানুয়ারী মাসে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন নিয়োগ করেছিলেন। এই কমিশন তার রিপোর্টে শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারী প্রভাব হ্রাস করে সরকারী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সুপারিশ করেছিলেন। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই কমিশনের সদস্য ছিলেন এবং কমিশনের রিপোর্টের সঙ্গে একমত তিনি হতে পারেন নি। তাঁর মত তিনি পৃথকভাবে 'note of dissent'-এ ব্যক্ত করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন রিপোর্টের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসেবে সতীশচন্দ্র ১৯০২ সনের জুলাই মাসে 'ডন্ সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিজে এই সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক হন এবং সভাপতি হন তদানীন্তন মেট্রোপলিটন ইন্সটিটিউশনের অধ্যক্ষ নগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়।

ডন সোসাইটির উদ্দেশ্য নির্ধারণ ও প্রচেষ্টার মধ্যেই শিক্ষাবিদ্, জাতি-সংগঠক সতীশচন্দ্রকে পুরোপুরি পাওয়া যেতে পারে। সেজন্য ডন্ সোসাইটির উদ্দেশ্য ও কর্মপ্রচেষ্টার আলোচনা প্রয়োজন।

ডন সোসাইটির প্রথম উদ্দেশ্য ছিল তদানীন্তন পুঁথি-সর্বস্ব ডিগ্রিলাভ-প্রণোদিত শিক্ষাব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে এমন শিক্ষার ব্যবস্থা করা যাতে ছাত্রদের স্বাধীন চিন্তা ও কল্পনার-উন্মেষ ঘটে, যাতে অর্জিত বিদ্যা জীবনের স্বাভাবিক অঙ্গে পরিণত হয়।

সোসাইটির দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রদের নৈতিক শিক্ষা দান ও চরিত্র গঠন। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় এদু'য়ের কোন স্থান ছিল না। সোসাইটির তৃতীয় উদ্দেশ্য ছিল ব্যবহারিক ও কারিগরী শিক্ষাদান। বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়ায় এর কোনো ব্যবস্থা সে সময় ছিল না, অথচ দেশের আর্থিক সমৃদ্ধির জন্য এই শিল্প ও কারিগরী শিক্ষা ছিল অপরিহার্য।

সোসাইটির চতুর্থ লক্ষ্য ছিল ছাত্রদের মনে স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি প্রীতির উদ্বোধন এবং স্বদেশ ও স্বজাতির জন্য আত্মত্যাগের আকাঙ্ক্ষা সঞ্চার করা।

১৯০৪, সেপ্টেম্বর থেকে সতীশচন্দ্রের ডন্ পত্রিকা (প্রথম প্রকাশ মার্চ, ১৮৯৭) ডন্ সোসাইটির মুখপত্রে রূপান্তরিত হয় এবং পত্রিকার নাম হয় 'ডন অ্যাণ্ড ডন্ সোসাইটিজ্ ম্যাগাজিন।' ১৯০৭ সন থেকে এই পত্রিকার প্রতি-

সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠার উপরিভাগে নিম্নলিখিত প্রশ্ন এবং তার উত্তরগুলি ছাপা হত। এই প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমেই সতীশচন্দ্র ভারতবাসীর জাতীয় শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর মত সুস্পষ্ট ব্যক্ত করে গেছেন।

প্রশ্নটি হচ্ছে—ভারতীয় ছাত্ররা কিভাবে তাদের স্বদেশপ্রীতি বাড়াতে পারে ?

প্রশ্নটির উত্তরগুলি হচ্ছে :—

(১) ভারতবর্ষ ও ভারতীয় সভ্যতা (হিন্দু ও মুসলিম সভ্যতা) সম্পর্কে তাদের জ্ঞান বাড়িয়ে,

(২) নিজ জেলা, শহর অথবা গ্রামের হিতার্থে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে,

(৩) দেশের শিল্প এবং শিল্পোদ্যোগকে কিছুটা স্বার্থত্যাগ করেও সহায়তা করে।

(৪) ভারতবর্ষের শিক্ষা এবং তৎসংশ্লিষ্ট আন্দোলন গুলিকে যেগুলির লক্ষ্য স্বার্থত্যাগ প্রবৃত্তির পোষণ এবং ভারতবাসীর মনের নির্মাণ বৃত্তিগুলির উন্নতি-সাধন-(Fostering the unselfish instincts and developing the constructive faculties) সমর্থন ও সহায়তা করে।

ডন পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার শীর্ষদেশে লিখিত এই প্রশ্নোত্তরের মধ্যেই বিধৃত আছে ডন সোসাইটির আদর্শ বা লক্ষ্য এবং তার সকল প্রচেষ্টার স্বরূপ। এই ডন্ সোসাইটির আদর্শই বাস্তব রূপ নিয়েছিল জাতীয় শিক্ষা পর্ষদের মধ্যে। জাতীয় শিক্ষা পর্ষদে সে যুগের বিখ্যাত স্বদেশী নেতা ও মনীষীদের শুধু যে সংযোগ ঘটেছিল তা নয়, তাদের অনেকেই এই প্রচেষ্টাকে সার্থক করার জন্য নানাভাবে অগ্রণী হয়েছিলেন। জাতীয় শিক্ষাপর্ষদের আদর্শ ও লক্ষ্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে যোগাযোগ ছিল তা নেহাৎ আকস্মিক নয়। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে ডন্ সোসাইটির উদ্দেশ্য ও আদর্শ রবীন্দ্র-ভাবিত শিক্ষানীতি ও কর্মসূচী থেকে বিশেষ অভিন্ন নয়। অনেক আগে থেকে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা সম্পর্কে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছিলেন, জাতীয় শিক্ষা পরিষদের উপর সেই সিদ্ধান্তের প্রভাব কম কার্যকর হয়নি।

উপরে ডন্ সোসাইটির উদ্দেশ্য বিবৃত হয়েছে। সংগঠক সতীশচন্দ্রের পূর্ণ পরিচয় প্রতিষ্ঠিত করতে হলে ঐ সোসাইটির কার্যক্রমের পরিচয় প্রয়োজন। ডন্ সোসাইটির কাজকর্ম-তিনটি শাখায় বিভক্ত ছিল—সাধারণ বিভাগ, শিল্প বিভাগ ও পত্রিকা বিভাগ।[৫৯]

সাধারণ বিভাগে সপ্তাহে দুদিন করে ক্লাস নেওয়া হত। রবিবারে হত 'জেনারেল ট্রেনিং ক্লাস' আর শুক্রবার হত 'মর‍্যাল্ অ্যাণ্ড রিলিজিয়াস্ ট্রেনিং ক্লাস।'

সাধারণ বিভাগে সতীশচন্দ্রের বক্তৃতা সম্পর্কে অধ্যাপক বিনয় সরকার বলছেন—'ব্যক্তির চেয়ে জাতি বড় এই ছিল মুদ্দা। পরিবারের চেয়েও দেশ বড় এই মন্তরই প্রচারিত হ'তো নানা আকারে। * * * যাই আলোচিত হোক না কেন, ডাইনে বাঁয়ে পাঁয়তারা করতে করতে সতীশবাবু এসে দাঁড়াতেন স্বদেশ-নিষ্ঠায়।'[৫৩]

শিল্পবিভাগের উদ্দেশ্য ছিল তিনটি :—

দেশের শিল্পবিষয়ক সমস্যা সম্পর্কে ছাত্রদের অবহিত করা, হাতে কলমে শিল্প শিক্ষা দেওয়া, স্বদেশী শিল্পের প্রতি অনুরাগ সঞ্চার করা।

ডন সোসাইটির তৃতীয় শাখা ছিল পত্রিকা বিভাগ। এই বিভাগ খোলা হয় ১৯০৪-এর সেপ্টেম্বর থেকে। ১৯০৪ থেকে ১৯০৬-এর যুগে পত্রিকার মূল লক্ষ্য হল ভারত বিষয়ক গবেষণা। এই ভারত বিষয়ক গবেষণা প্রকাশের জন্য সতীশচন্দ্র তাঁর পত্রিকায় 'ইণ্ডিয়ানা' নামক অংশের প্রবর্তন করেন। এই অংশে ভারতীয় নরনারী, শিক্ষাসংস্কৃতি, সাহিত্য, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ নিয়মিতভাবে প্রকাশ হত।

১৯০৬-১৯০৯ পর্যন্ত ডন ম্যাগাজিন মুখ্যতঃ জাতীয় শিক্ষা পরিষদের বাণীই ঘোষণা করে, আবার ১৯১০—১৯১৩ পর্যন্ত ডন পত্রিকায় প্রাধান্য লাভ করে ভারতীয় শিল্প, ভাস্কর্য, সঙ্গীত ও ইতিহাসের আলোচনা। ডন পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে সম্পাদক সতীশচন্দ্র ভারত বিষয়ক কতকগুলি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। এই প্রবন্ধগুলির শিরোনাম দেখলেই সম্পাদক সতীশচন্দ্রের ভারতচিন্তার স্বরূপ ধরা পড়বে। বোঝা যাবে কীভাবে তিনি তাঁর পত্রিকার মাধ্যমে আত্মবিস্মৃত ভারতবর্ষের কাছে ভারতের অতীত, বর্তমান ও সম্ভাব্য ভবিষ্যতের চিত্র তুলে ধরবার চেষ্টা করেছিলেন।[৫৪a]

ডন পত্রিকায় সতীশচন্দ্র নিজেও শিক্ষা সম্পর্কে বেশ কয়েকটি নিবন্ধ লিখেছেন। সেগুলি শিক্ষাবিদ্ সতীশচন্দ্রের শিক্ষাচিন্তার উজ্জ্বল পরিচয় বহন করছে।

ঐ পত্রিকায় ১৮৯৮ সনের ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পর্কে সতীশচন্দ্র লিখলেন—"* * * বৈষয়িক দিক থেকেও এ দেশের

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর বেশীরভাগ স্নাতক ও অন্যান্য ছাত্ররা শ্রদ্ধাহীন হয়ে পড়েছে। কারণ এরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে সাহিত্য ও আধা বিজ্ঞানে যে ভাসা-ভাসা জ্ঞান পেয়েছে তা দিয়ে সামান্যতম জীবিকারও সংস্থান করতে পারছে না।" তিনি আরও বললেন, বিদেশী শিক্ষা আমাদের মধ্যে মৌলিক মানুষ তৈরী করতে পারেনি। এই বিদেশী শিক্ষা আমাদের আত্মবিশ্বাসী ও আত্মনির্ভর করেনি, পরার্থে আত্মোৎসর্গ করতে বা স্বদেশকে ভালবাসতে শেখায়নি। বর্তমানে যে শিল্প-প্রধান সভ্যতার যুগে আমরা বাস করছি, সে যুগের উপযুক্ত ছাত্র ও বর্তমান পরীক্ষা-সর্বস্ব শিক্ষা ব্যবস্থায় তৈরী হচ্ছে না। এ অবস্থায় আমরা কি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার দিনটি পর্যন্ত শুধু করজোড়ে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকব? এ সব প্রশ্ন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং এগুলির উত্তরের জন্য অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষা করার উপায় নেই।"[54]

যে সময় ঢাকা শহরে ভারতের প্রথম আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ চলছে, সে সময় সতীশচন্দ্র তাঁর পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখলেন—'**An improved type of teaching university for India: Points for Consideration**'—এই শিরোনামে।

এ প্রবন্ধে তিনি বলছেন ছাত্রের পক্ষে ডিগ্রিলাভ এবং শিক্ষকের সেই ডিগ্রিলাভে ছাত্রকে সহায়তা করা—এই দ্বিবিধ প্রক্রিয়ার ফলে বিশ্ববিদ্যালয় মুখ্যতঃ একটা ডিগ্রি দেবার যন্ত্রে পরিণত হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য হওয়া উচিত সমাজে উন্নততর জীবন ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম, পাঠন পদ্ধতি প্রভৃতি-সবকিছু অতিক্রম করে ডিগ্রির প্রাধান্য থাকায়, সে লক্ষ্য নিদারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

জ্ঞানচর্চা অবহেলা করে ডিগ্রিলাভকে প্রাধান্য দেওয়ার ফলে ওদেশের প্রখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় অক্সফোর্ডের যে অধঃপতন ঘটেছে সে সম্পর্কে সতীশচন্দ্র অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের অভিমত উদ্ধৃত করেছেন। ম্যাক্সমুলার লিখছেন—**Youngmen imagine that all their work has but one object—to enable them to pass the examination. *** The required number of pages is got up under compulsion, therefore grudgingly, and after the examination is over, what has been got up is got rid of again,**

like a heavy and useless burden. The only thing that seems to remain is an intellectual nausea-a dislike of the food swallowed under compulsion. The mischief done is, I believe, most serious. It will poison the best blood of England if it has not done so already. England is losing its intellectual athletcs who were head and shoulders taller than the rest and used to be looked upon as leaders of Men.[৪৬]

অর্থাৎ ছাত্ররা মনে করে লেখাপড়ার ব্যাপারে তাদের একটাই উদ্দেশ্য পরীক্ষায় পাশ করা। *** পরীক্ষা পাশের জন্য পাঠ্য পুস্তকের প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠাগুলি ক্ষোভের সঙ্গে বাধ্য হয়ে এরা মুখস্থ করে এবং পরীক্ষান্তে সে বিদ্যা অপ্রয়োজনীয় বোধে ঝেড়ে ফেলে দেয়। ছাত্রচিত্তে অবশিষ্ট থাকে ঐ বিদ্যা সম্পর্কে একটা বিবমিষা, যে খাদ্য অনিচ্ছায় গলাধঃকরণ করতে বাধ্য হয়েছে, তার জন্য একটা বিরাগ বা বীতস্পৃহা। এ ভাবে যে ক্ষতি হচ্ছে তা মারাত্মক। এতে ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান ছেলেরাও নষ্ট হয়ে যাবে, হয়তো অনেকে নষ্ট হয়ে গেছে। এর ফলে ইতিপূর্বে ইংল্যাণ্ডে বুদ্ধিদীপ্ত যে সব বড়ো মানুষ তৈরী হত, যারা অন্য সবার চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে, যাদের সবাই নেতৃস্থানীয় বলে গণ্য করত, সে ধরণের বড়ো মানুষ আর তৈরী হচ্ছে না।'

সতীশচন্দ্র বলছেন শিক্ষাদানরত বিশ্ববিদ্যালয়েও ডিগ্রির প্রাধান্য থাকলে সমগ্র দেশ ও জাতি এই রকম মারাত্মক ভাবে বঞ্চিত হবে। কিন্তু যেহেতু ডিগ্রির প্রতিকল্প কিছু সহসা স্থির করা সম্ভব নয়, সেজন্য অন্ততঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে সত্যিকারের জ্ঞানচর্চাকে ডিগ্রিলাভ প্রণোদিত অধ্যয়ন থেকে পৃথক করতে হবে। এ প্রবন্ধে তিনি দু'রকম ছাত্রের কথা বলেছেন। একদল বিশ্বদ্যািলয়ে পড়তে আসে শুধু ডিগ্রি লাভের জন্য। ডিগ্রিকে তারা একটা ক্রয় বিক্রয় যোগ্য সামগ্রী বলে মনে করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা এরাই ব্যর্থ করে দেয়।

আর একদল ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে তাদের বৌদ্ধিক দূরদৃষ্টি বৃদ্ধির জন্য, তাদের দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারিত করার জন্য, তাদের মস্তিষ্কের সৃজনকারী শক্তিগুলির বৃদ্ধির জন্য।

সতীশচন্দ্র বলছেন এ'দুদল ছাত্রের পৃথকীকরণ প্রয়োজন। উচ্চতর আদর্শে অনুপ্রাণিত ছাত্রদের জন্য অধ্যাপনাও উচ্চতর লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত হবে;

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত কাঠামোর ভেতরে এদের জন্য উন্নততর শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এটা সম্ভব হলে শুধু ডিগ্রিলাভের জন্ম যে-সব ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছে, জ্ঞানার্জনের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গীও ক্রমশঃ পরিবর্তিত হবে, ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা ধীরে ধীরে উন্নীত হবে।

সতীশচন্দ্র তাঁর আধ্যাত্মিক গুরুর নির্দেশে এদেশের ছাত্রদের জন্ম উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁর চিন্তা ও কাজ শুরু করেছিলেন। তাঁর 'ডন পত্রিকা' 'ডন সোসাইটি'—দুইই এই উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত। ভারতীয় ছাত্রের শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর ভাবনাকে তিনি প্রথম বাস্তবরূপ দিলেন 'ভাগবত চতুষ্পাঠী' প্রতিষ্ঠা করে। তারপর তাঁর চিন্তা যখন প্রকৃত বাস্তবমুখী ও ব্যবহারোপযোগী হল তখন প্রতিষ্ঠা করলেন 'ডন সোসাইটি'।

ডন সোসাইটির অন্যতম কাজ ছিল ভারতবাসীর কাছে প্রাচীন ও বর্তমান ভারতের পূর্ণ স্বরূপটি উন্মোচন করা। এই উন্মোচনের মধ্যেই ছিল স্বদেশী আন্দোলনের বীজ, এই উদঘাটনের মধ্যেই জাতীয় শিক্ষাপর্ষদের কর্মকর্তারা খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁদের শিক্ষাচিন্তার মূলসূত্র। ঠিক এই কারণেই বলা যায় যে জাতীয় শিক্ষাচিন্তা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত।

সতীশচন্দ্র তাঁর ডন সোসাইটির চিন্তা ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে ভারতে জাতীয় শিক্ষার একটি সার্থক সংজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সে সংজ্ঞা অনুসারে জাতীয় শিক্ষার মূল থাকবে দেশের মাটিতে, সে শিক্ষা দেশের শ্রেষ্ঠ অতীত ঐতিহ্য সম্পর্কে হবে শ্রদ্ধাশীল এবং বর্তমান যুগের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে হবে সচেতন। অল্পকথায় ভারতে জাতীয় শিক্ষা ভারতের সমাজমূলের সঙ্গে সংস্কৃতির সমন্বয় সাধন করেই সার্থক হতে পারে। শিক্ষাচিন্তা ও শিক্ষা প্রচেষ্টায় সতীশচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য মিল লক্ষ্য করা যায়। সতীশচন্দ্র ত্রিশ বছর বয়সে প্রাচীন ভারতের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন 'ভাগবত চতুষ্পাঠী'। রবীন্দ্রনাথও চল্লিশ বছর বয়সে তপোবন শিক্ষার আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন 'শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম।' তারপর উভয়ের শিক্ষাচিন্তাই বিবর্তিত ও পরিপক্ব হয়ে যে রূপ নিয়েছিল তার প্রধান কথাই হচ্ছে ভারতীয় সমাজমূলের সঙ্গে সংস্কৃতির অন্বয় এবং তৎসহ বর্তমান যুগের প্রয়োজন সম্পর্কে সক্রিয় সচেতনতা।

কিন্তু শিক্ষার গ্রামকেন্দ্রিকরূপ এবং সেই অনুযায়ী শিক্ষার সাম্যব্যবস্থা-

এককথায়, নিরক্ষর গ্রামবাসীদের সাক্ষর করা এবং তাদের উৎপাদন উদ্যম ও পদ্ধতিকে সংঘবদ্ধ করায় রবীন্দ্রনাথের যে সচেষ্ট ভূমিকা লক্ষ্য করি, সতীশচন্দ্রের শিক্ষাচিন্তা ও প্রচেষ্টায় তার অভাব লক্ষ্য করা যায়। জাতির শিক্ষা ও উন্নতিতে গ্রাম এবং নগরের পারস্পরিক সাম্য সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য রবীন্দ্রনাথের একটি চিন্তাশীল ও সচেষ্ট ভূমিকা ছিল। সতীশচন্দ্র তাঁর অনুচরদের নিয়ে যে কর্মসূচী আরম্ভ করেন, সেটির কার্যসীমা নগরের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। সেই জন্যই তাঁর নাগরিক শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই জাতীয়তায় জাতীয় উদ্বুদ্ধ, শিক্ষার প্রয়োজনে অনুপ্রাণিত এবং ভারত-গবেষণায় অগ্রণী হলেও কেউই ক্ষেত্র চর্চায় বা স্থানিক তথ্যানুশীলনে লিপ্ত হননি, কেউই ফিল্ড ওয়ার্কার তৈরী হননি।

রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম

১৯০১ সনে (৭ই পৌষ, ১৩০৮) মহর্ষির প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন আশ্রমে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপন করলেন। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেরই অন্তরে আছে ভাব, বাইরে রূপ। রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ভাবের দিক থেকে আশ্রম, রূপের দিক থেকে বিদ্যালয়। এই ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠা 'নৈবেদ্য' রচনা ও 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনার সমকালীন। নৈবেদ্যর কবিতার মধ্যে এবং বঙ্গদর্শনের প্রবন্ধ সমূহে রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতের যে গৌরবোজ্জ্বল চিত্র এঁকেছেন, চতুরাশ্রম সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করেছেন তারই প্রতিফলন হয়েছে নানাভাবে তাঁর নবপ্রতিষ্ঠিত আশ্রম বিদ্যালয়ে।

এ সময় রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতের চতুরাশ্রমের মধ্যে মানুষের জীবনযাত্রার সর্বোত্তম আদর্শ আবিষ্কার করে মুগ্ধ হয়ে আছেন এবং সেই জীবন-চর্চাকে বর্তমানের বুকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ব্যাকুল হয়েছেন।

১৩০৮ সালের আশ্বিন মাসে কবি ইংলণ্ড প্রবাসী জগদীশচন্দ্রকে লিখছেন—

"...পূর্বেই লিখিয়াছি এখানে বোর্ডিং বিদ্যালয় স্থাপনের আয়োজন করিয়াছি। পৌষ মাস হইতে খোলা হইবে। গুটি দশেক ছেলেকে আমাদের ভারতবর্ষের নির্মল শুচি আদর্শে মানুষ করিবার চেষ্টায় আছি।[৫৩]

১৩০৮ সালের চৈত্রমাসে ত্রিপুরার মহারাজকুমার ব্রজেন্দ্র কিশোর দেব-মাণিক্যকে কবি লিখছেন, 'আমি ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মচর্যের প্রাচীন আদর্শে

আমার ছাত্রদিগকে নিরুদ্বেগে পবিত্র নির্মলভাবে মানুষ করিয়া তুলিতে চাই—তাহাদিগকে সর্বপ্রকার বিলাতী বিলাস ও বিলাতের অন্ধমোহ হইতে দূরে রাখিয়া ভারতবর্ষের গ্লানিহীন পবিত্র দারিদ্র্যে দীক্ষিত করিতে চাই।··· বিদেশী ম্লেচ্ছতাকে বরণ করা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়ঃ। ইহা হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিও।" স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহ।[67]

ব্রহ্ম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দশ বছর পরে ১৩১৮ সনের শান্তিনিকেতনের বার্ষিক সভায় পঠিত প্রবন্ধে আশ্রমিক অজিত কুমার চক্রবর্তী ব্রহ্মবিদ্যালয়ের অন্তর-বাহিরের খবর বিস্তারিতভাবে পরিবেশন করেছেন: 'তাঁহার (রবীন্দ্রনাথের) মনে হইল যে, ভারতবর্ষের প্রাচীন চতুরাশ্রমের আদর্শের মতো জীবন-যাত্রার এমন, পূর্ণাদর্শ আর হইতেই-পারে না। এ আদর্শে জীবনকে ধর্মলাভের উপায় স্বরূপ করিয়া তোলা যায়। বাল্যে গুরুগৃহবাস ও ব্রহ্মচর্য পালনের দ্বারা জীবনের সুর বাঁধা, সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে একাত্মভাবে মিলিয়া বাড়িয়া উঠা, সমস্ত জিনিসকে সেই বড় দিক হইতে, আনন্দের দিক হইতে, দেখিতে শিক্ষা করা, যৌবনে সংসারে প্রবেশ ও মঙ্গল সাধন, বার্ধক্যে শরীরের ও মনের শক্তি শিথিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংসার ধর্মকে ধীরে ধীরে মোচন করিয়া অধ্যাত্মলোকের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হওয়া, বনবাস ও শিক্ষাদান, তাহার পর মৃত্যুর সময় একাকী পরলোক প্রয়াণ—শিক্ষাকে, সংসারকে, বিষয়ভোগকে এমন মুক্তির সোপান করিয়া তোলার মত আদর্শ আর কোথায়। সুতরাং ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন করিয়া সেইখানে বানপ্রস্থ জীবন যাপনের আকাঙ্ক্ষা প্রৌঢ় বয়সে কবিকে পাইয়া বসিল। আদর্শ কেবল কল্পনায় নয়, প্রত্যক্ষ অনুষ্ঠানের মধ্যে দেখিতে তিনি উৎসুক হইলেন।

বিদ্যালয় আরম্ভ হইল। উপাধ্যায় মহাশয়ই ছাত্র ও অধ্যাপক জুটাইয়া আনিলেন। ছাত্রদের নিকট হইতে বেতন গ্রহণ করা হইত না। অধিক বয়সের ছাত্র লওয়া হইবে না, এই নিয়ম গোড়া হইতেই প্রবর্তিত হইল। ছাত্ররা নগ্নপদ হইল, উপানৎ এবং ছত্র ধারণ দুইই তাহারা বর্জন করিল। প্রাতঃসন্ধ্যা এবং সায়ং সন্ধ্যায় তাহাদিগকে চেলি পরিয়া উপাসনায় বসিতে হইত। তাহাদিগকে গায়ত্রী মন্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া ধ্যানের জন্য দেওয়া হইত। রন্ধন ব্যতিরেকে অন্য সমস্ত কাজ তাহাদিগকে নিজের হাতে করিতে হইত। প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া পুষ্করিণীতে তাহারা স্নানার্থ গমন

করিত। তারপর শুচিস্নাত হইয়া উপাসনান্তে এখনকার ল্যাবরেটরী গৃহে বা মুক্ত প্রাঙ্গনে বেদগান করিত। সকল ছাত্র ও অধ্যাপক এই সময় মিলিত হইতেন। উপাসনান্তে ছাত্ররা অধ্যাপকগণের পদধূলি লইয়া উপবেশন করিত। ইংরেজী, বাংলা, অঙ্ক, সংস্কৃত, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান সমস্তই শিক্ষা দেওয়া হইত।

এইরূপে তপোবন বসিল। পড়াশুনা আরাম ও সুখভোগকে খর্ব করিয়া সরল জীবনযাত্রা, গুরুসেবা, অতিথিসেবা, এই সমস্ত পূর্বকালের আশ্রমভাবে ছেলেরা বর্ধিত হইতে লাগিল।[৫৪]

বাংলাদেশে ধর্ম সংস্কৃতির নিদারুণ দুর্যোগের দিনে 'তত্ত্ববোধিনী' পাঠশালা স্থাপন করে দেবেন্দ্রনাথ প্রকৃত প্রস্তাবে প্রথম জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। সে বিদ্যালয় দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে নি। বহু বৎসর পর রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে যেন ঐ তত্ত্ববোধিনী পাঠশালাই পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করলেন। বাঙ্গালীর উন্মার্গ যাত্রার দিনে দেবেন্দ্রনাথের যে পাঠশালা অবলুপ্ত হয়েছিল, তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা প্রত্যক্ষ করবার জন্য দেবেন্দ্রনাথের স্বভাবতই একটা ব্যাকুলতা ছিল। বাংলা ১৩০৮ সালের ১লা অগ্রাণ রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরার মহিমঠাকুরকে প্রস্তাবিত ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপন সম্পর্কে যে পত্র লিখেছিলেন, তাতে লিখছেন,—'এই কাজটিকে (ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপন) তিনি (মহর্ষি) তাঁর জীবনের শেষ কাজ রূপে দেখিয়া যাইতে চান।'[৫৫]

১৮৮৩—১৮৯৩ পর্যন্ত যুবক রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তায় যে কথাটি মুখ্য ও মুখর তা হচ্ছে বাঙালীর শিক্ষা সার্থক হতে হলে তাকে সর্ববিদ্যা মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে অর্জন করতে হবে, তাকে বাংলা সাহিত্যের চর্চা করতে হবে।

১৯০১ সনে রবীন্দ্রনাথ যখন ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করছেন তখন তাঁর বয়স চল্লিশ। পিতার কাছে উপনিষদের দীক্ষা তাঁর হয়েছে; রামায়ণ, মহাভারত, কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতি ভারতীয় মহাকবির কাব্য ও নাটকে তাঁর চিত্ত ও চিন্তা পুষ্টি লাভ করেছে। এদিকে বিবেকানন্দ ১৮৯৩ তে চিকাগো ধর্মমহাসভায় বিশ্বজয় করে ফিরে এসে উন্মার্গযাত্রী ভারতবর্ষকে ভারতীয় আধ্যাত্মিকতায় নতুন করে দীক্ষা দিয়েছেন। বক্তৃতায় প্রবন্ধে, চিঠিপত্রে তিনি উপনিষদ ও গীতার ভাবনা, সনাতন ভারতের শিক্ষা-ভাবনা

সবকিছু ভারতবাসীর কাছে যথাসাধ্য প্রচার করেছেন। প্রৌঢ় রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ব্রাহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আগে এ সমস্ত শক্তিই নিভৃতে কাজ করেছে। প্রাচীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি যা জেনেছেন এবং ভারতবর্ষের চতুরাশ্রমের মধ্যে যে মাহাত্ম্য তিনি আবিষ্কার করেছেন, তার ফলে প্রাচীন ভারতের তপোবন-ভিত্তিক জীবন সাধনা তাঁকে বিপুলভাবে আকৃষ্ট করেছে। এই জীবন সাধনাকে বিংশ শতাব্দীর সুরুতে বাস্তব রূপায়ণের চেষ্টা করেছেন তিনি ব্রাহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। চিন্তাশীল ভারতীয়দের মধ্যে তখন আত্মবিস্মৃত ভারতবর্ষকে শুদ্ধ ভারতীয়তায় পুনঃ প্রতিষ্ঠার সংকল্প জাগছে। এই ধরণের এক সংকল্পের বশেই রবীন্দ্রনাথ কতিপয় ছাত্র নিয়ে শান্তিনিকেতন ব্রাহ্মবিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন।

এই ব্রাহ্মচর্যাশ্রম সম্পর্কে ইংরেজ শিক্ষাবিদ আর্থার মেহিউর অভিমতটিও প্রণিধানযোগ্য। ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে জীবিকার্জনের সম্পর্কই মুখ্য ছিল এবং এশিক্ষায় দেশের শিক্ষার্থীদের স্বদেশের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার কোন সুযোগ ছিল না। মেহিউর তাঁর 'এডুকেশন অব ইণ্ডিয়া' গ্রন্থে বলেছেন—'**The moral progress of a nation cut off from and ignorant of its cultural and spiritual antecedents, is inconceivable**'.[60] এবং এই প্রসঙ্গে তিনি বললেন—**It is reassuring to note that this side of school life is fully and effectively recognised in Rabindranath Tagore's institution at Bolepur, which is outside our system and represents an attempt to give fuller play than our system permits to Indian sentiments and aspirations.**[61]

অর্থাৎ এটা তৃপ্তির কথা যে স্কুল জীবনের এদিকটা (নৈতিক উন্নতির দিকটা) পুরোপুরি এবং সার্থকভাবে স্বীকৃত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের বোলপুরস্থিত আশ্রম বিদ্যালয়ে। এ বিদ্যালয় এদেশের ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলি থেকে ভিন্ন এবং এখানে আশ্রমিকদের চিত্তে ভারতীয় ভাবধারা ও আশা আকাঙ্ক্ষা বিকশিত করে তোলবার প্রচেষ্টা চলছে।

জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ

১৮৯৮ সনে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিয়োগ করে নিয়মিত

অধ্যাপনা প্রথা প্রবর্তিত হয়েছিল। তারই অনুসরণে ভারত সরকার ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পুনর্গঠনের পরিকল্পনা করলেন।

সিমলায় একটি শিক্ষা সম্মেলনের আয়োজন হয়েছিল ১৯০১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে। লর্ড কার্জন সে সভায় পৌরোহিত্য করেছিলেন। এর পরেই ১৯০২ সনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সংস্কারের উদ্দেশ্যে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়-কমিশন নিযুক্ত হল।

এই ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়-কমিশনে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন একমাত্র হিন্দু সদস্য। তিনি কমিশনের সঙ্গে অনেক বিষয়েই একমত হতে পারেননি। তিনি তাঁর মতানৈক্য জানিয়েছিলেন তাঁর বিখ্যাত 'নোট অব্ ডিসেণ্ট' এ। দীর্ঘ আলোচনার শেষে গুরুদাস বলছেন—'আমার পণ্ডিত সহকর্মীগণ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মান এবং কলেজগুলির শৃঙ্খলা উন্নত করতে চেয়েছেন এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে-সব সংস্কার সুপারিশ করেছেন তার ফলে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সরকার এবং কতিপয় শিক্ষাবিদের কর্তৃত্বাধীন হয়ে পড়বে, শিক্ষা ব্যাপারে জনগণের প্রতিনিধিত্ব হ্রাস পাবে, যে-সব স্কুল কলেজের সাজসরঞ্জাম, পাঠন-ব্যবস্থা পুরোপুরি সন্তোষজনক নয় সেগুলিকে শিক্ষাদান থেকে এবং সাধারণ বুদ্ধি দরিদ্র ছাত্রদের জ্ঞানার্জন থেকে প্রতিনিবৃত্ত করা হবে। অল্পকথায়, শিক্ষাবিষয়ে উচ্চতার আকাঙ্খায় বিস্তার বা ব্যাপ্তি খর্ব করা হবে **(To sacrifice surface in order to secure height)**. শিক্ষার মান উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে শৃঙ্খলারক্ষার মূল্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থেকেও আমি ভেবেছি শিক্ষা সমস্যার যে সমাধান দেওয়া হয়েছে, তা নেহাৎ আংশিক। কারণ, আমাদের শুধু শিক্ষার মান উন্নয়ন নয়, শিক্ষা বিস্তারের কথাও ভাবতে হবে।

আমার পণ্ডিত সহকর্মীদের থেকে কয়েকটি বিষয়ে আমি ভিন্নমত পোষণ করছি, কারণ আমি চাই শিক্ষাব্যবস্থা এমন হোক্ যাতে মুষ্টিমেয় প্রতিভাধর ছাত্রের উচ্চতম শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সাধারণ বুদ্ধি আগ্রহশীল শিক্ষার্থীরাও উচ্চশিক্ষার সুযোগ পায়।[৩৯]

বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের রিপোর্ট এবং তৎসহ স্যর গুরুদাসের 'নোট্ অব ডিসেণ্ট' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে তুমুল আন্দোলন সুরু হল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বেঙ্গলী' মতিলাল ঘোষের 'অমৃত বাজার পত্রিকা', রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন', সতীশচন্দ্র

মুখোপাধ্যায়ের 'ডন' এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রবাসী' তে কমিশনের 'রিপোর্ট' সম্পর্কে বাঙালী জাতির তীব্র প্রতিবাদ প্রকাশিত হল।

লর্ড কার্জন বিরুদ্ধ সমালোচনায় কান দিলেন না। ১৯০৪ সালের ২১শে মার্চ 'ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন' পাস হল। শাসক হিসাবে লর্ড কার্জন এদেশে যে নীতি অনুসরণ করেছিলেন তাতে ভারতের, বিশেষ করে বাংলার শিক্ষিত সমাজ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিল। তাছাড়া বাংলার নিজস্ব ক্ষোভের কারণ ছিল, বঙ্গদেশের অঙ্গচ্ছেদের আয়োজন কার্জন করেছিলেন। কার্জনের এই মর্মান্তিক দুরভিসন্ধির বিরুদ্ধে কংগ্রেস ১৯০৩ ও ১৯০৪ সনে প্রস্তাবও গ্রহণ করেছিল। এই রকম একটা উত্তেজনা তপ্ত পরিস্থিতিতে যখন বিশ্ববিদ্যালয় আইন 'পাশ' হল, তখন এ আইনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশই তীব্রতম প্রতিবাদ জানাল। কার্জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ হল যে, এ আইন দিয়ে সরকার দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে কুক্ষিগত করতে চান, উচ্চশিক্ষার অগ্রগতি রোধ করতে চান।

ইতিপূর্বে হাণ্টার কমিশন শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগকে উৎসাহিত করেছিলেন, ফলে দেশে অসংখ্য উচ্চ বিদ্যালয়, কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় আইন যখন সুব্যবস্থা বা সুপরিচালনার অভাবের অজুহাতে দেশে উচ্চশিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত করতে চাইল, তখন বাঙালীর উত্তেজনা চরমে পৌঁছাল।

শিক্ষা নিয়ে দেশের এ উত্তপ্ত পরিস্থিতির কোন স্বীকৃতি রাজনীতি ক্ষেত্রে সরকার দিলেন না, বিলেতে ভারত সচিব নির্দ্বিধায় বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন (২০ জুলাই, ১৯০৫)।

বঙ্গভঙ্গের কথা প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গভূমি উত্তেজনায় উদ্বেল হয়ে উঠল। ফলে যে আন্দোলন সুরু হল বাংলার ইতিহাসে তার তুলনা নাই। বাঙালী বুদ্ধিজীবিরা বিলাতি বর্জন ও স্বদেশী আন্দোলন সুরু করলেন। কৃষ্ণকুমার মিত্রের 'সঞ্জীবনী' সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বেঙ্গলী' এবং কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের 'হিতবাদী' এই আন্দোলনকে বিপুলভাবে উৎসাহিত করতে লাগলেন।

রবীন্দ্রনাথ নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে লিখলেন 'বাহিরের কিছুতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবে, একথা আমরা কোন মতেই স্বীকার করিব না। কৃত্রিম বিচ্ছেদ যখন মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইবে তখনই আমরা সচেতনভাবে

অনুভব করিব যে বাংলার পূর্বপশ্চিমকে চিরকাল একই জাহ্নবী তাঁহার বহু বাহুপাশে বাঁধিয়াছেন, একই ব্রহ্মপুত্র তাঁহার প্রসারিত আলিঙ্গনে গ্রহণ করিয়াছেন। এই পূর্ব পশ্চিম হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণবাম অংশের ন্যায়, একই পুরাতন রক্তস্রোত সমস্ত বঙ্গদেশের শিরায় উপশিরায় প্রাণবিধান করিয়া আসিয়াছে।'[৬৪]

৭ই আগষ্ট ১৯০৫ তারিখে কাশীমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কলকাতা টাউন হলে এক বিরাট জনসভার মফঃস্বলের বিলাতী বর্জনের আন্দোলনকে পূর্ণসমর্থন করে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বক্তৃতায়, প্রবন্ধে ও গানে বিলাতী বর্জন ও স্বদেশী গ্রহণের কথা সর্বত্র প্রচারিত হতে লাগল। সরকার ঘোষণা করলেন ১৯০৫, ১৬ই অক্টোবর বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ কার্য সমাধা হবে। অমনি দিকে দিকে এই দিনটিতে ক্ষোভ ও দুঃখের প্রতীক করে তোলবার জন্য নেতৃবর্গ আয়োজন শুরু করলেন। এই দিনটিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উভয়বঙ্গের মিলনের চিহ্নস্বরূপ 'রাখীবন্ধন' ও রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী ক্ষোভ প্রকাশের জন্য 'অরন্ধন' পালন করবার প্রস্তাব করলেন। প্রস্তাব সাগ্রহে গৃহীত হল। 'রাখীবন্ধনের' মিলন মন্ত্র রবীন্দ্রনাথ-রচিত রাখীসংগীতে সহস্র কণ্ঠে গীত হল।

বঙ্গভঙ্গ কেন্দ্র করে যে স্বদেশী আন্দোলন ও বিদেশী বর্জন শুরু হল, বাংলার সাধারণ মানুষের সঙ্গে ছাত্রসমাজও সে-আন্দোলনে যোগ দিল। ভারতের মধ্যে বঙ্গদেশেই ছাত্রছাত্রীরা এই প্রথম প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অবতীর্ণ হল। স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ স্বাভাবিকভাবে শিক্ষাক্ষেত্রেও এসে লাগল। বাংলার ছাত্রসমাজ স্বদেশী শিক্ষার দাবীতে সোচ্চার হয়ে উঠল।

স্মরণ করা প্রয়োজন যে ইতিপূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ সমগ্রভাবে স্বদেশী শিক্ষার কথা সমগ্র দেশবাসীকে বলেছেন (১৮৯৭ ও তৎপরে), এবং রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন ১৯০১ সনে।

এঁদেরও আগে বঙ্কিমচন্দ্র, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদার 'সোসাইটি ফর্ দ্য হায়ার্ ট্রেনিং অব্ ইয়ং মেন্' (১৮৯১) এবং সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও রমেশ চন্দ্র মিত্র ভাগবত চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করেছেন (১৮৯৫)। ক্ষুদ্রহোক, বৃহৎ হোক এঁদের চিন্তা বা প্রচেষ্টা দেশবাসীর মধ্যে আশানুরূপ সঞ্চারিত হয়নি। ১৯০৫এ স্বদেশী শিক্ষার দাবী এসেছে বাংলার

ছাত্রসমাজ থেকে এবং সে দাবী পূরণের জন্য সারা বাংলার নেতৃস্থানীয়দের উৎকন্ঠিত ও তৎপর হতে হয়েছে।

১৯০৫ সনের ১০ই অক্টোবর স্বদেশী শিক্ষাসংক্রান্ত উত্তেজনাতে বাংলা সরকার প্রত্যক্ষভাবে ইন্ধন যোগালেন। ঐ তারিখে বাংলা সরকারের অস্থায়ী মুখ্য সচিব আর ডব্লিউ. কার্লাইল্‌ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটদের কাছে একটি গোপন সার্কুলার' পাঠালেন। এই গোপন 'সার্কুলারের' ভিত্তিতে কোনো কোনো জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মফঃস্বলের স্কুল কলেজের অধ্যক্ষদের কাছে একটি বিশেষ সরকারী নির্দেশ পাঠালেন।

কার্লাইল সাহেব তাঁর পরোয়ানায় জানালেন—(১) রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সম্প্রতি ছাত্রগণকে যে সকল কার্যে নিযুক্ত করা হইতেছে, তাহাতে শিক্ষা ও শাসননীতি একেবারে বিপর্যস্ত হইতেছে। ইহা ছাত্রগণের পক্ষে নিতান্ত অনিষ্টকর। গভর্ণমেণ্টের সাহায্য বা অনুগ্রহপ্রাপ্ত বিদ্যালয় সমূহে এইরূপ ব্যবহারের প্রশ্রয় দেওয়া যাইতে পারে না।

(২) অতএব আপনার অবগতি ও উপদেশের জন্য আমি জানাইতেছি যে, স্কুল ও কলেজের কর্তৃপক্ষগণ ছাত্রদিগকে যদি প্রকাশ্যভাবে রাজনৈতিক ব্যাপারে যোগদান হইতে নিবৃত্ত না করেন কিংবা তথাকথিত স্বদেশী আন্দোলন সংশ্লিষ্ট বিদেশীপণ্য বর্জন (boycotting), বিদেশীপণ্য ক্রয় বিক্রয়-নিবারণ (picketting) ইত্যাদি অপকার্য হইতে বিরত না রাখেন, তাহা হইলে উক্ত স্কুল ও কলেজসমূহ গর্ভণমেণ্টের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইবে; উহারা আর গর্ভণমেণ্টের বৃত্তিলাভার্থ প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে না; এতদ্ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়কে ঐ সকল স্কুল ও কলেজের সহিত সংস্রব ছেদ করিতে বলা হইবে। স্কুল ও কলেজের কর্তৃপক্ষ বাস্তবিক চেষ্টা করিয়াও যদি ছাত্রদিগকে নিবৃত্ত করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাহারা অবিলম্বে অবাধ্য ছাত্রদিগের নামের তালিকা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইবেন এবং উক্ত ছাত্রদিগের শাসনের নিমিত্ত তাঁহারা যে যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাও এই সঙ্গে উল্লেখ করিবেন।

(৩) আমি একথাও জানাইয়া রাখিতেছি যে, কোন স্কুল বা কলেজের ছাত্রদিগের দ্বারা গোলযোগের সম্ভাবনা আছে বলিয়া আশঙ্কার কারণ উপস্থিত হইলে, শান্তিরক্ষার্থ উক্ত স্কুল বা কলেজের শিক্ষক ও ম্যানেজার দিগকে স্পেশাল কনেষ্টবল নিযুক্ত করা হইবে। ইহাদিগের কার্য বিশেষ

ফলদায়ক ও মূল্যবান হইবে ; কারণ ছাত্ররা ইহাদিগকে মান্য করিতে বাধ্য এবং ইহারাও ছাত্রদিগকে সনাক্ত করিতে পারিবেন।**** [অনুবাদ 'ভাণ্ডার' সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত]

২২শে অক্টোবর ১৯০৫ (৫ই কার্তিক ১৩১২) জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটরা স্কুল কলেজের প্রধানদের কাছে যে বিশেষ সরকারী নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন,—তা 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় হুলুস্থুলু পড়ে গেল।

২৪শে অক্টোবর (৭ই কার্তিক, ১৩১২) শ্রীরসুলের সভাপতিত্বে 'ফিল্ড এণ্ড একাডেমী ভবনে' বিরাট সভা হয়। সেখানে স্থির হয় যে, স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে ছাত্রদের বিরত রাখবার যে সরকারী ষড়যন্ত্র তার একমাত্র প্রতিকার হচ্ছে দেশে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করে শিক্ষাকে স্বাধীন করা।

এই সভার তিনদিন পর কলকাতার পটলডাঙ্গা মল্লিক বাড়ীতে বিরাট ছাত্রসভা হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন—

"*** এই স্বদেশী আন্দোলন যে কৃত্রিম, সে কথা তো কেহ বলিতে পারিবে না। আজ যে ছাত্ররা উন্মত্ত, জনসাধারণ উত্তেজিত এবং বৃদ্ধেরাও উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছেন, ইহাতে স্পষ্টই মনে হয় যে, সকলে মিলিয়া দেশকে এক মহাসঙ্কট হইতে রক্ষা করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন।

* * * *

কর্তৃপক্ষের তাড়নায় ছাত্রগণ বেদনা বোধ করিয়া যে এতদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছেন, গভর্ণমেণ্টের চাকরি, গভর্ণমেণ্টের সম্মানের আশা বিসর্জন দিয়া স্বদেশী বিদ্যালয়ের অপেক্ষা করিতেছেন, ইহা অত্যন্ত শুভ লক্ষণ বলিতে হইবে। আমাদের সমাজ যদি নিজের বিদ্যাদানের ভার নিজে না গ্রহণ করেন, তবে একদিন ঠকিতেই হইবে।

* * * *

বাস্তবিক, বর্তমান প্রণালীর বিদ্যাশিক্ষা আমাদের পক্ষে কোন মতেই কল্যাণকর হইতে পারে না।

* * * *

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আমাদের অন্তঃকরণকে অস্থিমজ্জাকে একেবারে দাসত্ব অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। তাই আমাদের নিজেদের শিক্ষার

তার নিজেদের হাতে রাখিতেই হইবে। পূর্বে যখন দেশ ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, তখনও আমাদের সমাজ আপনাকে আপনি শিক্ষা দিয়াছে। আপনার ভিতরে তার প্রতিকূলতা জন্মায় নাই। আজ আমাদের অন্তঃকরণের সম্মুখে যে বৃহৎ প্রয়োজন জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহাকে সার্থক করিতে হইলে যাহাতে আমরা নিজেদের শিক্ষাকে স্বাধীন করিতে পারি, অধ্যবসায়ের সহিত, শান্তির সহিত, সাধনার সহিত আমাদিগকে তাহারই ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

এরপর উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ফিল্ড এণ্ড একাডেমি ভবনে দ্বিতীয় সভা ২রা নভেম্বর ১৯০৫ সনে (১৬ই কার্তিক ১৩১২)। এ সভায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিত চন্দ্র সেন, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন গুহ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রভৃতি বরেণ্য ব্যক্তিগণ যোগদান করেন। রবীন্দ্রনাথ এসভায় বলেন—'গভর্ণমেণ্ট যদি দুই দিন পরে এই পরওয়ানা প্রত্যাহারও করেন তবু যেন আমরা ইহার শিক্ষাটি ভুলিয়া না যাই। আমাদের শিক্ষাকে স্বাধীন করিবার জন্ত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিবার সময় এখন উপস্থিত হইয়াছে।'

৪ঠা নভেম্বর, ১৯০৫ (১৮ই কার্তিক, ১৩১২) সংবাদপত্রে প্রকাশিত হল যে রংপুরে 'জনসাধারণের ঘোষণাপত্র' পাঠ করবার জন্ম যে সভা হয়েছিল সে সভায় যোগদান এবং রাজপথে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি উচ্চারণের অপরাধে সেখানকার স্কুলের শতাধিক ছাত্রকে ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশে পাঁচ টাকা হিসাবে জরিমানা করা হয়েছে। কার্লাইল সার্কুলারের নির্দেশ মত স্বদেশ সেবার জন্ম ছাত্রদের এই প্রথম দণ্ড।

৪ঠা নভেম্বর কলকাতার গোলদীঘিতে ছাত্রদের এক বিরাট সভা হয়। সভায় বিভিন্ন কলেজের প্রায় পঁচিশ হাজার ছাত্র উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম. এ. বি. এল। ঐ সভায় সিটি কলেজের ছাত্র শচীন্দ্র প্রসাদ বসু এক প্রস্তাব করেন এবং প্রস্তাবটি সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। প্রস্তাবটি হচ্ছে—* * *

'কার্লাইল সার্কুলারে' আমাদের স্বদেশ সেবাব্রত হইতে বিরত থাকিতে বলা হইয়াছে; ইহা সম্ভব নয়। * * * কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটি গোলাম তৈরীর কারখানা। যে শিক্ষা আমাদের জাতীয় জীবন রক্ষা করিবার উপযোগী সেখানে সে শিক্ষা দেওয়া হয় না।

তাঁর এক জমিদার বন্ধু জাতীয় বিশ্ববিত্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হয়েছেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে সতীশচন্দ্র বলেন "*** বিশ্ববিত্যালয় স্থাপন করিতে হইলে আমাদের কি কি চাই? অর্থ চাই, শিক্ষক চাই, ছাত্র চাই। টাকার যোগাড় অনেকটা হইয়াছে। ***এদেশে অধ্যাপকেরও অভাব হইবে না। ছাত্রগণ, এখন আপনাদের কর্তব্য আপনারা করুন। আপনাদের প্রথম কর্তব্য সরকারী ও সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত কলেজ হইতে নাম তুলিয়া লইয়া স্বদেশী কলেজে ভর্তি হওয়া।" ***

এরপর উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ১১ই নভেম্বর তারিখ (২৫শে কার্তিক ১৩২২) গোলদীঘির বিরাট ছাত্রসভা। এ সভায় সভাপতিত্ব করেন আশুতোষ চৌধুরী।

গোলদীঘির সভায় ব্যারিস্টার আশুতোষ চৌধুরী ছাত্র আন্দোলনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ১৪ই নভেম্বর দেশের নেতৃবৃন্দের কাছে এক খোলা চিঠি দেন। এই চিঠির ফলেই বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলন প্রথম স্বীকৃতি পেল।

আশুতোষ তাঁর পত্রে লিখলেন—'বহুছাত্র দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করেছে যে এ বছর বিশ্ববিত্যালয়ের পরীক্ষায় ওরা বসবে না। কলকাতা বিশ্ববিত্যালয়ের ওরা সব সম্পর্ক ছিন্ন করে অন্য কোন জাতীয় কর্তৃত্বাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে চায়।

বর্তমান দেশে ঐ রকম কোন প্রতিষ্ঠান নেই এবং এই সব ছাত্র ও তাদের অনুবর্তীদের জন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করতে হলে, এখনই সে সম্পর্কে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন। আমরা বুঝতে পারিনি যে এ বিষয়ে ছাত্রদের মনোভাব এত তীব্র। গত শনিবার শ্রীহীরেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয়ের অনুরোধে ছাত্রদের এক সভায় উপস্থিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমি নিজে ছাত্রদের মনোভাবের এ তীব্রতা বুঝতে পারিনি, বা বিশ্বাস করতেও প্রস্তুত ছিলাম না।

উক্ত সভায় পাঁচ হাজারেরও বেশী ছাত্র সমবেত হয়েছিল এবং ঐ সভাতেই আমি প্রথম এ বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করলাম। এ বিষয়ে চিন্তা করে বর্তমান পরিস্থিতিতে কর্তব্য সুস্থির করতে আমি আপনাদের অনুরোধ করছি।

গত শনিবারই দেখলাম ছাত্ররা আগামী সোমবার, ১৩ই নভেম্বর, এ

সম্পর্কে চরম সিদ্ধান্ত নিতে চায়। ওদের সমস্যা নেতৃস্থানীয়দের গোচরে আনব এবং তাঁরা এ সম্পর্কে সহৃদয়ভাবে চিন্তা করবেন—এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমি ওদের নিবৃত্ত করেছি।

ছাত্ররা রবিবার দিন জানতে চেয়েছিল যে ওরা নেতাদের সহায়তার উপর নির্ভর করতে পারে কিনা এবং যদি নেতারা সাহায্য করতে সম্মত হন, তবে কত শীঘ্র তাঁরা এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।

আমি ওদের কাছে কিছু সময় চেয়েছি। কিন্তু ওরা ১৬ই নভেম্বর, বৃহস্পতিবার বৈকাল ৫টা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে সম্মত হয়েছে, তার বেশী নয়।

এ পরিস্থিতির মোকাবিলা করতেই হবে, নয়তো এর পরিণাম হবে শোচনীয়।'[৩৪]

৩০শে কার্তিক ১৬ই নভেম্বর ১৯০৫ এ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শিমূলতলা থেকে ফিরে এলেন। সহস্র সহস্র ছাত্র তাঁকে অভিনন্দন করে গোলদীঘিতে নিয়ে এল। গোলদীঘির পূর্বভাগে গাড়ির উপর দাঁড়িয়ে তিনি ছাত্রদের সম্বোধন করে বক্তৃতা করেন। ছাত্ররা সহস্রকণ্ঠে জানায় 'আমরা জাতীয় বিদ্যালয় চাই'। সুরেন্দ্রনাথ বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, 'আমি কোন দ্বিধা কোন সংশয় না করিয়া বলিতেছি যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মূলনীতি আমি সর্বান্তঃকরণে অনুমোদন করি। জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা আমাদের আন্দোলনেরই একটি অঙ্গ। আমাদের চিন্তা আমাদের মত, আমাদের বিদ্যাদানের ব্যবস্থা —সকল বিষয়ই আমাদিগকে স্বদেশী হইতে হইবে। আমাদের শিক্ষাকে গভর্ণমেন্টের হাত হইতে মুক্ত করিতে হইবে। আমাদের শিক্ষা আমাদের নিজেদের ব্যাপার, ইহার সহিত গভর্ণমেন্টের কোন সংস্রব থাকা উচিৎ নয়। গভর্ণমেন্ট এবং শিক্ষা এই দুইটি জিনিসকে স্বতন্ত্র রাখিতে হইবে। বিলাতেও গভর্ণমেন্টের সহিত শিক্ষার কোন সংস্রব নাই। ***জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতিরেকে জাতীয় জীবনের পরিপুষ্টি কিংবা বালকগণের প্রকৃতশিক্ষার ব্যবস্থা কিছুই সম্ভব নহে।'***

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে কর্তব্য স্থির করবার জন্য ৩০শে কার্তিক ১৩১২ (১৬ই নভেম্বর ১৯০৫) রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে ল্যাণ্ড হোল্ডারস্ অ্যাসোসিয়েসন ভবনে বাংলা দেশের নেতারা মিলিত হন। সভায় জগদীন্দ্র নারায়ণ রায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল; ডাঃ নীলরতন সরকার, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত,

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী, চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন।

এই সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি নেওয়া হয়—প্রথম প্রস্তাবে বলা হয় যে জাতীয়ভাবে এবং জাতীয় তত্ত্বাবধানে সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক এবং কারিগরী এই ত্রিবিধ শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য অবিলম্বে একটি জাতীয় শিক্ষাসমাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। এই সম্বন্ধে যথাকর্তব্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয় এবং কমিটিকে তিন সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করতে অনুরোধ করা হয়। কমিটির সভ্যগণের নামঃ—

স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাসবিহারী ঘোষ, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, তারকনাথ পালিত, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এ. রসুল, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী, চিত্তরঞ্জন দাস, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, মনোমোহন ভট্টাচার্য, প্রাণকৃষ্ণ আচার্য, বনোয়ারীলাল চৌধুরী, দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, মোহিনী মোহন চট্টোপাধ্যায়, নীলরতন সরকার এবং আশুতোষ চৌধুরী।

প্রস্তাবকঃ—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অনুমোদকঃ—তারকনাথ পালিত।

সমর্থকঃ—শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ।

দ্বিতীয় প্রস্তাবে প্রেমচাঁদ, রায়চাঁদ, এম.এ প্রভৃতি পরীক্ষায় যে সব পরীক্ষার্থী উপস্থিত হবেন না বলে স্থির করেছেন তাঁদের স্বদেশ প্রেমের জন্য প্রশংসা করা হয় এবং বলা হয় যে পরীক্ষায় উপস্থিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রস্তাবকঃ—স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

অনুমোদকঃ—রাসবিহারী ঘোষ।

তৃতীয় প্রস্তাবে শ্রীতারকনাথ পালিত, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, গণেশচন্দ্র চন্দ্র, কালীনাথ মিত্র এবং সুবোধচন্দ্র মল্লিক ধনভাণ্ডারের ট্রাষ্টি নিযুক্ত হলেন।

১৭ই নভেম্বর 'ফিল্ড এণ্ড একাডেমী'র মাঠে সপ্তম সভায় সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, জাতীয় শিক্ষাসভা প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করে ইংরেজীতে বক্তৃতা দেন। তিনি বলেন, 'নেতারা গতকালের (১৬।১১।১৯০৫)

মন্ত্রণা সভায় স্থির করেছেন যে অবিলম্বে একটি জাতীয় শিক্ষাসমাজ স্থাপন করা আবশ্যক। এই শিক্ষা সমাজ জাতীয় তত্ত্বাবধানে জাতীয়ভাবে সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী এই ত্রিবিধ শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন।'

এই সভায় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন, 'আমাদের এই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলন যখন আরম্ভ হয়, তখন কতলোক কত ভ্রূকুটি করিয়াছিলেন। ইহাকে অজ্ঞতা, অর্বাচীনতা, অকালপক্কতা-এই সকল অভিধায় অভিহিত করিয়াছিলেন, ফলে দেখিলাম আমাদের যাঁহারা নেতা, সমাজের যাঁহারা শীর্ষস্থানীয় তাঁহারা বিধাতার কৃপায়—কাহারো বক্তৃতায় নহে, প্ররোচনায় নহে, প্রলোভনে নহে,—কেবলমাত্র বিধাতার শুভ ইচ্ছায় স্থির করিলেন যে সমাজের এখন **'National education on national lines under national control'** প্রয়োজন হইয়াছে।

* * *

আমরা বুঝিয়াছি যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় যদি জাতির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে জাতিরই প্রতিষ্ঠা হয় না। তখন আর উহাকে জাতি বলা যায় না। সে একটা লোক সংঘ মাত্র। ***'

এরপর যথাক্রমে ২৪-শে ও ২৬-শে নভেম্বর (৮ই ও ১০ই অগ্রহায়ণ) এবং ৩রা ও ১০ই ডিসেম্বর (১৭ই ও ২৪শে অগ্রহায়ণ) ফিল্ড এণ্ড একাডেমীর মাঠে সভা হয়। ঐ ১০ই ডিসেম্বর (২৪শে অগ্রহায়ণ) ল্যাণ্ড হোল্ডারস্ অ্যাসোসিয়েসনের নেতৃবর্গের দ্বিতীয় মন্ত্রণা সভা হয়।

স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাসবিহারী ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারকনাথ পালিত, আশুতোষ চৌধুরী, নীলরতন সরকার, হেরম্ব মৈত্র, মনোমোহন ভট্টাচার্য, গিরিশচন্দ্র বসু প্রভৃতি ঐ মন্ত্রণাসভায় উপস্থিত ছিলেন।

তিন সপ্তাহ পূর্বে (১৬।১১।১৯০৫) জাতীয় শিক্ষাসমাজের বিষয় আলোচনা করবার জন্য যে প্রভিসনাল কমিটি গঠিত হয়েছিল, সভায় সেই কমিটির রিপোর্ট উপস্থিত করা হয়। সভায় স্থির হয় যে জাতীয় শিক্ষাসমাজের 'ড্রাফ্‌ট্ কনস্টিটিউসন্ এবং অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করবার জন্য তারকনাথ পালিত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নরেশচন্দ্র সেন, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, মনোমোহন ভট্টাচার্য, ব্রজেন্দ্রকিশোর এবং নীলরতন সরকারকে নিয়ে 'ওয়েজ অ্যাণ্ড মিন্‌স্ কমিটি' গঠিত হবে।

নীলরতন সরকার কমিটির সম্পাদক হবেন। দশদিন পরে কমিটি তাদের মন্তব্য উপস্থিত করবেন। ইতিমধ্যে অন্যান্য আলোচনা স্থগিত থাকবে।[৩৪]

১৯০৬ সনের ১১ই মার্চ বেঙ্গল ল্যাণ্ড হোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েসন গৃহে অনুষ্ঠিত সভায় 'ওয়েজ এণ্ড মিনস্' কমিটির রিপোর্ট আলোচনা হল। সভাপতি হলেন শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সে সভায় শ্রীঅরবিন্দ ঘোষও উপস্থিত ছিলেন। এ সভা দুটি প্রস্তাব গ্রহণ করলেন।

প্রথম প্রস্তাবে 'ওয়েজ এণ্ড মিন্‌স্ কমিটি' যে রিপোর্ট দাখিল করেছেন তা অনুমোদন করা হল এবং দ্বিতীয় প্রস্তাবে জাতীয় শিক্ষা পর্ষৎ-এর বিরানব্বই জন সদস্যের নামের তালিকা অনুমোদন করা হল।

জাতীয় শিক্ষা পর্ষদের সদস্য হিসাবে বাংলার তদানীন্তন সকল সুধী ও কৃতী সন্তানকেই গ্রহণ করা হয়েছিল।[৩৫]

বঙ্গদেশের সমসাময়িক সকল নেতাই উপলব্ধি করতেন ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার নানা ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতার কথা কিন্তু সকলেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে পুরোপুরি বর্জন করার পক্ষে ছিলেন না। যাঁদের মনোভাব এ ব্যাপারে অনমনীয় ছিল তাঁদের মধ্যে ছিলেন—গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, আশুতোষ চৌধুরী, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী প্রভৃতি। এঁরা চাইলেন শিক্ষা সম্পর্কে পুরোপুরি স্বাধীনতা, চাইলেন জাতির নিজের তত্ত্বাবধানে জাতীয় ভাবের সংগে সামঞ্জস্য রেখে সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং কারিগরী এই ত্রিবিধ শিক্ষার ব্যবস্থা।

এদিকে মধ্যপন্থীদের মধ্যে ছিলেন তারকনাথ পালিত, ভূপেন্দ্রনাথ বসু নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, নীলরতন সরকার, মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী এবং অন্যান্যরা। তাঁরা চাইলেন দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা অব্যাহত রেখে জাতীয় পরিচালনায় কেবলমাত্র কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করতে।

জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ প্রতিষ্ঠার সময় (১১ই মার্চ, ১৯০৬) এই নিয়ে মতবিরোধ এমন চরমে পৌছাল যে নেতারা দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে গেলেন। শ্রীতারকনাথ পালিত জাতীয় শিক্ষা পর্ষদের ত্রিধারা শিক্ষা ব্যবস্থায় মত দিলেন না। এমনকি, জাতীয় শিক্ষা পর্ষদের সদস্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে অসম্মত হলেন। ১৯০৬ সালের ১লা জুন যে দিন জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ রেজেষ্ট্রী হল, সেদিন তারকনাথ পালিত প্রতিষ্ঠা করলেন 'সোসাইটি ফর দি

প্রমোশন অব্ টেকনিক্যাল এডুকেশন' রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় দুটি প্রতিষ্ঠানেরই সভাপতি রইলেন। দেশের অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিও উভয় প্রতিষ্ঠানের সদস্য হলেন।

অতঃপর জাতীয় শিক্ষা পর্ষদের আনুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত হল 'বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ অ্যাণ্ড স্কুল' (১৪ই আগষ্ট ১৯০৬) এবং তারকনাথ পালিত প্রতিষ্ঠিত 'সোসাইটি ফর্ দি প্রোমোশন্ অব্ টেকনিক্যাল এডুকেশন' স্থাপন করলেন 'বেঙ্গল টেক্নিক্যাল ইন্স্টিটিউট।'

জাতীয় শিক্ষা পর্ষদের উদ্বোধন উৎসব অনুষ্ঠিত হল কলকাতার টাউন হলে ১৯০৬ সনের ১৫ই আগষ্ট বৈকালে। উদ্বোধন উৎসবে সভাপতি হলেন স্যার রাসবিহারী ঘোষ। সে অনুষ্ঠানে স্যার গুরুদাস জাতীয় শিক্ষা পর্ষদের উদ্দেশ্য এবং পাঠ্যক্রম সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনা করলেন। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বললেন :

(১) বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পর্ষৎ সাহিত্য, বিজ্ঞান কারিগরি এবং বিভিন্ন বৃত্তি বা জীবিকা সম্পর্কে শিক্ষার ব্যবস্থা করবে। এ শিক্ষা জাতীয় ধারা অনুসরণ করে চলবে। এর সর্বতোভাবে জাতীয় কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হবে। প্রচলিত প্রাথমিক বা কলেজীয় শিক্ষার সংগে এ শিক্ষার কোন বিরোধ থাকবে না কিন্তু স্বাতন্ত্র্য থাকবে। (**Not in opposition to, but standing apart from the existing system of Primary. Secondary and Collegiate education**).

এই শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাধান্য পাবে স্বদেশ সম্পর্কে জ্ঞান, স্বদেশের সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন সম্পর্কে জ্ঞান এবং এ শিক্ষার লক্ষ্য হবে প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ চিন্তা ও জীবনাদর্শের সঙ্গে পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রহণযোগ্য আদর্শের সমন্বয় সাধন।

(২) পর্ষদের শিক্ষা ব্যবস্থায় কলা ও বিজ্ঞানের সেই সব শাখাগুলির চর্চার প্রাধান্য দেওয়া হবে যে গুলি চর্চার ফলে দেশের বিভিন্ন সম্পদের উন্নয়ন সাধন সম্ভব হয়।

(৩) কতগুলি সর্তসাপেক্ষে সাম্প্রদায়িক ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে।

(৪) পঠন-পাঠনে প্রকৃত উচ্চমান বজায় রাখা হবে এবং আমাদের দেশে শৃঙ্খলা বলতে যা বুঝি তা কঠোরভাবে বজায় রাখা হবে।

(৫) সাধারণতঃ মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হবে এবং সেই উদ্দেশ্যে কলা ও বিজ্ঞান বিষয়ে প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক রচনার ব্যবস্থা

করা হবে।

(৬) সুপণ্ডিত, মহৎ চরিত্র অধ্যাপকগণকে নিয়োগ করা হবে এবং বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণারত অধ্যাপক ও ছাত্রগণকে বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করা হবে।

(৭) শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য সভা-সম্মেলনের আয়োজন করা হবে।[৩৪]

পর্ষদের পাঠ্যক্রমের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বললেন, পর্ষৎ তিন রকম পাঠ্যক্রম নির্ধারিত করেছেন :—

(১) প্রাথমিক পর্যায়ে তিন বছরের পাঠ্যক্রম। ছ'বছর বয়সের বালকগণ প্রাথমিক শ্রেণীতে পড়া সুরু করবে।

(২) সাত বছরের মাধ্যমিক পাঠ্যক্রম—ন'বছর বয়সে ছেলেরা মাধ্যমিক শ্রেণীর পাঠ শুরু করবে এবং পনেরো বছর বয়সে এ পাঠ সমাপ্ত হবে। মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঁচ বছরের পাঠ্যক্রম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেসন্ পাঠ্যক্রমের তুল্য হবে এবং সাত বছরেরর পাঠ্যক্রম ইণ্টারমিডিয়েট্ বা এফ্., এ শ্রেণীর পাঠ্যক্রমের তুল্য হবে।

(৩) সাহিত্য অথবা বিজ্ঞানের যে কোন একটি বিষয় ভিত্তি করে চার বছরের সাম্মানিক স্নাতক শ্রেণীর পাঠ্যক্রম তৈরী করা হবে এবং এই সাম্মানিক স্নাতক শ্রেণীতে একটি সম্পৃক্ত বিষয়ও পাঠ্য হবে।

প্রতিটি পাঠ্যক্রমের পঠন-পাঠনান্তে একটি প্রকাশ্য পরীক্ষা হবে। পরিকল্পনাটির আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বললেন যে এ পরিকল্পনায় শিক্ষার্থী প্রাথমিক পাঠ্যক্রমের পঠনান্তে (অর্থাৎ নয় বছর বয়সে) অথবা পাঁচবছরের মাধ্যমিক পাঠ্যক্রম শেষ করে (অর্থাৎ চৌদ্দ বছর বয়সে) অথবা সাত বছরের মাধ্যমিক পাঠ শেষ করে (অর্থাৎ ষোল বছর বয়সে) যথোপযুক্ত কারিগরী শ্রেণীতে যোগদান করতে পারবে।

এ পরিকল্পনায় কলেজীয় স্তরে একটিমাত্র বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জনের পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থায় সাম্মানিক শ্রেণীতেও অনেকগুলি বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করতে হয় বলে সাম্মানিক বিষয়টিতে আশানুরূপ পাণ্ডিত্য অর্জনের সুযোগ থাকে না। এ পরিকল্পনায় ছাত্রদের শরীর শিক্ষা, বুদ্ধির চর্চা, নীতিশিক্ষা এবং সর্তসাপেক্ষ ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা আছে। এই পাঠ্যক্রমে ছাত্রদের এমন শিক্ষার ব্যবস্থা

করা হয়েছে যার ফলে একদিকে যেমন উচ্চতম জাতীয় আদর্শানুসারে ছাত্রদের বৌদ্ধিক ও নৈতিক উন্নতি ঘটবে, অন্যদিকে তেমনি ছাত্ররা দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নতি সাধন করে দেশের সম্পদ বৃদ্ধির সহায়তা করতে পারবে।[৩৭]

জাতীয় শিক্ষাপরিষদের পাঠক্রমের বৈশিষ্ট্য

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ডন্ সোসাইটি যে আদর্শ প্রচার করছিল, জাতীয় শিক্ষাপর্ষৎ সেই আদর্শকেই বাস্তবরূপ দিতে চেয়েছিল। ইংরেজ প্রবর্তিত পাশ্চাত্য শিক্ষা যখন দেশবাসীকে স্বদেশবিমুখ করে তুলছিল তখন সতীশচন্দ্র চেয়েছিলেন ভারতীয় সংস্কৃতির সমাজভিত্তিক চর্চা এবং এই পথ ধরে তিনি যে লক্ষ্যে পৌছাতে চেয়েছিলেন সেটা তাঁরই ভাষায়—Quickening of national life of the people অর্থাৎ দেশবাসীর জাতীয় জীবন ত্বরান্বিত করা।

সতীশচন্দ্রের এই মহৎ আদর্শ পাঠক্রমে প্রতিফলিত হয়েছে। বাইরে থেকে বিচার করলে দেখা যাবে শিক্ষাপর্ষদের পাঠক্রম শ্রেষ্ঠ ভারতীয় ঐতিহ্য ও আদর্শানুসারে ছাত্রদের বৌদ্ধিক ও নৈতিক বিকাশে সহায়তা করতে চেয়েছে, দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করতে চেয়েছে' এবং সেই সঙ্গে আধুনিক জীবনের জন্য ছাত্রদের প্রস্তুত করতে চেয়েছে।

উপরোক্ত উদ্দেশ্যে যে সব বৈশিষ্ট্য পাঠ্যক্রমে আনতে হয়েছে নিচে সেগুলির বিবরণ দেওয়া হল:—

(১) বিদেশী ভাষা ইংরেজী পরিহার করে বাংলা, হিন্দী, উর্দু প্রভৃতি দেশীয় ভাষার মাধ্যমে নিম্নতম স্তর থেকে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করে পর্ষৎ শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ প্রক্রিয়াকে সহজ ও স্বাভাবিক করতে চেয়েছে।

(২) দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে ছাত্ররা যাতে দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করতে পারে সেজন্য প্রাথমিক স্তর থেকে পাঁচ বছরের মাধ্যমিক স্তর (অর্থাৎ ম্যাট্রিকুলেসন্) পর্যন্ত সাহিত্য ও বিজ্ঞান পাঠের সঙ্গে কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে।

(৩) আধুনিক জীবনের প্রয়োজনীয়তা স্মরণ করে সাহিত্য, ইতিহাস

প্রভৃতি মানবিক বিদ্যাচর্চার সঙ্গে সর্বস্তরে বিজ্ঞান পাঠের ব্যবস্থা করেছে।

(৪) ধর্ম ও নীতিশিক্ষার ব্যবস্থা করেছে।

এই সঙ্গে উল্লেখ করতে হয় যে পর্ষৎ ভারতের প্রাচীন ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি, রাজনীতি, বিজ্ঞান শিল্পকলা সংস্কৃতি প্রভৃতির গবেষণায় যোগদানকে অধ্যাপক নিয়োগের অপরিহার্য শর্তরূপে গ্রহণ করেছে এবং এইসব গবেষণায় সহায়তা করবার জন্য সংস্কৃত, পালী, হিন্দী, মারাঠী, ফারসী প্রভৃতি ভাষার চর্চা উৎসাহিত করেছে। আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শন চর্চার সহায়তার উদ্দেশ্যে পর্ষৎ ফরাসী ও জার্মান ভাষা শিক্ষারও ব্যবস্থা করেছে।

জাতীয় শিক্ষা পর্ষদের পাঠক্রম সম্পর্কে আরও দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন। এই জাতীয় শিক্ষা পর্ষৎই প্রথম ভেবেছিল টেকনোলজিস্টদের জন্য মানবিক বিদ্যার প্রয়োজনীয়তার কথা। এ জন্য এন্‌জিনিয়ারিং শিক্ষার্থীদের জন্য মানবিক বিদ্যাচর্চা আবশ্যিক করা হয়েছিল। পর্ষৎ বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই ভেবেছিল যে পৃথিবী একদিন টেকনোলজিস্টদের দ্বারাই পরিচালিত হবে, কিন্তু ইতিহাস প্রভৃতি মানবিক বিদ্যার **Humanising influence** এদের চিত্তে-চিন্তায় সঞ্চারিত না হলে পৃথিবীকে কোন্ পথে নিয়ে যেতে হবে তার সঠিক নিশানা এরা পাবে কোত্থেকে ?

আরও একটি কথা, ইতিহাস-চেতনা বাদ দিয়ে শিক্ষা সম্পূর্ণ হতে পারে না—এই প্রত্যয় ভিত্তি করেই পর্ষৎ প্রথমদিকে ইতিহাসপাঠ সকল ছাত্রদের জন্য আবশ্যিক করেছিল, কিন্তু পরে পরে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য সে নির্দেশ পরিবর্তিত হয়েছিল।

জাতীয় শিক্ষাপরিষদের পরিণতি

বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ অ্যাণ্ড স্কুল কাজ সুরু করেছিল ১৯০৬ সনের ১৫ই আগস্ট থেকে বৌবাজার ষ্ট্রীটের একটি ভাড়া বাড়িতে। এই বিদ্যায়তনের অরবিন্দ ঘোষ হলেন অধ্যক্ষ এবং সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় হলেন সুপারিন্‌টেনডেণ্ট বা কর্মাধ্যক্ষ। জাতীয় বিদ্যায়তনের তিনটি মুখ্য বিভাগ হল সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কারিগরী।

১৯০৭ সনের জুলাই থেকে বাংলাদেশে সংবাদপত্রের উপর যখন সরকারী নিপীড়ন শুরু হল তখন 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে অদূর ভবিষ্যতে সরকারী ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়বেন এবং জাতীয় বিদ্যায়তনের সমূহ

ক্ষতি হবে এই আশঙ্কায় অরবিন্দ ঘোষ ১৯০৭ সনের ২রা আগস্ট অধ্যক্ষের পদে ইস্তফা দিলেন।

দেশের যে পরিস্থিতি জাতীয় শিক্ষাপরিষদের জন্ম দিয়েছিল, সেই পরিস্থিতির ফলেই সারা বাংলা দেশেই (এমনকি বাংলার বাহিরেও) বহু জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। ১৯০৭ সনের ডিসেম্বরে বঙ্গদেশে মাধ্যমিক জাতীয় বিদ্যালয়ের সংখ্যা হয়েছিল ১১।[৪৪]

শিক্ষাপরিষদের কার্যকলাপ ও প্রভাব সারা বাংলাদেশে প্রসারিত হতে থাকলেও তারকনাথ পালিত প্রতিষ্ঠিত 'সোসাইটি ফর্ দ্য প্রমোশন্ অব্ টেকনিক্যাল্ এডুকেশনের কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ রইল শুধু কলকাতা শহরে। অবশ্য পরিষদের প্রভাব বিস্তারের কতগুলি কারণ ছিল। তখন বাংলাদেশে একটা বৈপ্লবিক উত্তেজনা প্রবাহিত হচ্ছে, সুতরাং শিক্ষা সম্পর্কে পরিষদের বৈপ্লবিক মনোভাব দেশবাসীকে আকৃষ্ট করেছিল এবং সোসাইটির কারিগরী বিদ্যার্জনকে প্রয়োজনীয় বা পর্যাপ্ত শিক্ষা বলে দেশবাসী গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল না। দ্বিতীয়তঃ পরিষদের শিক্ষাপরিকল্পনার সঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনের একটি ঐক্যের সূত্রছিল যার অভাব ছিল সোসাইটির পরিকল্পনা ও পরিচালনার মধ্যে। আর সর্বশেষে বলতে হয় সঙ্গে যুক্ত ছিলেন অধ্যক্ষ অরবিন্দ ঘোষ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাসবিহারী ঘোষ, আশুতোষ চৌধুরী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি সর্বজনবিদিত নেতারা।

কিছুকাল পৃথক অস্তিত্ব বজায় রেখে চলবার পর ১৯০০ সনে তারকনাথ পালিত মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত 'সোসাইটি ফর্ দ্য প্রমোশন্ অব্ টেক্‌নিক্যাল এডুকেশন' জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সঙ্গে যুক্ত হল। অতঃপর সাহিত্য বিজ্ঞানের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা চলতে লাগল বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ ভবনে এবং কারিগরী ও ফলিত বিজ্ঞানের অধ্যাপনা চলল বেঙ্গল টেকনিক্যাল্ ইনস্‌টিটিউট ভবনে।

কিন্তু কয়েক বছরের ভিতরেই (১৯০৬-১৭ মধ্যেই) বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ ছাত্রশূন্য হয়ে গেল। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের এ করুণ পরিণতির অবশ্য কারণ ছিল:—

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন দাঁড়িয়ে গিয়েছিল অনেকটা রাজনৈতিক আন্দোলনে, এর শিক্ষা আন্দোলন ছিল যেন গৌণ ব্যাপার। তাই স্বদেশী যুগের উদ্দীপনা ও উত্তেজনার সময় এর অভাবনীয় প্রসার ঘটেছিল।

তারপর 'স্বদেশী' আন্দোলন যখন স্তিমিত হয়ে এল, বঙ্গভঙ্গ যখন রদ হল (১৯১১) তখন জাতীয় শিক্ষার আন্দোলনও স্বভাবতই স্তিমিত হয়ে গেল।

দ্বিতীয় কারণ দেশের অধিকাংশ অভিভাবক ও ছাত্র জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সংশয় পোষণ করতেন। দেশে প্রচলিত স্কুল কলেজে শিক্ষিত বাঙালীরা অনেকে জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রদের 'শিক্ষিত' বলে গণ্য করতেন না।

তৃতীয় কারণ হল, অরবিন্দ ঘোষ ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ থেকে পদত্যাগ। এরা ছিলেন শিক্ষাপরিষদের স্তম্ভস্বরূপ। অরবিন্দ ঘোষ রাজনৈতিক কারণে ১৯০৭ সনের অগষ্ট মাসে পদত্যাগ করলেন এবং সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্বাস্থ্যহানির ফলে ১৯০৮ সনের ডিসেম্বরে পদত্যাগ করলেন। এঁদের পদত্যাগের ফলে পরিষদের মর্যাদা ও প্রভাব যথেষ্ট ক্ষুন্ন হয়েছিল।

চতুর্থ কারণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আবির্ভাব। স্যার আশুতোষ ১৯০৬—১৯১৪ পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার হিসেবে বাংলাদেশের সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষায় যে যুগোপযোগিতার আমদানি করেছিলেন, তার সঙ্গে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ভাবনা ও কর্মের প্রচুর সাদৃশ্য ছিল। তাই পরিষদ-পরিবেশিত শিক্ষার কথা যাঁরা ভাবছিলেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে তাঁদের কাম্যশিক্ষার অনেকটাই তাঁরা পেলেন এবং তদুপরি পেলেন সরকারী স্বীকৃতি। অবস্থাটা সংক্ষেপে বলা যেতে পারে এইভাবে,—স্যার আশুতোষ যেন অনেকটা জাতীয় শিক্ষাপর্ষদের উপরেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমারত রচনা করলেন। কিন্তু জাতীয় শিক্ষাপরিষদের শিক্ষার যে দিকটা আশুতোষ অবহেলা করেছিলেন বা গড়ে তুলতে পারেননি, সেই কারিগরী শিক্ষার দিকটা আপন প্রাণশক্তির জোরে টিকে থাকলো এবং কারিগরী বিভাগ দিনে দিনে 'যাদবপুর কলেজ অব্ এন্‌জিনীয়ারিং অ্যাণ্ড টেক্‌নলজি' রূপে বিকশিত হয়ে উঠল।

আশুতোষ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

উড্ সাহেবের ডেসপ্যাচ-এর একটি মহৎ ফল হল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতিষ্ঠা। কিন্তু মহৎ কিছু এ দেশের শিক্ষা ব্যাপারে উড্ সাহেব করতে চান নি। ভারতীয়দের জন্ম উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করতে তাঁর অনীহার অন্ত ছিল না। তিনি বড়লাট ডালহৌসীকে লিখছেন (২৪ এপ্রিল, ১৮৫৪) উচ্চশিক্ষা পেলে ওরা বিপজ্জনক (dangerous) হতে পারে।[৬৯]

তিনি বাংলার ছোটলাট হ্যালিডে সাহেবকে লিখছেন (২৪ জুলাই, ১৮৫৪)-"If they choose to educate themselves, well and good, but I am against providing our future detractors, opponents and grumblers [70]

অর্থাৎ এরা যদি নিজেদের শিক্ষার ব্যবস্থা নিজেরা করে নেয়, ভালো কথা; কিন্তু যারা ভবিষ্যতে আমাদের অপবাদ দেবে বিরোধিতা করবে এবং আমাদের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করবে, তাদের জন্ম উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা করার আমি বিপক্ষে।

উপরের পত্রাংশগুলিতে উড্ সাহেবের মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গেল। উডের ডেসপ্যাচ অনুসারে যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল তার কাজ হল পরীক্ষা নেওয়া আর ডিগ্রী দেওয়া। একটা অধ্যয়ন-অধ্যাপনা-বিবর্জিত বিশ্ববিদ্যালয় বাঙালীর মনঃপুত ছিল না। বাঙালী বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ববিদ্যার চর্চাই কামনা করেছিল। বাঙালীর এ আকাংক্ষার প্রথম প্রকাশ হল যখন ১৮৬২ সনে প্রসন্নকুমার ঠাকুর উইল করে আইনের একটি অধ্যাপক পদের জন্ম অর্থসংস্থান করে গেলেন। কিন্তু এরপরে সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মপ্রণালীর কোনও পরিবর্তন হল না। অতঃপর ১৮৯৮ সনে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সম্পর্কে নতুন নীতি অনুসরণের প্রয়োজন সরকার বোধ করলেন। ১৯০২ সনের জানুয়ারীতে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন নিযুক্ত হলেন এবং ১৯০৪ সনে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ হল। এ আইন অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য প্রসারিত হল। অতঃপর বিশ্ববিদ্যালয়কে ছাত্রদের পাঠদানের দায়িত্ব এবং সেজন্ম অধ্যাপক নিয়োগ, গ্রন্থাগার, গবেষণাগার ও প্রদর্শনশালা নির্মাণ ও সংরক্ষণের অধিকার দেওয়া হল।

বিশ্ববিদ্যালয় আইন বলবৎ হল ১৯০৪, ১লা সেপ্টেম্বর থেকে এবং প্রথম উপাচার্য হলেন আলেকজাণ্ডার পেড্লার। নতুন আইন অনুসারে নববিধি (New Regulation) তিনি তার দু'বছর কর্মকালের মধ্যেও রচনা করতে

পারলেন না।

১৯০৬ সনের ৩১শে মার্চ থেকে আশুতোষ উপাচার্য হলেন। আশুতোষের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি নববিধি রচনা করলেন এবং ভারত সরকার এই নববিধিগুলি অনুমোদন করলেন।

দেশবাসী বক্তৃতা করে কাগজে লিখে এই নববিধির প্রতিবাদ জানাল। দূরদর্শী বিজ্ঞ বাঙালীরাও সেদিন বলেছিলেন, সরকার বিশ্ববিদ্যালয়কে কুক্ষিগত করবার ব্যবস্থা করছেন, দেশের অবাধ উচ্চশিক্ষা সঙ্কুচিত করবার আয়োজন হচ্ছে। কিন্তু আশুতোষ যে দক্ষতা, বিচক্ষণতা এবং সুদূরদর্শিতা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় আইন এবং নববিধিগুলির প্রয়োগ ব্যবস্থা করলেন, তাতে দেশবাসীর সব সন্দেহ ধীরে ধীরে অপসারিত হতে লাগল।

নববিধিগুলি বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে সকল বিশৃঙ্খলা এবং শ্লথভাবের অবসান ঘটিয়ে শিক্ষাব্যবস্থাকে একটা সুনির্দিষ্ট অবয়ব দিতে পেরেছিল, শিক্ষা প্রচেষ্টায় একটা উদ্দেশ্যমুখিতার সঞ্চার করতে পেরেছিল।

নববিধির প্রথমটি হচ্ছে অনুমোদিত কলেজগুলিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ করবার অধিকার।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে—অনুমোদিত উচ্চবিদ্যালয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করবার অধিকার।

আর তৃতীয় মূল্যবান বিধি হচ্ছে ছাত্রাবাস সম্পর্কে, বিশেষ করে, কলেজের ছাত্রদের জন্য নির্দিষ্ট আবাস ব্যবস্থা সম্পর্কে।

আশুতোষ বলতেন মহাবিদ্যালয়গুলির কেবল বৌদ্ধিক চর্চা দিয়েই কাজ শেষ করলে চলবে না, ছাত্রদের নৈতিক ও দৈহিক উন্নতিবিধানও করতে হবে। আর, তা করতে হলে ছাত্রদের জন্য নির্দিষ্ট আবাস-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য।

নববিধির বলে আশুতোষ দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক সংস্কার সাধন করলেন। বাংলার উচ্চবিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয়গুলির পাঠ্যসূচীর মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হল। বাংলা প্রভৃতি যেসব মাতৃভাষা ইংরেজীর দাপটে নির্বাসিত হয়েছিল, উচ্চবিদ্যালয় থেকে স্নাতক শ্রেণী পর্যন্ত সেই মাতৃভাষায় উপযুক্ত জ্ঞান ও দক্ষতা অত্যাবশ্যক বলে ঘোষণা করা হল।

শিক্ষণ বা শিক্ষাদান (Teaching) সম্পর্কে পাঠ্যসূচী রচনা করে ডিগ্রী পরীক্ষার ব্যবস্থা হল। আইন ও চিকিৎসা শাস্ত্রের পাঠ্যসূচী এবং পাঠন

পদ্ধতিতে মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হল।

উপাচার্য হওয়ার পর থেকেই আশুতোষ কিভাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা ও বিজ্ঞানের স্নাতকোত্তর পঠন-পাঠনের আয়োজন করেছিলেন এবং কিভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা বিষয়ে গবেষণার একটি উপযুক্ত পরিমণ্ডল রচনা করেছিলেন, সে সম্পর্কে এ প্রসঙ্গে সংক্ষেপে কিছু বলা প্রয়োজন।

নববিধি অনুসারে বেশ কিছুকাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং অনুমোদিত কলেজগুলিতে স্নাতকোত্তর কলা ও বিজ্ঞানের অধ্যাপনা চলছিল। ১৯১৬ সনে আশুতোষের সভাপতিত্বে গঠিত কমিটি যেদিন সুপারিশ করলেন যে স্নাতকোত্তর পঠন পাঠন সম্পূর্ণরূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হবে এবং অতঃপর এ বিষয়ে অনুমোদিত কলেজগুলির কিছুই করণীয় থাকবে না, সেদিন আশুতোষের জীবনের সর্বোচ্চ আকাংখা বোধহয় পূর্ণ হয়েছিল। ভারত সরকার কমিটির সুপারিশ অনুমোদন করলেন এবং ১৯১৭ সনের ১লা সেপ্টেম্বর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ই স্নাতকোত্তর পঠন-পাঠনের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিল।

আশুতোষ উপাচার্য হওয়ার পর থেকেই এই দায়িত্ব পালনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে ধীরে ধীরে প্রস্তুত করছিলেন। ১৯০৯ সনে তিনি অর্থনীতি অধ্যাপনার জন্য মিণ্টো অধ্যাপক এবং উচ্চতর গণিত অধ্যাপনার জন্য হার্ডিঞ্জ অধ্যাপক প্রভৃতি পদগুলির প্রতিষ্ঠা করলেন।

সম্রাটের ভারত আগমন উপলক্ষ্যে তিনি ভারতীয় ইতিহাস ও পুরাবৃত্তের অধ্যাপনার জন্য একটি অধ্যাপক পদ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সরকার এ প্রস্তাব সমর্থন না করায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত সংস্কৃত পুস্তকাদির বিক্রয়লব্ধ অর্থে 'প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি' বিষয় অধ্যাপনার জন্য তিনি একটি অধ্যাপক পদ সৃষ্টি করলেন। এইভাবে বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যাপনার জন্য স্থায়ী অধ্যাপক পদ সৃষ্টিকে দেশবাসী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠনের দায়িত্ব গ্রহণের প্রমাণ ও প্রতিশ্রুতি হিসাবে মেনে নিয়েছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার উপযুক্ত পরিমণ্ডল সৃষ্টির জন্য আশুতোষ প্রখ্যাত পণ্ডিতদের দিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দানের ব্যবস্থা করেছিলেন। পণ্ডিত থিব প্রাচীন প্রাচ্যজাতির জ্যোতির্বিজ্ঞান, অধ্যাপক শুটার আধুনিক পদার্থ বিদ্যার অগ্রগতি, ডাঃ হলাও ভারতের ভূতত্ত্ব, দীনেশচন্দ্র সেন বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস, হারমোন জেকোবি ভারতীয় অলংকার শাস্ত্র, এবং

আরও কয়েকজন লব্ধ প্রতিষ্ঠ পণ্ডিত বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দিলেন।

১৯০৮ সনে সতীশচন্দ্র আচার্য মহাশয়কে ভারতীয় যুক্তিবিদ্যা সম্পর্কে এবং আবদুল্লা সুরাবর্দীকে মুসলিম আইন সম্পর্কে মৌলিক গবেষণার জন্য ডি.লিট উপাধিতে ভূষিত করা হল। ১৯০৮ সনের সমাবর্তন ভাষণে আশুতোষ বললেন,—'আমি আশা করছি গবেষণার মূল্য সম্পর্কে বোধ আমাদের হয়েছে এবং গবেষণার মনোভাব অচিরে সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়বে।'

১৯০৯ সনে উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী এবং আদিত্যনাথ মুখোপাধ্যায় এবং ১৯১০ সনে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, হীরালাল হালদার, এবং শ্যামদাস মুখোপাধ্যায় তাদের স্ব স্ব গবেষণার জন্য ডি. লিট উপাধি পেলেন।

পরপর এইসব মৌলিক গবেষণার দ্বারা প্রমাণিত হল মানব সমাজে জ্ঞানের প্রসার সম্পর্কে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর আশুতোষ যে আস্থা স্থাপন করেছিলেন তা কত ন্যায়সঙ্গত, কত যুক্তিযুক্ত।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা বাহুল্য হবে না যে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার যিনি ১৮৭১ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত (১৯০৪) বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' ছিলেন। তিনিও কল্পনা করতে পারেননি যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আশুতোষের পরিচালনায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন্ ফর দ্য কাল্টিভেসন্ অব সায়েন্স-এর মত বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্র হয়ে উঠবে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৮৬৩ সনে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' নির্বাচিত হন। ১৮৮৫ সনে তিনি 'এশিয়াটিক সোসাইটির' সভাপতি হন। তিনিও বোধহয় ভাবতে পারেননি যে তাঁর 'সোসাইটির' মত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নানা মানবিক বিদ্যার গবেষণার পথ কোনো দিন প্রশস্ত করবে এদেশে।

এ প্রসঙ্গে আশুতোষের আর একটি কীর্তি উল্লেখযোগ্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতের প্রাদেশিক ভাষাগুলির স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করে তিনি শুধু অনন্যসাধারণ শিক্ষাবিদের পরিচয় দেননি, ভারতীয় মহাজাতির সংগঠক হিসাবে তাঁর সুগভীর চিন্তার স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

১৮৯১ সনে উপাচার্য গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সমাবর্তন ভাষণে বলেছিলেন—**"I deem it not merely desirable but necessary that we should encourage the study of Indian Vernaculars that**

have a literature, by making them compulsory subjects in our examinations in conjunction with their kindred classical languages." অর্থাৎ যে সব ভারতীয় ভাষায় উল্লেখযোগ্য সাহিত্য আছে সেগুলি, এবং তৎসংশ্লিষ্ট প্রাচীন ভাষাগুলি অবশ্য পাঠ্য হওয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

এ কথার ইঙ্গিত অবলম্বন করে আশুতোষ ১৮৯১ সনেই ফ্যাকাল্টি অব আর্টস এর সভায় প্রস্তাব করলেন যে বাংলা, হিন্দী, ও উর্দু ভাষাকে এফ.এ., বি. এ. ও এম. এ. পরীক্ষার পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হোক। এ প্রস্তাব বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সমর্থন করলেন, কিন্তু প্রস্তাব গৃহীত হল না। ১৮৯৬ সনে স্যার গুরুদাস নিজেও এ প্রস্তাব উত্থাপন করলেন। কিন্তু এ সম্পর্কে কিছুই করা হল না। কিন্তু আশুতোষ যখন ১৯০৬—১৯১৪ পর্যন্ত উপাচার্য রইলেন, সেই সময় তিনি বাংলা ছাড়াও অসমীয়া, ওড়িয়া, উর্দু, হিন্দী, গুজরাঠী, দ্রাবিড়ী, তামিল, মালাইয়ালাম্, কেনারী এবং সিংহলী ভাষায় স্নাতকোত্তর পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করলেন। এর আগে প্রাদেশিক ভাষা সমূহেয় স্নাতকোত্তর স্তরে পঠন-পাঠন ও পরীক্ষার ব্যবস্থা ভারতের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ই করতে পারেননি। ১৯১৩ সনের সমাবর্তন ভাষণে আশুতোষ উপাচার্য হওয়ার পূর্বে ভারতীয় ভাষা সমূহের পঠন-পাঠন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমভুক্ত করতে গিয়ে কিভাবে ব্যর্থ মনোরথ হয়েছেন তার বিবরণ দেন। ঐ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,—উপাচার্য হয়ে তিনি সরকার এবং সেনেট সদস্যদের এই প্রাথমিক সত্য বোঝাতে পেরেছিলেন যে জাতীয় জীবনের সঙ্গে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্বাঙ্গীকরণ সম্ভব করতে হলে ভারতীয় ভাষাগুলির অনিবার্য দাবীকে অকাতরে স্বীকৃতি দিতে হবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই আধুনিক ভারতীয় ভাষাবিভাগ সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেন উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছেন—"এই কলিকাতাকে ভারতবর্ষের প্রাদেশিক ভাষার একমাত্র কেন্দ্রস্থানে পরিণত করিয়া তিনি প্রত্যেক প্রদেশের সঙ্গে শিক্ষণ বিষয়ে আমাদের ঐক্যবিধান করিয়াছিলেন। নানা প্রাদেশিক ভাষাবিদ্ পণ্ডিতগণের কলরবে ভারতীয় ভাষাবিভাগ মুখরিত হইয়া উঠিল। বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতীয় অপরাপর দেশের নূতন ঘনিষ্ঠতা হইল।"[71]

আশুতোষের পিতা গঙ্গাপ্রসাদ ছিলেন খাঁটি ন্যাশনালিস্ট। আশুতোষ বাড়ীর স্বাদেশিকতার আবহাওয়াতেই মানুষ হয়েছিলেন। তাই স্বভাবতই

তাঁর কৈশোরে দেশে যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হয়েছিল তাও আশুতোষকে বিপুলভাবে নাড়া দিয়েছিল। সেকালের অন্যসব প্রতিভাধর ভারত সন্তানের মত তিনিও আইনসভার সদস্য হয়ে দেশের মঙ্গল সাধনে এগিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু স্বল্পকাল মধ্যেই আইনসভার সদস্যদের দেশসেবা তাঁর কাছে নেহাৎ নেতিবাচক মনে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত দেশসেবার একটা নিজস্ব পথ তিনি বেছে নিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে কর্মক্ষেত্র করে উচ্চশিক্ষার সার্থক ব্যবস্থার পথে তিনি তাঁর দেশপ্রেমকে নিয়োজিত করলেন। দেশব্যাপী উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার বিচিত্র ক্ষেত্র উন্মুক্ত করে দেওয়া তাঁর জীবনের ব্রত হল। ইংরেজ সরকারের কর্তৃত্ব অক্ষুন্ন রেখে তারই ছায়ায় উচ্চশিক্ষা প্রসারের প্রচেষ্টা দেশের সেদিনকার গণ্যমান্যদের অনেকেই ভাল চোখে দেখেননি। অনেক সময়ই তাঁর প্রচেষ্টার বিকৃত ব্যাখ্যা হয়েছে। কিন্তু আশুতোষ উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে দেশসেবার এই নিজস্ব পথটি ছেড়ে ভিন্ন পথে পা দেননি।

স্বদেশী যুগের নেতারা স্কুল কলেজকে 'গোলামখানা' আখ্যা দিলেন। স্বদেশী আন্দোলন স্কুল কলেজ নিষিদ্ধ করে দিল। শিক্ষাক্ষেত্রে এ আত্মঘাতী আন্দোলনের বিরুদ্ধে তিনি একাই রুখে দাঁড়ালেন। দেশের হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া বাদ দিয়ে জীবনের অমূল্য দিনগুলির অপচয় করবে, একথা ভেবে তিনি আতঙ্কিত হলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন যদি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে আঘাত করে তবে দেশের সর্বনাশ ডেকে আনা হবে।

আশুতোষ সম্পর্কে একশ্রেণীর দেশবাসীর অভিযোগ হচ্ছে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষার মান কমিয়ে দিয়েছিলেন, এবং তাঁর সমস্ত শক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পঠন-পাঠন ও গবেষণার আয়োজনেই নিয়োগ করেছিলেন। এ অভিযোগের সরাসরি কোন উত্তর নেই। অভিযোগ দুটি সত্য। তবে একথাও সত্য যে, পরীক্ষার মান কমিয়ে দেওয়ার ফলে সেদিন বাংলা দেশের বহু অখ্যাত অজ্ঞাত পরিবারের ছেলেমেয়ে লেখাপড়ায় মন দিয়ে পরীক্ষা পাশের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। সেদিন কৃষক মজদুর এবং অন্যান্য অবজ্ঞাত শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা যে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পেয়ে আত্মসচেতন হল তার মধ্যেই নিহিত ছিল ভবিষ্যৎ সমাজের পরিবর্তনের বীজ। এদের লেখাপড়া শেখার ফলেই দেশের বহু কুসংস্কার আজ অবলুপ্ত

হয়েছে। জাতিভেদ প্রথা শিথিল হয়েছে, এবং দেশ অন্তত সামাজিক প্রগতির পথে এগিয়ে যেতে পেরেছে। এ সবই আশুতোষের শিক্ষা প্রচেষ্টার পরোক্ষ ফল।

উচ্চশিক্ষা গবেষণার ক্ষেত্র উন্মুক্ত ও প্রশস্ত করায় কি ফল হয়েছিল তা তাঁরাই জানেন যাঁরা বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকের বাংলা ও বাঙালীর খবর রাখেন। সেই নির্দিষ্ট সময়টুকুতে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে বাঙালীর যে জাগরণ ঘটেছিল, অন্য কোন সময়ে তা হয়নি। এই সময়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্ররা মৌলিক গবেগণা করে ঐ সব বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, এবং সেখানে নানাবিধ গবেষণার পথ উন্মুক্ত ও প্রশস্ত করে দিয়ে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্থায়িত্ব ও কৃতিত্ব অর্জনে সহায়তা করেছিলেন।

ভারতবর্ষে ভারতীয় মহাজাতি গড়ে তোলা ছিল আশুতোষের স্বপ্ন ও সাধনা। তাঁর এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অবলম্বন করে জীবনব্যাপী সাধনা করে গেছেন।

তিনি বিশ্বাস করতেন ভারতীয় বিচিত্র জাতিগুলির মধ্যে সংহতি সাধন করে যদি ভারতীয় মহাজাতি গড়ে তুলতে হয়, তবে তাদের মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ঐক্যবন্ধন এনে দিতে হবে। শিক্ষা ও সংস্কৃতির পথ ধরেহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে অদূর ভবিষ্যতে পরমাসংহতি সম্ভব হতে পারে। তাই তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানার্জন ও গবেষণার বিভিন্ন ক্ষেত্র সকল ভারতবাসীর জন্য উন্মোচিত করেছিলেন তিনি। আর সেই সঙ্গে সেখানে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষাগুলির শিক্ষণ ও অনুশীলনের ব্যবস্থা করেছিলেন। আশুতোষের এই মহৎ প্রয়াসের ফলেই পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ আমন্ত্রিত অধ্যাপক হয়ে বাংলা ভাষার সাহিত্য বিষয়ে 'কমলা বক্তৃতাগুলি' দিয়েছিলেন এবং তারও পরে অবনীন্দ্রনাথ বাংলায় তাঁর 'বাগীশ্বরী' বক্তৃতাগুলি দিয়েছিলেন। এগুলি পরে প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়েছিল।

আশুতোষের চিন্তা ও প্রচেষ্টার এই বিশেষ দিকটি লক্ষ্য করে শ্রীরাধাকৃষ্ণণ ১৯৬৪ সনের ২১শে জুন কলকাতায় 'আশুতোষ ইন্স্টিটিউট্ অব ল্যাংগোয়েজেস্'—এর উদ্বোধন উৎসবে বলেছিলেন—'Genious

anticipates experience.'

* * * *

আশুতোষ সম্পর্কে পরিশেষে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। শিক্ষাক্ষেত্রে ফিলট্রেসন্ নীতির সপক্ষে বা বিপক্ষে আশুতোষ কখনও কোন মত প্রকাশ করেননি। তবে একথা সর্বজন স্বীকৃত যে তাঁর সমগ্র শিক্ষাপ্রচেষ্টা উচ্চশিক্ষার স্বার্থেই নিয়োজিত হয়েছিল, তাঁর শিক্ষার ভোজে শুধু উচ্চশ্রেণী নয়, তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর অনেক শিক্ষার্থীই যোগ দিয়েছিল। তবু একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে জনশিক্ষার জন্য আশুতোষ তেমন কোন চিন্তা বা প্রচেষ্টা করেননি। বাংলাদেশের সর্বোত্তম শিক্ষা ব্যবস্থাপক হিসাবে তিনি উপরতলায় উচ্চশিক্ষা বিকিরণের চেষ্টা করেছেন, নীচের থেকে শিক্ষাকে উপরে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেননি। এর অবশ্য কারণ আছে। উনি নিজে জনশিক্ষা ও উচ্চশিক্ষাকে দুটি পৃথক বিষয় বলে ভাবতেন। প্রথমটি দ্বিতীয়টির পরিপূরক একথা বোধহয় বিশ্বাস করতেন না। একথার সত্যতা অনেকটা প্রমাণিত হচ্ছে তাঁর নিম্ন উক্তি থেকে : "Learning, speculation and research of the highest type have developed and beautified the world independently of any general system of primary education."[৭২]

অর্থাৎ সর্বসাধারণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা ব্যতিরেকেই সর্বোচ্চস্তরের শিক্ষা, অনুধ্যান (Speculation) এবং গবেষণা পৃথিবীকে উন্নত ও সুষমামণ্ডিত করেছে।

আশুতোষের সময়ে বঙ্গভূমি উচ্চশিক্ষা, গবেষণা প্রভৃতিতে আত্মমগ্ন হয়েছিল সত্য, কিন্তু সমস্ত শরীরকে ফাঁকি দিয়ে কেবলমাত্র মুখে রক্তসঞ্চারকে যেমন স্বাস্থ্য বলা যায় না, তেমনি জনগণের সঙ্গে অসম্পৃক্ত এই উচ্চশিক্ষাকে সমগ্র দেশের সুশিক্ষা বলা যায় না। এই শিক্ষা বা উচ্চশিক্ষা আজও দেশবাসীর মধ্যে পরিস্রুত হয়নি, কোনদিন হবেও না। তাই আজও আশুতোষের বঙ্গভূমিতে ভয়াবহ নিরক্ষরতা অগ্রগতির সব প্রচেষ্টা প্রতিহত করেছে।

বাঙালী মুসলমানদের শিক্ষাচিন্তা

বাংলাদেশে উনিশের শতকে যে জাগরণ বাংলার হিন্দুদের মধ্যেই তার উৎপত্তি ও প্রসার। দেশের মুসলমান সমাজকে এ জাগরণ প্রকৃত প্রস্তাবে

স্পর্শ করেনি। এর সুনির্দিষ্ট কারণ নির্ণয় করা কঠিন, তবে মনে হয় একাধিক কারণ একত্র হয়ে মুসলমান সমাজকে এ জাগরণ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল।

কারণগুলি এইভাবে প্রকাশ করা যায়ঃ প্রথমতঃ বাংলাদেশে মুসলমানরা বেশীর ভাগই দরিদ্র ছিলেন। এই দারিদ্র্যের জন্যই শিক্ষা বা লেখাপড়ার কোন প্রয়োজন বেশীরভাগ মুসলমান পরিবার বোধ করেননি। দ্বিতীয়তঃ, লুপ্ত অতীত গৌরব সম্বন্ধে এঁদের মধ্যে একটা অহমিকা ছিল।

তৃতীয়তঃ এঁরা মনে করতেন ইংরেজী শিখলে অথবা লেখাপড়ায় হিন্দুসমাজের সামিল হলে ধর্মে আঘাত লাগবে। এ জন্যই এঁরা স্কুল বা দেশীয় পাঠশালার শিক্ষা থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন।

ইংরেজ এদেশে আসবার আগে হিন্দুদের শিক্ষার জন্য ছিল টোল আর পাঠশালা এবং মুসলমানদের জন্য ছিল মাদ্রাসা ও মক্তব। ইংরেজ এসে যখন কালক্রমে ইংরেজীর মাধ্যমে পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রবর্তন করল, তখন বাংলাদেশের হিন্দুরাই সেই ইংরেজী শিক্ষাকে সর্বান্তঃকরণে স্বাগত জানাল, দেশের মুসলমান সমাজ মাদ্রাসা-মক্তবের শিক্ষা নিয়ে পড়ে রইল।

১৭৮১ সনে ওয়ারেন হেষ্টিংস বাংলাদেশে আরবী ও ফারসী চর্চার ক্রমাবনতি প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে 'কলকাতা মাদ্রাসা' স্থাপন করেন। মাদ্রাসায় কোন বেতন লাগত না, তাছাড়া অনেক স্টাইপেণ্ড-এর ব্যবস্থাও ছিল। কিন্তু তবু কলকাতা মাদ্রাসায় কোনদিনই যথেষ্ট সংখ্যায় আগ্রহশীল ছাত্র পাওয়া যায়নি। ৪৫ বছর পরে ১৮২৬ সনে ঐ মাদ্রাসায় একটি ইংরেজী ক্লাস জুড়ে দেওয়া হল এবং ১৮২১-এ যথেষ্ট মুসলমান ছাত্রের অভাবে সেটি সর্বসম্প্রদায়ের জন্য ইংরেজী স্কুলে পরিণত করা হল। গোঁড়া মুসলমান ছাত্ররা সে স্কুল পরিহার করল। তারা একদিকে যেমন ইংরেজী শিখতে অনিচ্ছুক ছিল, তেমনি বাংলা শেখার প্রতিও তাদের অবজ্ঞা ছিল।

১৮৩৫-এর ৭ই মার্চ বেন্টিঙ্ক যখন ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন, তখন আটহাজার মুসলমানছাত্র সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। কারণ, তাদের মতে ঐ সিদ্ধান্তের পরোক্ষ উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করা।[৭৪]

মুসলমানদের ইংরেজী শেখানোর পরবর্তী উল্লেখযোগ্য সরকারী প্রচেষ্টা হচ্ছে ১৮৭৭ সনে মাদ্রাসায় ইংরেজী-আরবী ক্লাস খোলা। অনেক আশা নিয়ে এই ক্লাস খোলা হয়েছিল। কিন্তু মুসলমান ছাত্র-সমাজ থেকে

উল্লেখযোগ্য কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

১৮৫৩ সনে 'কাউন্সিল্ অব্ এডুকেসন' প্রস্তাব করলেন কলকাতা মাদ্রাসায় ইংরেজী-আরবী ক্লাসের বদলে ইংরেজী-ফার্সী ক্লাস খোলা হোক। ইংরেজী-ফারসী বিভাগ খোলার পর থেকে মাদ্রাসা যেন দু'টি পৃথক স্কুলে পরিণত হল। ইংরেজী-ফারসী বিভাগটি প্রচলিত উচ্চ ইংরেজী স্কুলের মত পরিচালিত হল এবং ১৮৬৭ সনে অনেক আশা নিয়ে ঐ বিভাগটিকে কলেজে উন্নীত করা হল। ১৮৬৯-৭০ এ দেখা গেল কলেজে পাঠ নেবার জন্য একটি ছাত্রও নেই। ফলে কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হল এবং অতঃপর যে মুষ্টিমেয় মুসলিম ছাত্র কলেজে পড়তে এল, তাদের নামমাত্র বেতনে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি করা হল।

১৯ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালী মুসলমানদের অন্যতম নেতা ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল লতিফ্ খান। তিনি মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষার বিরোধী ছিলেন না, কিন্তু মুসলমানদের জন্য আরবী ফারসী শিক্ষা অপরিহার্য—এমত পোষণ করতেন। মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা অগ্রসর করবার জন্য ১৮৬৩ সনে তিনি 'মহামেডান লিটারারি সোসাইটি' স্থাপন করেন এবং ১৮৬৮ সনে তিনি বেঙ্গল সোসাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের সভায় এদেশে মুসলমানদের শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি ইংরেজী শিক্ষার প্রতি মুসলমান সমাজের বিরাগের কথা গোপন করেননি। ঐ প্রবন্ধে তিনি শিক্ষিত ঘরের মুসলমান ছেলেদের জন্য যারা ইংরেজী শিখতে অনিচ্ছুক—একটি আরবী চর্চার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। অন্যান্য মুসলমান ছাত্রদের জন্য তিনি একটি ইঙ্গ-ফার্সী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন।[74]

একথা লক্ষ্য করবার মতো যে আবদুল লতিফ্ খান কোন সময়ই বাঙালী মুসলমান ছাত্রদের জন্য আরবী-ফারসী পরিহার করে ইংরেজী বাংলা শিক্ষার কথা বলেন নি।

১৮৮২ সনে হাণ্টার কমিশনের সামনে বিচারপতি আমীর আলি একাই প্রস্তাব করলেন যে মাধ্যমিক স্তর থেকে উপরের দিকে সর্বস্তরে মাদ্রাসাগুলিতে ইংরেজী 'আবশ্যিক' করা হোক, কিন্তু আবদুল লতিফ খান এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন।[75]

উপরোক্ত আমীর আলির উদ্যোগে 'ন্যাশনাল মহামেডান অ্যাসো-

সিয়েশন' নামে বঙ্গদেশের একটি মুসলিম সমিতি শিক্ষা-কমিশনের কাছে মুসলমানদের দাবী সম্বলিত একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। এতে সরকারকে হুগলী, ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং রাজসাহীর মাদ্রাসাগুলি তুলে দিয়ে ঐ খরচে কলকাতায় কেবল মুসলমানদের জন্য একটি ইংরেজী কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে বলা হয়। অ্যাসোসিয়েশানের এ প্রস্তাব সম্পর্কে মতামত দেবার জন্য সরকার আবদুল লতিফ সাহেবকে অনুরোধ করেন। লতিফ সাহেব **'paper on the present condition of Indian Mohamedans and the best means for its improvement'** শীর্ষক প্রবন্ধ লিখে (২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৩) সরকারের কাছে পেশ করেন।[76]

এই প্রবন্ধে তিনি মাদ্রাসাগুলি তুলে দেওয়ার প্রস্তাবের ঘোরে বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, মুসলমানদের সামাজিক কর্তব্য পালনে, শরাহ্ শরিয়তের ব্যাপারে উপদেশ দেবার জন্য আরবী-জানা কাজী ও মৌলভীর বিশেষ প্রয়োজন। মুসলমান সমাজে সম্মান পেতে হলে ফারসীতে ভাল জ্ঞান এবং অন্ততঃ কিছু আরবী জ্ঞান থাকা দরকার। তিনি আরও বলেন ধর্মভীরু মুসলমানেরা মনে করে যে সরকারী শিক্ষা ব্যবস্থায় আরবী ফারসীর স্থান না থাকার জন্যই ইংরেজী শিক্ষিত মুসলমানদের চরিত্র বিকৃত হয়ে যায়।[77]

এইভাবে ইংরেজীর মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার বিরোধিতার ফলে ১৯ শতকের শেষ ভাগেও মাদ্রাসা শিক্ষা যে অবস্থায় ছিল সে অবস্থাতেই থেকে গেল। যে ইংরেজী শিক্ষার জন্য প্রতিবেশী হিন্দুদের এত উদ্যম, এত প্রয়াস, মুসলমান সমাজ তা থেকে নিজেদের দূরেই রেখে দিল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রায়োজন যে কলকাতা মাদ্রাসার ইংরেজী বিভাগ ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এ মাদ্রাসায় কলকাতা ও তার পাশাপাশি বর্ধিষ্ণু অঞ্চলের মুসলিম ছাত্ররাই ভর্তি হত।

ইংরেজী শিক্ষার প্রসার (কলেজ পর্যায়)

দেশবাসীর পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য কলকাতার হিন্দু সমাজের প্রধানরা ১৮১৭ সনে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অবশ্য কলেজ বলতে যা বুঝায় হিন্দু কলেজ আদিতে তা ছিল না। প্রথমে এটি একটি স্কুল ছিল এবং

জনৈক গোরাচাঁদ বসাকের বাটীতে স্কুলটি স্থাপিত হয়েছিল। তারপর স্কুলটি ফিরিঙ্গী কমল বসুর বাটীতে এবং তৎপরে টেরেটি বাজারে স্থানান্তরিত হয়। ১৮২৬ সনে স্কুলটি পটলডাঙ্গার সংস্কৃত কলেজের অট্টালিকায় আনা হয়। ১৮২৪ এর ২৫শে ফেব্রুয়ারী ঐ অট্টালিকায় ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন বড়লাট লর্ড আমহার্স্ট। ভিত্তি-প্রস্তরের উপর খোদিত লিপিতে প্রথম 'হিন্দু কলেজ' নামটি উল্লেখ করা হয়।[78]

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বাঙালীর ইংরেজী শিক্ষার ব্যাকুলতা ক্রমেই বেড়ে চলেছিল। ইতিমধ্যে ১৮৩৫ সনে মেকলের মিনিট ও বেন্টিকের ঘোষণা, ১৮৩৬-এ হুগলী কলেজ প্রতিষ্ঠা একদিকে যেমন বঙ্গবাসীর ইংরেজী শিক্ষার ব্যাকুলতা দুর্নিবার করে তুলল, অন্যদিকে সে ব্যাকুলতা চরিতার্থ করবার পথও প্রশস্ত করে দিল। অচিরে শুধু বিদ্যালয় স্তর নয়, মহাবিদ্যালয় স্তরেও ইংরেজীর উচ্চতর শিক্ষার জন্য উচ্চশ্রেণীর বাঙালী যুবক আগ্রহশীল হল। ক্রমে ক্রমে ঢাকা (১৮৪১), কৃষ্ণনগর (১৮৪৫), এবং বহরমপুর (১৮৫৩) সহরে সরকারী স্কুলকে স্থানীয় জনগণের অকুণ্ঠ আর্থিক সহায়তায় উন্নীত ও প্রসারিত করে কলেজে পরিণত করা হল।

১৮৫৫ সনে হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সী কলেজে রূপান্তরিত হল, এবং সেখানে কলা, বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র, আইন, প্রভৃতি পড়ানোর ব্যবস্থা করা হল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্যোগে হিন্দু মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউসন্ ১৮৭২ সনের জানুয়ারী মাসে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ এবং ১৮৭৯ সনে প্রথম শ্রেণীর কলেজে উন্নীত হল। ১৮৮১তে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আনন্দমোহন বসু সিটি কলেজ স্থাপন করলেন। ১৮৮১-৮২তে বাংলাদেশে কলেজ সংখ্যা দাঁড়াল : সরকারী ১২টি, সাহায্যপ্রাপ্ত ৫টি এবং সরকারী সাহায্যবিনা স্বাবলম্বী ৩টি। এ প্রসঙ্গে হাণ্টার কমিশন বলেছেন, সরকারী সাহায্যের বলে কোন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। যে পাঁচটি কলেজ সরকারী সাহায্য পেত সেগুলি অনুদান প্রথা প্রবর্তনের পূর্বথেকেই ছিল। হাণ্টার কমিশন সবিস্তার আলোচনা করে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্র থেকে সরকারের সরে আসা উচিত—এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে সরকারের মতি পরিবর্তন অনেককাল পূর্ব হতেই লক্ষ্য করছিলেন এবং এজন্য তাঁদের ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল। হাণ্টার কমিশনের সদস্য বিচারপতি কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাঙ্, তাঁর 'Note of

Dissent'-এ বলেছিলেন, 'আমার দৃঢ় ধারণা উচ্চশিক্ষা বাদ দিয়ে জনশিক্ষার ব্যবস্থা করলেও সে জনশিক্ষা দিয়ে কোন কাজ হয় না। এ কথা প্রায়ই বলা হয় যে একজন ছাত্রের উচ্চশিক্ষার যে খরচ তা দিয়ে একশজন ছেলেকে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া যায়।—কিন্তু এ ধরণের যুক্তিতে আমি মুহূর্তের জন্যও কর্ণপাত করতে চাই না। * * * আমার মতে দেশের ধর্ম সমাজ, রাজনীতি, শিল্প সর্বক্ষেত্রে অগ্রগতি নির্ভর করে উচ্চশিক্ষা প্রসারের মহৎ নীতির উপর এবং অতীত ভারতবর্ষে ব্রিটিশ এই [illegible] অনুসরণ করেছেন।'[70]

কাশীনাথের বক্তব্যের মধ্যেই বাংলার তদানীন্তন শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের মত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে বলা যায়। কিছুমাত্র বিশ্লেষণ না করেই বোঝা যাচ্ছে সেদিন ইংরেজ সরকার তার বহু-ঘোষিত নিম্ন পরিস্রাবণ নীতি (Downward Filtration) থেকে সরে আসতে চাইলেও বঙ্গদেশের অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীরা তা চাইছেন না।

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্র থেকে প্রত্যাহার নীতি (Policy of withdrawal) অনুসরণ করে হাণ্টার কমিশন কলেজগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করলেন:

(ক) দেশের উচ্চশিক্ষার স্বার্থে কলেজ থেকে সরাসরি সহায়তা প্রত্যাহার করা উচিৎ হবে না।

(খ) যে-সব কলেজের পরিচালনা দেশীয় ভদ্রলোক দ্বারা গঠিত সংস্থার (bodies of native gentlemen) হাত দেওয়া চলে। অবশ্য যদি ঐ সব সংস্থা স্বীকৃতি দেন যে কলেজগুলিকে তাঁরা চিরকাল দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করে স্থানীয় উচ্চশিক্ষার চাহিদা মেটাবেন। বাংলাদেশে রাজশাহী ও কৃষ্ণনগর কলেজকে এই শ্রেণীতে ধরা হল।

(গ) তৃতীয় শ্রেণীতে সেই সব কলেজ তালিকাভুক্ত হল যে-সব কলেজ সুচারুরূপে পরিচালিত হচ্ছে না, অথবা যেখানে ব্যয়ের অনুপাতে শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা সন্তোষজনক নয়।

কমিশন বললেন, এই শেষোক্ত কলেজগুলির পরিচালনার দায়িত্ব যদি স্থানীয় জনসাধারণের কোন সংস্থা যথাসময়ে গ্রহণ না করেন, তবে এগুলি বন্ধ করে দেওয়া হবে। বহরমপুর, মেদিনীপুর, চট্টগ্রামের কলেজ এই শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হল।

বহরমপুর কলেজের দায়িত্ব কাশিমবাজারের মহরাণী স্বর্ণময়ীর প্রস্তাবমত

এক অছি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হল। আর মেদিনীপুর কলেজ পরিচালনার ভার নিলেন স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি।[৪০]

ব্যয় সংকোচের অজুহাতে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে সরকারের প্রত্যাহার নীতির বিরুদ্ধে কলকাতার টাউন হলে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন এর উদ্যোগে ১৮৭০ সনের ২রা জুলাই এক প্রতিবাদসভা হয়েছিল। ইংরেজী স্কুল বা কলেজ সম্পর্কে সরকারের এই প্রত্যাহার বা সাহায্য হ্রাসের নীতিকে ঐ প্রতিবাদ সভায় অ্যাখ্যা দেওয়া হয়েছিল 'National calamity' বা জাতীয় সংকট বলে। হুগলী কলেজের ইতিহাস প্রণেতা অধ্যক্ষ K. Zacharia ১৮৮৭—১৯০৬ এর মধ্যে হুগলী কলেজের ক্রমাবনতি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন' *** Perhaps the starting point was the report of the Education Commission of 1882 which suggested that Government should close down or handover control of some of its Mofussil colleges. *** Government appear to be too often moved by consideration of gain and the prospect of saving money on education has generally been an almost irresistible lure.[৪১]

অর্থাৎ হুগলী কলেজের অবনতির সূচনা হয়েছিল ১৮৮২ সনের শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বেরোবার সময় থেকেই। এই রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে সরকারের উচিত মফঃস্বলের মহাবিদ্যালয়গুলি বন্ধ করে দেওয়া, নয়তো এগুলি ভারতীয়দের হাতে তুলে দেওয়া। সরকার প্রায়ই লাভের দিকে ঝোঁকেন এবং সরকারের শিক্ষাবাবদ টাকা বাঁচানোর লোভ প্রায় অদম্য। বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে আলোচনা হাণ্টার কমিশনের এক্তিয়ারের বাইরে ছিল, কিন্তু কলেজীয় শিক্ষা সম্পর্কে ব্যয়সংকোচ, প্রত্যাহার প্রভৃতি সুপারিশ করে কমিশন পরোক্ষভাবে বিশ্ববিদ্যালয়কে আঘাত করেছিলেন। যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শুধু পরীক্ষা নেওয়া আর ডিগ্রী দেওয়া—তার পক্ষে কলেজগুলি আহত হলে উচ্চশিক্ষা প্রসারে সহায়তা করা সম্ভব হতে পারে না।

১৮৮৪ সনে লর্ড রিপনের গুণমুগ্ধ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় 'রিপন কলেজ' প্রতিষ্ঠা করলেন। এবং ১৮৮৭তে গিরিশচন্দ্র বসু 'বঙ্গবাসী কলেজ' প্রতিষ্ঠা করলেন। বাঙ্গালী প্রধানরা কলকাতায় এবং মফঃস্বলে এইভাবে কলেজ প্রতিষ্ঠা করে শুধু যে বঙ্গবাসীর উচ্চশিক্ষার ক্রমবর্ধমান ক্ষুধা

অনেকটা মিটিয়েছিলেন, তা নয়, তাঁরা এইভাবে হাণ্টার কমিশনের সুপারিশেরও বাস্তব প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।

আসলকথা, হাণ্টার কমিশনের সুপারিশের বিপরীত ফল ফলেছিল বাংলা দেশে। একথা বললে হয়তো অসত্য বলা হবে না যে, উচ্চশিক্ষা থেকে সরকারকে প্রত্যাহারের প্রস্তাব দিয়ে কমিশন বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষা প্রসারের গতিবেগ বাড়িয়ে দিয়েছিল।

১৯০২ সালের মধ্যেই শুধু কলকাতা শহরে কলেজের সংখ্যা বেড়ে হয়েছিল ২০ এবং কলকাতার বাইরে বাংলাদেশে হয়েছিল ২৬। কলেজীয় শিক্ষার কর্তৃত্ব নেতৃত্ব সরকার দিনে দিনে হারিয়ে ফেলছিলেন। কারণ ১৮৮১-৮২তে কলেজ পড়ুয়াদের দু-এর-তিন অংশ পড়ত সরকারী কলেজে, কিন্তু ১৯০২ সনে দেখা গেল পড়ুয়াদের মোট এক চতুর্থাংশ পড়ছে সরকারী কলেজ গুলিতে।[৪২]

সংস্কৃত শিক্ষাচর্চা

লর্ড মিণ্টো ১৮১১ সনের ৬ই মার্চ তারিখে এদেশীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির দুরবস্থা বর্ণনা করে নবদ্বীপ ও ত্রিহুত-এ দুটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু সে প্রস্তাব কাজে পরিণত হয়নি। ১৮২১ সনের ২১শে আগষ্ট বড়লাট-লর্ড হেস্টিংস কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব করলেন এবং কলেজের জন্য বার্ষিক পঁচিশ হাজার টাকা বরাদ্দ করলেন। তিনি বললেন সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা এই কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য হলেও ক্রমশঃ উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে তাঁদের পবিত্র ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সাহিত্যের চর্চাতেও এ প্রতিষ্ঠানের সহায়তা করবে।[৪৩]

১৮২৪ সনের ১লা জানুয়ারী থেকে সংস্কৃত কলেজে পাঠারম্ভ হল। সংস্কৃত কলেজে প্রথম ছটি শ্রেণী ছিল :—ব্যাকরণ, কাব্য, অলংকার, বেদান্ত, স্মৃতি ও ন্যায়। এগুলি ছাড়া সময় সময় নূতন শ্রেণীরও উদ্ভব হয়েছিল। যেমন জ্যোতিষ বৈদ্যক, ইংরেজী, বাংলা এবং পুরাবৃত্ত। বিদ্যাসাগরমশায় কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে কলেজের উন্নতিকল্পে প্রচুর পরিবর্তন সাধন করলেন। ১৮৫১ সনের জানুয়ারী থেকে তিনি কায়স্থদের কলেজে পড়বার অনুমতি দিলেন এবং ডিসেম্বর, ১৮৫৪ থেকে কলেজের দ্বার সকল ভদ্র হিন্দুদের কাছে

উন্মুক্ত হল। ইংরেজী পাঠনের ব্যবস্থা পূর্বে ছিল, কিন্তু পরে উঠে গিয়েছিল, বিদ্যাসাগর ইংরেজী পাঠনের উপর প্রচুর গুরুত্ব দিয়ে তার পুনঃ প্রবর্তন করলেন এবং ইংরেজীতে গণিত পঠন-পাঠনেরও ব্যবস্থা করলেন। তিনি নিজে দুটি সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করে দুরূহ মুগ্ধবোধের স্থলে সেগুলি পাঠনের ব্যবস্থা করেন।[৪৪]

বিদ্যাসাগর চেয়েছিলেন সংস্কৃত কলেজ হবে A" seat of pure and profound Sanskrit learning and at the same time a nursery of improved Vernacular literature and of teachers thoroughly qualified to disseminate that literature among the masses of his fellow country men."[৪৫]

বিদ্যাসাগরের পর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ই, বি, কাওয়েল সংস্কৃত কলেজকে স্কুল ও কলেজে এই দু'ভাগে বিভক্ত করে স্কুলের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের এণ্ট্রান্স পরীক্ষার পাঠক্রম প্রচলন করলেন। ইংরেজী পাঠনের ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হল। কাওয়েলের পূর্বে উচ্চ শ্রেণীতে ইংরেজী পড়ান শুরু হত। তিনি প্রাথমিক সংস্কৃত ব্যাকরণ পাঠের পরেই ইংরেজী পাঠের ব্যবস্থা করলেন।

কাওয়েলের পরে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন প্রসন্ন কুমার সর্বাধিকারী। অল্পকাল পরেই প্রসন্নকুমার বহরমপুর কলেজে অধ্যক্ষ হয়ে চলে যাওয়ার পর ১৮৭৭ সনের ২০শে মার্চ থেকে মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হলেন। ১৮৯৫ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত তিনি এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।[৪৬]

অধ্যক্ষ হয়ে মহেশচন্দ্র মৃতকল্প সংস্কৃত শিক্ষার পুনরুজ্জীবনে আত্মনিয়োগ করলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষার প্রবর্তন করলেন এবং টোল ও চতুষ্পাঠী সংস্কারে ব্রতী হলেন। মহেশচন্দ্র ডি, পি, আই, ক্রফ্‌টকে উপাধি পরীক্ষার সিলেবাস তৈরী করে পাঠালেন এবং (১) সাহিত্য (২) দর্শন (৩) স্মৃতি ও (৪) বেদ এই চার বিষয়ে পরীক্ষার প্রস্তাব করলেন। মহেশচন্দ্রের প্রস্তাব অনুসারে ১৮৭৯ সালের ১৪ই এপ্রিল সংস্কৃত কলেজে প্রথম সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষা নেওয়া হল।

পর পর দু'বছর সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষায় বাঙ্গালী যুবকদের আগ্রহ দেখে মহেশচন্দ্র উৎসাহিত হলেন। মহেশচন্দ্রের প্রস্তাবে সংস্কৃত কলেজে উপাধি

শ্রেণী খোলা হল ১৮৮১ সন থেকে।

১৮৭৮ সন থেকে ঢাকা সারস্বত সমাজ সংস্কৃত পরীক্ষা নিয়ে উপাধি দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। বাংলাদেশে কতগুলি প্রতিষ্ঠান এই পরীক্ষা নেওয়া ও দেওয়ার ব্যাপারে ঢাকা সারস্বত সমাজের অনুসরণ করছিল। সংস্কৃত চর্চার ক্ষেত্রে এ বিশৃঙ্খলা নিরসনের জন্য মহেশচন্দ্রের প্রস্তাবে ১৮৮৪ থেকে পুরাতন উপাধি (যেমন বিদ্যাবিনোদ, স্মৃতিভূষণ, বেদান্তবাগীশ) প্রভৃতি তুলে দিয়ে 'তীর্থ' উপাধি প্রবর্তিত হল।[৪৭]

কিন্তু বিশৃঙ্খলার পুরা নিরসন তাতে হল না। মহেশচন্দ্রের উদ্যোগেই ১৮৯৭ সালে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দ্বারা পরিচালিত সংস্কৃত পরীক্ষার কেন্দ্রীকরণের ব্যবস্থা হল। এ উদ্দেশ্যে একটি সংস্থা তৈরী হল যার সভাপতি হলেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ। কিন্তু এই পরীক্ষক মণ্ডলী থেকে বহু সংস্কৃত পণ্ডিত বাদ যাওয়ায় তাঁরা ক্ষুব্ধ হলেন, অবশেষে ১৯০৮ সালে 'বোর্ড অব স্যাংসক্রিট্ এক্জামিনেসন্' গঠিত হল এবং তাতে বহু প্রখ্যাত পণ্ডিত অন্তর্ভুক্ত হলেন। এইভাবে বাংলাদেশে সংস্কৃত চর্চার যে অবক্ষয় চলেছিল তা অনেকাংশে রোধ করবার চেষ্টা হল।

মহেশচন্দ্র দেশের টোলগুলিকেও অনিবার্য অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। ১৮৯১ সনে তিনি বাংলা, বিহার উড়িষ্যার টোলগুলি যথাসম্ভব পরিদর্শন করে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করলেন। দেখা গেল বাংলাদেশের প্রখ্যাত পণ্ডিতগণ তাঁদের ছেলেদের ইংরাজী শিক্ষা দিচ্ছেন। বাংলা ও উড়িষ্যার ৭৬১টি টোল পরিদর্শন করে মহেশচন্দ্র ডি, পি, আই ক্রফ্‌ট্ সাহেবকে রিপোর্ট পাঠালেন (৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯১)

ডি, পি, আই ক্রফ্‌ট্ সাহেব মহেশচন্দ্রের প্রস্তাব মেনে নিলেন এবং সেই প্রস্তাব অনুসারেই নির্বাচিত টোলের পণ্ডিত মশায়দের ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা হল এবং পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে টোলের পণ্ডিত ও ছাত্রদের সন্তোষজনক পারিতোষিক দানের প্রথা প্রবর্তিত হল।[৪৪]

এইভাবে মহেশচন্দ্র বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার টোলগুলিকে অবধারিত অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করে সেগুলির পুনরুজ্জীবনের আয়োজন করলেন।

আইন শিক্ষা চর্চা

বৃটিশ শাসনের গোড়ার দিকে দেশের হিন্দু ও মুসলমানের জন্য বিবাহ,

সম্পত্তি উত্তরাধিকার প্রভৃতি বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন আইন প্রচলিত ছিল। এছাড়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রজাস্বত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের নির্দেশ দিচ্ছিলেন। এ সব মিলে আইনের সুষ্ঠু চর্চার ব্যাঘাত ঘটছিল।

দেশের মাদ্রাসাগুলিতে মুসলমান ছাত্ররা মুসলিম আইন পড়তে পেত, আবার জজ পণ্ডিত হওয়ার অভিলাষ যে সব হিন্দু ছাত্রের, তারা হিন্দু আইন পড়ত সংস্কৃত কলেজে।

জেনারেল কমিটি অফ্ পাবলিক ইনস্ট্রাক্সন্ আইন শিক্ষাদানের গুরুত্ব অনুভব করছিলেন। ১৮৩১ সালে জজ পীটরে গ্রাণ্টকে জেনারেল কমিটি আইন ও রাজনীতির একজন অধ্যাপক নিযুক্ত করলেন। কিন্তু দুমাস পরেই তিনি সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হওয়ায় পদত্যাগ করলেন। অতঃপর ১৮৩৪ সনে কমিটি আর একজনকে ঐ পদে নিয়োগ করলেন। ১৮৪১-এর শুরুতে কমিটি হিন্দু কলেজের ছাত্রদের কাছে আইন সম্পর্কে বক্তৃতা দেবার জন্য মাসিক ৩০০্ টাকা পারিশ্রমিক দিয়ে সুপ্রীম কোর্টের একজন ব্যারিষ্টারকে নিয়োগ করলেন।- এ ব্যবস্থাও দীর্ঘস্থায়ী হল না। ১৮৪৩ সনে তদানীন্তন অ্যাড্ভোকেট্ জেনারেল ভারতীয় ছাত্রদের কাছে আইন সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে স্বীকৃত হলেন। হিন্দু কলেজ ও হুগলী কলেজের উচ্চশ্রেণীর ছাত্ররা তাঁর কাছে আইনের বক্তৃতা শুনল। কিন্তু অকস্মাৎ তাঁর মৃত্যুতে এ ব্যবস্থাও বানচাল হয়ে গেল। হিন্দু কলেজে আইনের অধ্যাপক পদ সৃষ্টি হল ১৮৫১ সনে। ১৮৫২ সনে এক খ্যাত ব্যারিষ্টারকে ঐ-অধ্যাপক পদে নিয়োগ করা হল। ১৮৫২-৫৩তে ৩০ জন ছাত্র তাঁর কাছে আইন পড়েছিল। তার মধ্যে ছজন পরীক্ষা দিয়ে ভালভাবে পাশ করেছিল। ১৮৫৪ সনের ডেসপ্যাচে বলা হল যে, উকিল ও মুন্সিফ্ হতে হলে "Attendance in certain lectures and the attainment of a degree in law" অত্যাবশ্যক।

ডেস্প্যাচের এই নির্দেশ স্মরণ করেই ১৮৫৭ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজে নিয়মিত আইনের ক্লাস খোলা হল। ১৮৬৪ সালে গভর্ণমেণ্ট হুগলী, ঢাকা, কৃষ্ণনগর ও বহরমপুর সরকারী কলেজে আইনের ক্লাস শুরু করবার সংকল্প করলেন।[৪৯]

১৮৫৭-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই আইন পড়বার ব্যাকুলতা বাঙালী স্নাতকদের পেয়ে বসল। আইন শাস্ত্রে ডিগ্রী থাকলে

জনজীবনে নানা ব্যাপারে কর্তাগিরি করা সহজ হয়। জনজীবনে সহজ প্রতিষ্ঠার এই প্রলোভনই বুদ্ধিমান বাঙালী স্নাতককে আইন চর্চায় আকৃষ্ট করেছিল।

১৮৬৮ সালে প্রসন্নকুমার ঠাকুর উইল করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের অধ্যাপকপদ সৃষ্টির জন্য মাসিক ১০০০ টাকার ব্যবস্থা করে গেলেন। এই উইল অনুসারে ১৮৭০ সালে আইনের ঠাকুর অধ্যাপক পদ সৃষ্টি হল এবং হার্বার্ট কাওয়েল প্রথম ঠাকুর আইন অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। যে সব প্রখ্যাত বঙ্গ সন্তান এ পদ অলংকৃত করেছেন, তাদের মধ্যে আছেন রাসবিহারী ঘোষ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, গোপালচন্দ্র সরকার, পণ্ডিত প্রাণনাথ সরস্বতী, সারদা চরণ মিত্র, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, এস. আর, দাস প্রভৃতি।[৩০/৩১]

১৮৮০ তে রাজসাহী সরকারী কলেজে আইনের ক্লাশ খোলা হয়। ১৮৮২ সনে মেট্রোপলিটন্ ইন্স্টিটিউসানে, ১৮৮৩ সনে সিটি কলেজে এবং ১৮৮৫ তে রিপন কলেজে আইনের ক্লাস খোলা হয়।

১৮৫৭ থেকে ১৮৮৭ এই ত্রিশ বছরের মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮৫৯ জন কলা বিষয়ে স্নাতকদের মধ্যে অন্ততঃ ৫৮১ জন আইনজীবী হয়েছিলেন।[৩২]

উনিশের শতকের শেষভাগে জাতীয় আন্দোলন দেশের উকিল বা আইনজ্ঞরাই পরিচালনা করতেন। দেশের লোক এ সব আন্দোলনের নামকরণ করেছিলেন 'উকিলরাজ'

১৯০২ সনে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন আইন চর্চার জন্য একটি কেন্দ্রীয় আইন মহাবিদ্যালয় স্থাপনের সুপারিশ করলেন। এ ব্যাপারে সবচেয়ে বিস্ময়ের কথা হচ্ছে যে আইন পড়া এবং উকিল হওয়ার জন্য বাঙালী যুবক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুরু থেকেই সবচেয়ে বেশী আগ্রহ প্রকাশ করে আসছিল, সেই আইনের অধ্যাপনা বিষয়টিই দেশে দীর্ঘকাল অবহেলিত থেকে গেল। একটী পুরোপুরি আইনের কলেজ স্থাপিত হয়েছিল ১৯০৮ সনে। এ সম্পর্কে ইতিহাস হচ্ছে নিম্নরূপ :—

আশুতোষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের কাছে লিখিত একটি মিনিটে বললেন—

"আমাদের আইন শিক্ষণ ব্যবস্থার আমূল সংস্কার অবিলম্বে প্রয়োজন। আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্র বা ইন্জিনিয়ারিং শিক্ষণের জন্য কলেজ আছে, কিন্তু

কেবলমাত্র আইন শাস্ত্র শিক্ষণের জন্য কোন কলেজ নেই।"৭৩

১৯০৮ এর ২১শে জুলাই সেনেটের সভায় আশুতোষের দুটি প্রস্তাব গৃহীত হল। সেই প্রস্তাব দুটি অনুসারেই আইন শিক্ষণ ব্যাপারে আদর্শ কলেজ হিসাবে "বিশ্ববিদ্যালয় আইন-কলেজ" প্রতিষ্ঠিত হল।

চিকিৎসা শাস্ত্র চর্চা

বাংলা দেশে পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসাবিদ্যার অধ্যয়ন অধ্যাপনার জন্য 'স্কুল ফর নেটিভ ডক্টরস্' খোলা হয়েছিল ১৮২৪ সনের ২৪শে অক্টোবর। সে সময় আয়ুর্বেদ শেখার ব্যবস্থা ছিল সংস্কৃত কলেজ এবং ইউনানি চিকিৎসা শেখানো হত কলকাতা মাদ্রাসায়। ১৮৩৩ সনে সংস্কৃত কলেজ এবং কলকাতা মাদ্রাসায় যথাক্রমে আয়ুর্বেদ ও ইউনানি পড়বার যে ব্যবস্থা ছিল বেন্টিঙ্ক তা রহিত করে দিলেন। ১৮৩৫ সনের ১লা ফেব্রুয়ারী থেকে পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিদ্যার চর্চার উদ্দেশ্যে কলকাতা মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হল। মেডিকেল কলেজে প্রথম দিকটায় হিন্দু ছাড়া মুসলমান ছাত্র পাওয়া গেল না। হিন্দুদের সংস্কার যে মৃতদেহ স্পর্শ করলেই অপবিত্র হতে হয়, প্রথম দিককার চারজন ছাত্র সে সংস্কার কাটিয়ে উঠলেন। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার বলেছেন (১৮৭২) রাজকৃষ্ণ দে হচ্ছেন প্রথম হিন্দু ছাত্র যিনি শব-ব্যবচ্ছেদ করেছিলেন। লোকমুখে অবশ্য এ কৃতিত্ব মধুসূদন গুপ্তকেই দেওয়া হয়ে থাকে।৭৪

১৮৩৯ সনে মেডিক্যাল্ কলেজের সম্পাদক ডাঃ ওয়াইজ (Dr. Wise) বাছাই করা ৮টি ছাত্রকে চিকিৎসা শাস্ত্র চর্চার জন্য ইউরোপ পাঠানোর প্রস্তাব করলেন। প্রথম দিকটায় কেউ বিলেত যেতে রাজী হল না। ১৮৪৪ সালে দ্বারকানাথ ঠাকুর দ্বিতীয়বার বিলাত যাচ্ছিলেন। তিনি দুটি ছাত্রের ব্যয় বহন করতে সম্মত হলেন। তিনটি ছাত্র তারপর বিলাত যেতে সম্মত হল। ডাঃ গুডিভ্ একটি ছাত্রের ব্যয় বইতে রাজি হলেন। গোপাল শীল হলেন চতুর্থ ছাত্র যিনি চিকিৎসা চর্চার উদ্দেশ্যে প্রবাস যাত্রার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। নবাব নাজিম তার জন্য ৪০০০্ টাকা ব্যয় করতে সম্মত হলেন। এঁরা ১৮৪৬ সনে কলেজ অফ্ সার্জনস্-এর ডিপ্লোমা পেলেন। তিনজন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, ডি ডিগ্রি পেলেন।

১৮৪৭ সনে সাবঅর্ডিনেট মেডিকেল সার্ভিস-এর জন্য দু'বছরের পাঠক্রম প্রচলিত হল মেডিকেল কলেজে। ডঃ ময়েট ও দেওয়ান রামকমল সেন

বাংলা ভাষায় চিকিৎসা শাস্ত্র পঠন-পাঠনের প্রস্তাব করলেন। বাংলা ভাষায় চিকিৎসা শাস্ত্র পড়ানো সুরু হল ১৮৫২-র ১৫ই জুন থেকে। বাংলা মেডিকেল ক্লাসের প্রথম ছাত্রদল সংখ্যায় ছিলেন ২১, ১৮৫৩ তে তাঁরা পরীক্ষা দিলেন।[৩৫]

কলিকাতা মেডিকেল কলেজ স্থাপনের পরে উল্লেখযোগ্য সরকারি প্রচেষ্টা হল ১৮৭৪ সনে ঢাকায় মেডিকেল স্কুল স্থাপন। ১৮৯৬ সনে ঢাকা মেডিকেল স্কুলের উন্নতিকল্পে তিন বছরের পাঠ্যসূচীকে চার বছরে বিস্তৃত করা হল এবং ইংরেজীর মাধ্যমে পাঠদানের ব্যবস্থা হল। ১৮৮৬ সনে কলকাতা মেডিকেল স্কুল স্থাপিত হল এবং ১৯০৩ সনে সেই বিদ্যালয়টি ক্যালকাটা কলেজ অব সার্জেনস্ এণ্ড ফিজিসিয়ানস এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে বেলগাছিয়ায় স্থানান্তরিত হল। এই প্রতিষ্ঠানটি পরে একটি বৃহৎ বেসরকারী মেডিকেল কলেজে পরিণত হয়েছিল। এরপর থেকে চিকিৎসা শাস্ত্রের স্নাতকদের জনপ্রিয়তা ও সম্মান দ্রুত বাড়তে লাগল এবং অনেক বাঙালী যুবক এদেশের পাঠ শেষ করে চিকিৎসা শাস্ত্রের কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হওয়ার জন্য বা ভারতীয় মেডিকেল সার্ভিসে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে ইউরোপে উচ্চতর শিক্ষার জন্য যেতে লাগল।

এ প্রসঙ্গে বাঙালী মেয়েদের চিকিৎসাশাস্ত্র চর্চা সম্পর্কে বলা প্রয়োজন। ১৮৮২ সনে শ্রীমতী অবলা দাস কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং মেডিক্যাল কলেজে পড়বার সংকল্প প্রকাশ করেন। সে সময় মেডিকেল কলেজ পরিচালনার ভার ছিল মেডিক্যাল কলেজ কাউন্সিলের উপর। শ্রীমতী অবলাদাসের প্রস্তাবে মেডিক্যাল কলেজ কাউন্সিল সম্মত হলেন না। নিরুপায় হয়ে পিতা দুর্গামোহন দাস কন্যাকে মাদ্রাজ মেডিক্যাল কলেজে পড়ানোর ব্যবস্থা করলেন।

১৮৮৩ সনে কাদম্বিনী বসু বেথুন কলেজ থেকে বি. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মেডিক্যাল কলেজে পড়বার সংকল্প প্রকাশ করেন। কলেজ কাউন্সিল পূর্বের মতই ছাত্রী গ্রহনে নারাজ হলেন। এই অসম্মতিতে বাঙালী সমাজে অসন্তোষ প্রকাশ পেতে লাগল।

এই সময় বঙ্গদেশের ছোটলাট ছিলেন স্যার রিভার্স টম্সন্। তাঁরই আদেশে মেয়েদের মেডিক্যাল কলেজে পড়বার সুযোগ হল। টম্সনের আদেশ একটি সরকারি সিদ্ধান্তের আকারে ১৮৮৩, ২৯শে জুন লিপিবদ্ধ হল।

এই সিদ্ধান্তে স্যার টম্‌সনের যুক্তিগুলি প্রণিধানযোগ্য।

টম্‌সন্ বললেন,—'যে সব ছাত্রী ডাক্তারী পড়তে চান, পরীক্ষায় ফেল করলে তাঁদেরই ক্ষতি, কিন্তু তাঁরা পাশ করলে সমাজেব প্রভূত লাভ। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে যাঁরা মেয়েদের ডাক্তারী পড়ার সপক্ষে, তাঁরা মেয়েদের এ বিষয়ে যে সাফল্য আশা করেন, তার চেয়ে অনেক বেশী সাফল্যের পরিচয় মেডিকেল ছাত্রীরা দেবেন এবং এমন দিন খুব দূরে নয় যখন কলকাতার হাসপাতালগুলি স্ত্রী ডাক্তারদের দ্বারা আংশিকভাবে পরিচালিত হবে।'

১৮৮৪ সনে ভার্জিনিয়া মেরী মিত্র এবং বিধুমুখী বসু মেডিকেল কলেজে ভর্তি হলেন। এরপর থেকে প্রায় প্রতি বছরেই মেডিকেল কলেজে ছাত্রী ভর্তি হতে লাগল।

রাণী স্বর্ণময়ী মেডিক্যাল কলেজের সীমার ভিতরেই একটি ছাত্রী নিবাসের জন্য দেড়লক্ষ টাকা দান করলেন। এ হোস্টেলে স্থানীয় এবং দূরাগতা ছাত্রীরা থাকবার সুযোগ পেলেন।

১৮৮৭–৮৮ থেকে কলকাতার ক্যাম্পবেল স্কুলেও ছাত্রী ভর্তিহতে লাগল।[৩৬]

বিজ্ঞান চর্চা

১৮১৩ র সনন্দে, ১৮৩৫ সনের ৭ই মার্চের সিদ্ধান্তে এবং পরবর্তী বিভিন্ন ডেসপ্যাচে ইংরেজ সরকার প্রদেশে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চার কথা বলেছেন। রাজা রামমোহন লর্ড আমহার্ষ্টকে লেখা পত্রেও (১১ই ডিসেম্বর, ১৮২৩) গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ণশাস্ত্র, শরীর সংস্থান বিদ্যা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান শিক্ষার কথা বলেছেন। কিন্তু এদেশের টোল ও মাদ্রাসায় চিরদিন চলেছে সাহিত্য সর্বস্ব পঠন পাঠন। মানবিক বিদ্যা চর্চার উপরে এই একমুখী গুরুত্ব দেওয়ায় ভারতবর্ষ আবহমানকাল থেকে অভ্যস্ত এবং এর ফলেই পাশ্চাত্য শিক্ষা যখন, এদেশে এল, তখন ইউরোপীয় সাহিত্য, দর্শন এবং ইতিহাসের চর্চাই সুরু হল, ইউরোপীয় বিজ্ঞানের চর্চা হল না।

১৮২৪ সনে হিন্দুকলেজে বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন সুরু হয়েছিল। লণ্ডনের ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি প্রচুর যন্ত্রপাতি ও বিজ্ঞানের বই পাঠালেন এবং সরকার একজন বিজ্ঞান অধ্যাপকের পদ মঞ্জুর করলেন। টাকশালের

অধ্যক্ষ (Mint Master) ভি, রস্‌ বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন ১৮২১ সনের জুলাই থেকে এবং যদিও একই পাঠ্যবস্তু বছরের পর বছর পুনরাবৃত্তি করা হল, তবু ছাত্রদের সত্যিকারের জ্ঞানোন্নতি তেমন হল না।[৯৭]

১৮৫৭ সনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল কিন্তু সেখানেও দীর্ঘকাল পরে ১৮৭২ সনে বি.এ. পরীক্ষার্থীদের জন্য বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচীর (বি, কোর্স) ব্যবস্থা হল। এ পাঠ্যসূচী অনুসারে প্রথম বি, এ পরীক্ষা নেওয়া হল ১৮৭৪ সনে। এই পাঠ্যসূচীতে ছিল রসায়ণ, প্রাকৃতিক ভূগোল এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের অন্তর্গত ঐচ্ছিক বিষয়গুলির মধ্যে যে কোন দুটি।[৯৮]

এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি. এস. সি (B.Sc.) পাঠ্যক্রম প্রবর্ত্তিত হয়েছিল ১৯০৫ সনে। ১৮৩৫ সনে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হয়েছিল এবং বহুবৎসর পর্যন্ত বঙ্গদেশে কেবল চিকিৎসা বিদ্যার স্নাতক এবং লাইসেন্স প্রাপ্তরাই বিজ্ঞান-জানা মানুষ বলে পরিগণিত হয়েছিল। ১৮৭০ সনে প্রখ্যাত চিকিৎসক মহেন্দ্রলাল সংকার লিখলেন মেডিক্যাল স্কুলগুলির কথা বাদ দিলে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞানের পূর্ণাঙ্গ তথা ব্যবহারিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা নেই।[৯৯]

ডাঃ সরকারের এ মন্তব্যে 'এশিয়াটিক সোসাইটি'র কথা স্বভাবতই মনে আসে। ১৭৮৪ সনে কলকাতায় এই সোসাইটি স্থাপন করেছিলেন স্যার উইলিয়াম জোনস্‌। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী এটি বিদেশীদের দ্বারাই পরিচালিত হয়েছিল। ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর বাংলাদেশের ইতিহাসে (৩য় খণ্ড) বলেছেন—

"ভারতের প্রাচীন সাহিত্য ইতিহাস সাংস্কৃতি এবং আধুনিক বিজ্ঞানের প্রায় সকল বিভাগে আধুনিক প্রণালীতে চর্চা ও গবেষণার পথ উন্মুক্ত করিয়া ইহা ভারতে এক নবযুগ আনয়ন করিয়াছে বলিলে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি হইবে না। প্রথম ৪০/৫০ বছর বিদেশীরাই ইহার পরিচালনা করিত। কোন ভারতবাসী ইহার সদস্য ছিল না। তারপর ক্রমে ক্রমে বহু ভারতবাসী ইহাতে যোগদান এবং ইহার উন্নতি বিধান করেন।"[100]

এই এশিয়াটিক সোসাইটিতেই ১৮৯৫ সনে জগদীশচন্দ্র বসু 'Polarisation of electric ray by crystals' শীর্ষক প্রবন্ধ পড়েছিলেন। এর অল্প পরে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় Mercurous Nitrate সম্পর্কে প্রবন্ধ পড়ে বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

আচার্য জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্রের ঐ খ্যাতিই সেদিন বাঙালী জাতিকে বিজ্ঞান চর্চায় প্রচণ্ডভাবে উদ্দীপ্ত করেছিল। ডাঃ সরকার 'ক্যালকাটা জার্নাল অব মেডিসিন' পত্রিকার ১৮৬১ সনের আগষ্ট সংখ্যায় **'On the desirability of a National Institution for the cultivation of Science by the natives of India'** শীর্ষক প্রবন্ধে লিখলেন, 'আমরা এমন একটি প্রতিষ্ঠান চাই যাতে রয়েল ইনস্‌টিটিউসন অব লণ্ডন' এবং 'বৃটিশ অ্যাসোসিয়েসন্স ফর দ্য আড্‌ভান্সমেণ্ট অব সায়েন্স'—এই দুটি প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমের সমন্বয় ঘটবে। জনগণের (masses) শিক্ষার জন্য আমরা এই ধরণের একটি প্রতিষ্ঠান চাই। প্রতিষ্ঠানে বৈজ্ঞানিক বিষয়ে নিয়মিত বক্তৃতার ব্যবস্থা থাকবে এবং বক্তারাও শুধু বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যাছলে এক্সপেরিমেণ্ট বা পরীক্ষা সম্পাদন করবেন না, শ্রোতাদেরও আহ্বান করে ঐ সব পরীক্ষা পদ্ধতি শেখানো হবে। প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানটি পুরোপুরি দেশবাসীর দ্বারাই পরিচালিত হবে।[101]

ডাঃ সরকারের প্রবন্ধ বঙ্গদেশে সাড়া এনেছিল এবং এ সাড়ায় উৎসাহিত বোধ করে তিনি 'হিন্দু পেট্রিয়েটে' (জানুয়ারীতে ১৮৭০) তাঁর প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের গঠন ও পরিচালনা সম্পর্কে একটি খসড়া প্রকাশ করলেন। এরপর ডাঃ সরকার তাঁর সমগ্র উৎসাহ দিয়ে প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের জন্য অর্থ সংগ্রহে মন দিলেন। কলকাতার গণ্যমান্য শিক্ষাবিদ্‌রা ডাঃ সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্য করলেন এবং বাংলা ও বাংলার বাইরের রাজা মহারাজারা প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ডাঃ সরকারকে অর্থ সাহায্য করলেন। এইভাবে ডাঃ সরকার ১৮৭৫ সনের মধ্যে ৮০,০০০ হাজার টাকা তুললেন। ১৮৭৬ সনের ২১ শে জানুয়ারী বাংলার ছোটলাট লর্ড রিচার্ড টেম্পল্ ডাঃ সরকারের প্রস্তাবিত 'অ্যাসোসিয়েসন্ ফর দি কালটিভেসন্ অব সায়েন্স' প্রতিষ্ঠার জন্য দেশে যে প্রচেষ্টা হয়েছে তার সুখ্যাতি করলেন এবং সরকারী সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। তারপর ২১০ নং বৌবাজার স্ট্রীটের বাড়ীটি কিনে সরকার এসোসিয়েশনকে বাড়ীটি অর্পণ করলেন।

এইভাবে ১৮৭৬ সনের ২৯শে জুলাই স্যার রিচার্ড টেম্পলের সভাপতিত্বে অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা উৎসব সম্পন্ন হল। এসোসিয়েশনের গোড়ার দিকে কলকাতার খ্যাত বৈজ্ঞানিকদের দিয়ে বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু গবেষণার কোন কাজ বহুদিন অ্যাসোসিয়েশন করতে

পারেনি। এর কারণ হল গবেষণার জন্য উপযুক্ত বৈজ্ঞানিকের অভাব। দ্বিতীয়তঃ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কেনার জন্য অর্থের অভাব। প্রথমদিকটায় ডাঃ সরকার নিজে তারপর ফাদার লাফো (সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের অধ্যক্ষ) এবং পরে ডাঃ তারা প্রসন্ন রায়, জগদীশ চন্দ্র বসু, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, নীলরতন সরকার, চুনীলাল বসু, রজনীকান্ত সেন, রামচন্দ্র দত্ত, মহেন্দ্রনাথ রায়, প্রমথনাথ বসু, শ্রী বি, এল চৌধুরী, ডাঃ অমৃতলাল সরকার, এবং শ্রী গিরিশচন্দ্র বসু প্রমুখ বিজ্ঞানবিদ্ বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

১৯০৫ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যখন পৃথকভাবে বিজ্ঞানের পাঠ্যক্রম প্রবর্তিত করলেন তখন থেকেই অ্যাসোসিয়েশন বিজ্ঞান সম্পর্কিত বক্তৃতার ব্যবস্থা ক্রমে ক্রমে রহিত করে দিলেন।

বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই অ্যাসোসিয়েশন্ একান্তভাবে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় মনঃসংযোগ করলেন। ১৯০২ সনে সরসীলাল সরকার **Crystalline copper ferrocyanide** নিয়ে কিছু গবেষণা করলেন। ১৯০৬ সন থেকে অ্যাসোসিয়েশন্ দৈনিক দুবার করে আবহাওয়া সংবাদ লিপিবদ্ধ করে দৈনিক পত্রে ঐ আবহাওয়া বার্তা নিয়মিত প্রকাশ করতে লাগলেন। তাছাড়া ডাঃ চুনীলাল বসুর পরিচালনায় খাদ্যের রাসায়নিক বিশ্লেষণের কাজও কিছুদিন চলেছিল। এই সঙ্গে কয়েকটি রাসায়নিক সমস্যা সম্পর্কে অনুসন্ধান করেছিলেন ডাঃ রসিকলাল দত্ত এবং তাঁর দু'জন সহকারী গবেষক। ১৯০৭ সনে অ্যাসোসিয়েশনে নতুন এক প্রাণশক্তির সঞ্চার হল। ভারত সরকারের অর্থ বিভাগের কর্মচারী সি. ভি রমণ অ্যাসোসিয়েশনের গবেষণাগারে **acoustics** সম্পর্কে গবেষণা সুরু করলেন।

শ্রীরমনের গবেষণা-স্থল হিসাবে অ্যাসোসিয়েশন অচিরেই প্রাচ্যের গবেষণা কেন্দ্রগুলির শীর্ষস্থানীয় বলে পরিগণিত হল, প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন অনেকটা সফল হল[101a]

বাঙালীর বিজ্ঞান-চর্চা প্রসঙ্গে বাঙালী লেখকদের বিজ্ঞান-গ্রন্থ রচনা সম্বন্ধে নিচে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানগ্রন্থ প্রকাশের সূত্রপাত করেছিলেন 'কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি।' মে সাহেবের গণিত (১৮১৭), পিয়ার্সের ভূগোল বৃত্তান্ত (১৮১৯), ফেলিক্স্ কেরীর বিদ্যাহারাবলী (১৮২০), লোসনের

পশ্বাবলী (১৮২৮), এবং ইয়েট্‌স্‌-এর জ্যোতির্বিদ্যা (১৮৩৩)-এ সবই স্কুল বুক সোসাইটির দ্বারা প্রকাশিত এবং গ্রন্থকার প্রতিক্ষেত্রেই ইউরোপীয়। এদেশীয়দের মধ্যে বিজ্ঞান গ্রন্থ রচনায় সর্বপ্রথম উদ্যোগী হয়েছিলেন রামমোহন রায়। তিনি জ্যাগ্রাহী নামে ইংরেজী ও বাংলায় একটি ভূগোল লেখেন। এছাড়া তিনি জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক একখানি বই (ভূগোল) ও একটি জ্যামিতিও লিখেছিলেন।[102]

অক্ষয়কুমার দত্তই প্রথম বাঙালী যিনি বাংলা ভাষার মাধ্যমে ইউরোপীয় বিজ্ঞানকে বাংলার জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেন। সরল ও সরস বালকপাঠ্য রচনার মধ্য দিয়ে অক্ষয়কুমার বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যকে সে যুগে জনপ্রিয় করেছিলেন। চারুপাঠের রচনাগুলি এর নিদর্শন। অক্ষয়কুমারের সর্বশেষ বিজ্ঞান গ্রন্থ 'পদার্থ বিদ্যা' ১৮৫৬ সনে প্রথম প্রকাশিত হয়। বাংলায় সুপরিকল্পিত ভাবে পদার্থ বিজ্ঞান লিখবার সার্থক প্রয়াস এই গ্রন্থেই প্রথম পাওয়া গেল। তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার জন্য যে 'পদার্থবিদ্যা' লেখা হয়েছিল এ বইটি তারই পরিবর্ধিত সংস্করণ।[103]

রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়এর বিজ্ঞানের প্রতি বরাবরই অনুরাগ ছিল। বিজ্ঞানের দুটি বিষয় নিয়ে কৃষ্ণমোহন আলোচনা করেছেন। একটি জ্যামিতি, অপরটি ভূগোল। এই উভয় বিষয় নিয়েই আলোচনা তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'বিদ্যাকল্পদ্রুমের' অন্তর্গত। তের কাণ্ডে বিভক্ত বিদ্যাকল্প-দ্রুমের বিভিন্ন খণ্ডগুলি ১৮৪৬ থেকে ১৮৫১ সন মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল।[104]

বিদ্যাসাগরের বিশ্রুত গ্রন্থ 'বোধোদয়' (শিশুশিক্ষা চতুর্থভাগ) ১৮৫১ সনে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির বেশীরভাগই-প্রকৃতিবিজ্ঞান সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা। 'বোধোদয়' রচিত হয়েছিল মুখ্যত 'চেম্বার্স রুডিমেণ্টস্‌ অব্‌ নলেজ' গ্রন্থের অনুসরণে।[105]

রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যের অন্যতম রূপকার। 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' রহস্য সন্দর্ভ প্রভৃতি সাময়িক পত্রকে কেন্দ্র করে বিজ্ঞানের ভাষায় সরসতা সৃষ্টি বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যে রাজেন্দ্রলালের উল্লেখযোগ্য কীর্তি। বাংলা সাহিত্যে রাজেন্দ্রলালের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অবদান ভূগোল বিজ্ঞানে। রাজেন্দ্রলালের 'প্রাকৃত ভূগোল অর্থাৎ ভূমণ্ডলের নৈসর্গিকবস্তু বর্ণনা বিষয়ক গ্রন্থ' ১৮৫৪ সনে প্রথম প্রকাশিত হয়।

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বিজ্ঞানগ্রন্থ এবং গ্রন্থকারের

নাম হচ্ছে 'বাষ্পীয় কল ও ভারতীয় রেলওয়ে (১৮৫৫) এবং ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ (১৮৫৫) কালিদাস মৈত্র; রসায়ন—যাদবচন্দ্র বসু (১৮৭৮)। ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরীর 'মানব প্রকৃতি' প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড যথাক্রমে ১৮৮৩ ও ১৮৮৫ সনে প্রকাশিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে রচিত নৃতত্ত্ব বিষয়ক একমাত্র উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে এই 'মানব প্রকৃতি'।

বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর অবদান অনন্য সাধারণ। রামেন্দ্রসুন্দরের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ ক্ষমতা ও চিন্তার মৌলিকতা বাংলা বিজ্ঞান সাহিত্যে একক এবং অভিনব। রামেন্দ্রসুন্দরের প্রথমগ্রন্থ 'প্রকৃতি' (১৮৯৬)। এই গ্রন্থে রামেন্দ্রসুন্দর ডারউইন্, কেলভিন্, হাক্সলী প্রভৃতির মতবাদ আলোচনা করেছেন। 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থে (১৯০৪) রামেন্দ্রসুন্দর জগৎরহস্য ভেদ করতে গিয়ে বিজ্ঞান থেকে দর্শনে এবং দর্শন থেকে বিজ্ঞানে বারবার গতায়াত করেছেন।

সামগ্রিক শিক্ষাচিন্তার প্রতিনিধি রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা উনিশের শতকের শেষপাদ থেকে বিশশতকের শেষপাদ পর্যন্ত প্রসারিত এবং নানাভাবে ভারতীয় শিক্ষাচিন্তাকে প্রভাবিত করেছে। যে সময়সীমায় আমাদের শিক্ষা আলোচনা সীমাবদ্ধ সেকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষাচিন্তার গভীরতা বিশালতা ও বাস্তববোধের গুণে অনন্য এবং একক। এই কারণে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা ও প্রচেষ্টার সামগ্রিক পূর্ণাঙ্গ আলোচনার জন্য একটি পৃথক অধ্যায় প্রয়োজন।

১৮৮৩ থেকে ১৯০১ সন পর্যন্ত বাঙালীর শিক্ষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য ছিল বঙ্গবিদ্যালয়ে দেশ ছেয়ে গিয়ে বাংলা ভাষার যোগে সমস্ত শিক্ষা ব্যপ্ত হয়ে পড়ুক। ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে ইংরেজ প্রবর্তিত পাশ্চাত্য শিক্ষা আমাদের পক্ষে যে করুণ অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে তার সবিস্তার বর্ণনা তিনি দিয়েছেন। 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে (১৮৯২) তিনি বলেছেন 'আমরা যে ভাবে জীবন নির্বাহ করিব আমাদের শিক্ষা তাহার অনুপাতিক নহে; আমরা যে গৃহে আমৃত্যুকাল বাস করিব সে গৃহের উন্নত চিত্র আমাদের পাঠ্যপুস্তকে নাই; যে সমাজের মধ্যে আমাদিগকে জীবনযাপন করিতে হইবে সেই সমাজের কোন উচ্চ আদর্শ আমাদের নূতন শিক্ষিত সাহিত্যের মধ্যে লাভ করিনা......এই রূপে আমাদের শিক্ষার সহিত

জীবনের গৃহবিচ্ছেদ ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠে। প্রতি মুহূর্তে পরস্পর পরস্পরকে সুতীব্র পরিহাস করিতে থাকে এবং অসম্পূর্ণ জীবন ও অসম্পূর্ণ শিক্ষা লইয়া বাঙালীর সংসারযাত্রা দুইই সঙের প্রহসন হইয়া দাঁড়ায়।' এ প্রবন্ধে তিনি আরও বলেছেন—'আমাদের এই শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্য সাধনই এখনকার দিনের সর্বপ্রধান মনোযোগের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে! কিন্তু এ মিলনকে সাধন করিতে পারে—বাংলাভাষা, বাংলা সাহিত্য।'[106]

এরপরে ১৯০১ সনে তিনি শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার আট বছর পরে 'তপোবন' প্রবন্ধে (বাং ১৩১৩ সাল) তিনি ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূলে যে চিন্তাধারা কাজ করেছে তা ব্যক্ত করেন। এই প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—'কেবল ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা নয়, কেবল জ্ঞানের শিক্ষা নয়, বোধের শিক্ষাকে আমাদের বিদ্যালয়ে প্রধান স্থান দিতে হবে।' এই প্রবন্ধে তিনি আরও বলেছেন যে সত্যে ভারতবর্ষ আপনাকে আপনি নিশ্চিন্তভাবে লাভ করতে পারে, সে সত্যটি কি? সে সত্য প্রধানতঃ বনিগ্‌বৃত্তি নয়, স্বারাজ্য নয়, স্বাদেশিকতা নয়, সে সত্য বিশ্বজাগতিকতা।'[107]

ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার সময় দেখছি রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতের তপোবন শিক্ষার মাহাত্ম্যে আচ্ছন্ন হয়ে গেছেন। কিন্তু পরে পরে নিজেকে নিয়ে, পরিবেশকে নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে বাঙালী, ভারতবাসী তথা বিশ্বমানবের শিক্ষা সম্পর্কে এক অতি বাস্তব ও সার্থক চিন্তায় তিনি পৌঁচেছেন।

তিনি নিজের ছাত্রজীবনে দেখেছেন এ দেশে প্রচলিত শিক্ষার ব্যর্থতা, দেখেছেন এ শিক্ষা শিক্ষার্থীর দেহমনচরিত্র কিছুই সার্থকভাবে গঠন করিতে পারে না, এ শিক্ষা ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধনে ব্যর্থ, এমনকি শিক্ষার মাধ্যম বিদেশী ভাষা হওয়াতে শিক্ষার্থীর আত্মপ্রকাশেও এই শিক্ষা সহায়তা করে না।

শান্তিনিকেতনে আশ্রমবিদ্যালয় পরিচালনার সময় তাঁর শিক্ষাচিন্তাকে সর্বপ্রকার ভাববিলাসিতা থেকে মুক্ত করে একেবারে বাস্তবের দৃঢ় ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছিল। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য উপযুক্ত পাঠক্রম, পাঠ্যপুস্তক, সার্থক পাঠন প্রণালী এবং সর্বোপরি যোগ্য শিক্ষক—যে গুলির সমন্বয়ে শিক্ষা সজীব ও ফলপ্রসূ হয়ে উঠতে পারে, সেগুলি সম্পর্কে তাঁকে

অনুপুঙ্খ ভাবে ভাবতে হয়েছিল। নিজের বিদ্যালয় পরিচালনার সময় তিনি বুঝে ছিলেন, যে শিক্ষা শিক্ষার্থীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক হিতসাধন করতে পারে না, সে শিক্ষা অসম্পূর্ণ। শিক্ষার্থীর অর্থনৈতিক হিতসাধনের উদ্দেশ্যে তিনি 'উদ্যোগ শিক্ষা'কে শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর এই চিন্তা থেকেই শ্রীনিকেতনের জন্ম। ১৯১৯ সালে মাদ্রাজে জাতীয় শিক্ষা উন্নয়ন সমিতির উদ্যোগে যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তা 'The centre of Indian culture' নামে সুপরিচিত, এই ভাষণে তিনি বলেছেন—Our centre of culture should not only be centre of the intellectual life of India, but the centre of her economic life also. It must cultivate land breed cattle to feed itself and its students, it must produce all necessaries, devising the best means and using the best materials calling science to its aid. Its very existence should depend upon the success of its industrial ventures carried out on the co-operative principle, which will unite the teachers and students in a living and active bond of necessity. This will give us also practical training whose motive force is not the greed of profit.[১০৪]

অর্থাৎ আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র কেবলমাত্র বিদ্যাবুদ্ধির কেন্দ্র হলে চলবে না। সে কেন্দ্রকে অর্থনৈতিক জীবনের কেন্দ্র হতে হবে। এ কেন্দ্রে চাষবাস, গোপালন প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকবে, বিভিন্ন প্রয়োজনীয় দ্রব্য এ কেন্দ্রে উৎপন্ন বা প্রস্তুত হবে। সর্বোত্তম পন্থায় সর্বোত্তম দ্রব্য ব্যবহার করে বিজ্ঞানের সহায়তায় এই উৎপাদন কার্য সম্পন্ন হবে। সমবায় নীতিতে দ্রব্য উৎপাদন প্রচেষ্টার উপরই এই কেন্দ্রের অস্তিত্ব নির্ভর করবে এবং এই উৎপাদন প্রচেষ্টার প্রয়োজনের সক্রিয় বন্ধনে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের আবদ্ধ করবে। এ কেন্দ্রে শিক্ষার্থীরা হাতেনাতে শ্রমশিল্পে শিক্ষিত হবে এ শিক্ষার পিছনে লাভের লোভ থাকবে না।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার এই বিশেষ দিকটি সম্পর্কে বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে বলছেন—মানুষের মনের বিকাশকে বড় করে দেখলেও রবীন্দ্রনাথ অর্থনৈতিক দিকটাকে একেবারে গৌন মনে করেন নি। কেননা সমাজে বাস করে মানুষ যদি ব্যবহারিক সুযোগ সুবিধা

না পেল, তাহলে জীবনের পূর্ণতা আসবে কি করে? শিক্ষাই অর্থাৎ 'আধিভৌতিক রাজ্যের বিদ্যা'ই এই সুযোগ এনে দেবে। তখন সমাজ সংস্কারের সঙ্গে মনের পূর্ণতা যুক্ত হয়ে প্রকৃত দেশোন্নতি সম্ভবপর হবে।*** চিত্তের ঐশ্বর্য আর সংস্কৃতির অনুরাগী বলে তিনি যে মানুষের ব্যবহারিক কৃতিত্ব অর্জনকে উপেক্ষা করেছিলেন, একথা মোটেই সত্য নয়। সংস্কৃতি হল শিক্ষার প্রধান ও উচ্চতর লক্ষ্য। কিন্তু তার নিম্ন অথচ প্রথম লক্ষ্য হচ্ছে, ঐ ব্যবহারিক সুযোগ লাভ।'[109]

এই চিন্তার পরেও রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা থেমে থাকেনি। তিনি দেখেছেন ব্যক্তির সম্পর্কতো শুধু তার পরিবার, সমাজ ও স্বজাতির (nation) সঙ্গে নয়, তার সম্পর্ক বিশ্বমানবের সঙ্গে। সে বেড়ে ওঠে বিশ্বমানবের অংশভাক্ হিসেবে। এই যে শেষ পর্যন্ত বিশ্বমানবের একজন হিসেবে বেড়ে ওঠা,—এটাসার্থক করবার দায়িত্ব শিক্ষার। কিন্তু যে দেশে সে ভূমিষ্ট হয়েছে যেখানে তার দেহ মনের পুষ্টি ও বৃদ্ধি ঘটেছে, সেই মাতৃভূমির মূল্যবোধগুলির আত্মীকরণ (assimilation) ব্যতীত সে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হতে পারে না। এজন্যই অত্যাবশ্যক ইতিহাসবোধ বা ইতিহাস চেতনা এবং এই ইতিহাস হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'স্বদেশের একখানি সম্পূর্ণ ইতিহাস'। রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'যে সকল দেশ ভাগ্যবান্ তাহারা চিরন্তন স্বদেশকে দেশের ইতিহাসের মধ্যেই খুঁজিয়া পায়। বাল্যকালে ইতিহাসই দেশের সহিত তাহাদের পরিচয় সাধন করাইয়া দেয়। আমাদের ঠিক তাহার উল্টা। দেশের ইতিহাসই আমাদের স্বদেশকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।'[110]

রবীন্দ্রনাথ আবার বলছেন, 'এই স্বদেশী প্রণালীর শিক্ষার প্রধান ভিত্তি অধ্যয়ন্-অধ্যাপনারত নিষ্ঠাবান্ গুরু এবং তাঁহার প্রধান অবলম্বন স্বদেশের একখানি সম্পূর্ণ ইতিহাস।'[111]

এই যে স্বদেশের একখানি সম্পূর্ণ ইতিহাস—এ সম্পর্কে বোধ শুধু পুঁথির মাধ্যমে হতে পারে না। পুঁথিলব্ধ জ্ঞানকে পরীক্ষা করে যাচাই করে এ বোধের উন্মেষ সম্ভব। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে ভারতবর্ষের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি যা উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা পেয়েছি তার সম্যক উপলব্ধি হতে পারে যদি শিক্ষার্থী চেষ্টা করে ভারতের সত্য ইতিহাস পুনরাবিষ্কার করতে পারে। এ ইতিহাস, ঔপনিবেশিক শাসন আমাদের যে-ইতিহাস রচনা ও

পরিবেশন করেছে, সে ইতিহাস নয়।

শিক্ষানায়ক রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—স্বদেশ সম্পর্কে নানা তথ্যের সন্ধান ও সংগ্রহ করতে হবে, সে সব তথ্য যাচাই করতে হবে, এবং স্বদেশ-ইতিহাসের এই সব সংগৃহীত তথ্য স্বদেশবাসীর আত্মগঠন ও আত্মোন্নয়নের স্বার্থে ব্যবহার করতে হবে।

শিক্ষার এই বিশেষ পদ্ধতি, এই সন্ধান, যাচাই ও সংগ্রহ, এই ক্ষেত্রচর্চা বা স্থানিক তথ্যানুসন্ধান (field work)—একেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'স্বাধীন শিক্ষা'।

শিক্ষার এই পদ্ধতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সবিস্তার আলোচনা করেছেন 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ' প্রবন্ধে (১৯০৫)। ঐ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলছেন—'স্বদেশকে মুখ্যভাবে সম্পূর্ণভাবে আমাদের জ্ঞানের আয়ত্ত না করিবার একটা দোষ এই যে, স্বদেশের সেবা করিবার জন্য আমরা কেহ যথার্থভাবে যোগ্য হইতে পারি না।

***'আমাদের অধিকাংশ শিক্ষা যে সকল দৃষ্টান্ত আশ্রয় করে তাহা আমাদের দৃষ্টিগোচর নহে। আমরা ইতিহাস পড়ি—কিন্তু যে ইতিহাস আমাদের দেশের জনপ্রবাহকে অবলম্বন করিয়াই প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে, যাহার নানা লক্ষণ, নানা স্মৃতি আমাদের ঘরে বাহিরে নানা স্থানে প্রত্যক্ষ হইয়া আছে, তাহা আমরা আলোচনা করিনা বলিয়া ইতিহাস যে কী জিনিস তাহার উজ্জ্বল ধারণা আমাদের হইতেই পারে না। আমরা ভাষাতত্ত্ব মুখস্থ করিয়া পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করি, কিন্তু আমাদের নিজের মাতৃভাষা কালে কালে প্রদেশে প্রদেশে কেমন করিয়া যে নানা রূপান্তরের মধ্যে নিজের ইতিহাস প্রত্যক্ষ নিবদ্ধ রাখিয়াছে, তাহা তেমন করিয়া দেখিনা বলিয়াই ভাষার রহস্য আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হইয়া উঠে না। এক ভারতবর্ষে সমাজ ও ধর্মের যেমন বহুতর অবস্থা বৈচিত্র আছে, এমন বোধ হয় আর কোন দেশে নাই। অনুসন্ধানপূর্বক, অভিনিবেশপূর্বক সেই বৈচিত্র আলোচনা করিয়া দেখিলে সমাজ ও ধর্মের বিজ্ঞান আমাদের কাছে যেমন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে, এমন দূরদেশের ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় বই পড়িবামাত্র কথনো হইতেই পারে না।

***আমরা নৃতত্ত্ব অর্থাৎ 'এথ্‌নলজির' বই যে পড়িনা তাহা নহে। কিন্তু যখন দেখিতে পাই, সেই বই পড়ার দরুন আমাদের ঘরের পাশে যে হাড়ি,

ডোম, কৈবর্ত, পোদ, বাগ্দি রহিয়াছে তাহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবার জন্ম আমাদের লেশমাত্র ঔৎসুক্য জন্মে না, তখনই বুঝিতে পারি, পুঁথি সম্বন্ধে আমাদের কত বড়ো একটা কুসংস্কার জন্মিয়া গেছে—পুঁথিকে আমরা কত বড়ো মনে করি এবং পুঁথি যাহার প্রতিবিম্ব তাহাকে কতই তুচ্ছ বলিয়া জানি।[112]

উপরের আলোচনায় দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা পুরোপুরি সমাজভিত্তিক। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন মানুষ প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ সামাজিক জীব। তাছাড়া আমাদের ভারতবর্ষে ব্যক্তিজীবনের উপর সমাজের প্রভাব অপরিসীম। এদেশে সমাজই ব্যক্তিজীবনকে লালন করছে, শাসন করছে, সর্বোপরি তাকে বিকাশের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। একজন ভারতীয়ের জীবনে সমাজের অমোঘ ভূমিকা অনমুকরণীয়, দৃঢ় সংবদ্ধ ভাষায় প্রকাশ করেছেন ভারতের প্রখ্যাত 'সমাজবিজ্ঞানী' অধ্যাপক ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়। একজন ভারতীয়ের সঙ্গে তার সমাজের নিবিড় সম্পর্ক সম্বন্ধে তিনি বলেছেন...**living comprehends knowing that for an Indian, this business of living is primarily Indian living, which in its turn is essentially social living, that is, living in groups through stages of growth, until one is to be so socialised that freedom will have become coterminous with existence and institutions turned into agencies of growth.**[113]

অর্থাৎ বাঁচতে হলেই জানতে হবে, একজন ভারতীয়ের এই বাঁচা মানে ভারতীয়ভাবে বাঁচা, যার অর্থ সামাজিক জীব হিসেবে বাঁচা, অর্থাৎ জীবন বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে গোষ্ঠী বা সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে বাঁচা। এ বাঁচা সার্থক হবে যখন সে এতটা সামাজিক (socialised) হয়ে উঠবে যে তার অস্তিত্ব ও তার স্বাধীনতা সমার্থক হয়ে যাবে, যখন সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি তার বিকাশের সহায়ক রূপে পরিণত হবে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর এক বিশিষ্ট চিন্তা দিয়েই বুঝেছিলেন জাতিগঠন করতে হলে, সমাজগঠন করতে হবে, জাতির সব সমস্যা ও অধোগতির মূলে আছে অধঃপতিত সমাজ ব্যবস্থা। আর এই সমাজগঠন করতে হলে প্রয়োজন ব্যক্তির দেহ মন ও তার অন্তর্নিহিত মানব ধর্মের প্রকৃত উন্মেষকারিণী স্বাধীনশিক্ষা। এই স্বাধীনশিক্ষার ব্যবস্থা করেই লেনিনের রাশিয়া অতি

অল্পকাল মধ্যে আমাদের ভারতীয় জনসাধারণের মত নিঃসহায় নিরক্ষর অধিবাসীদের মনুষ্যত্বে সম্মানিত করতে পেরেছিল। 'রাশিয়ার চিঠিতে' রবীন্দ্রনাথ বলছেন—'আমরা শ্রীনিকেতনে যা করতে চেয়েছি এরা সমস্ত দেশ জুড়ে প্রকৃষ্টভাবে তাই করছে।'[114]

বলেছেন, 'অশিক্ষা ও অবমাননার নিম্নতম তল থেকে আজ কেবলমাত্র দশবৎসরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে এরা শুধু ক, খ, গ, ঘ শেখায়নি, মনুষ্যত্বে সম্মানিত করেছে'[115]

পাদটীকা

(১৮৮২-১৯০৩)

ইংরেজী শিক্ষার প্রসার

1. N. K. Sinha—*History of Bengal (1757–1905) P. 448.*

প্রাথমিক শিক্ষা

2. *Report of Indian Education Commission, Evidence before Bengal Provincial Committee. P. 245.*
3. ঐ পৃ: ৩৬৩
4. ঐ পৃ: ৩৬৩
5. ঐ পৃ: ২৩৩
6. ঐ পৃ: ৩২৯-৩৩২
7. ঐ পৃ: ২৯৪
8. N. K. Sinha—*History of Bengal (1757–1905) P. 445.*

স্ত্রী শিক্ষা

9. শিবনাথ শাস্ত্রী—আত্মজীবনী, সিগনেট সং, ১৩৫৯, পৃ: ১১৪
10. পরিচারিকা, বৈশাখ ১২৮৯ (যোগেশ বাগল—স্ত্রীশিক্ষার কথা ১৯৬৭ সং, পৃ: ৩০-৩১ দ্র:)
11. যোগেশ চন্দ্র বাগল—স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলনে কেশব চন্দ্র সেন, প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭

রবীন্দ্রনাথ [শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম-পূর্বযুগ]

12. ভারতী, ১২৯০, কার্তিক, পৃঃ ২৯৩
13. শিক্ষার হেরফের, সাধনা, পৌষ ১২৯৯

14. *Calcutta University Minutes for 1891-92 P. 56-58* (প্রবোধ চন্দ্র সেন, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা পৃঃ ১৪ দ্রঃ)

15. সাধনা, ১২৯৯ চৈত্র পৃঃ ৪৪৪

16. সাধনা, ১৩০০ আষাঢ়, পৃঃ ১৯৬-৯৭

17. সাধনা, ১৩০০ আষাঢ়, পৃঃ ১৯৭

ব্রাহ্মসমাজের নেতৃস্থানীয়দের শিক্ষাচিন্তা

18. Jogananda Das—*The Brahma Samaj (Studies in the Bengal Renaissance etd. by* Atul Gupta, *P. 503*

19. শিবনাথ শাস্ত্রী—আত্মচরিত পৃঃ ১৬৪

20. ঐ পৃঃ ১৯৬

21. শিবনাথ শাস্ত্রী—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ পৃঃ ১২৫

22. Jogananda Das—*The Brahma Samaj (Studies in Bengal Renaissance etd. by* Atul Gupta *P. 503-4* দ্রঃ)

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

23. Sir Gooroodas—*Centenary Commemoration Volume, Cal. University P. 13–14.*

24. ঐ পৃঃ ৪০

25. ঐ পৃঃ ৪০-৪১

26. ঐ পৃঃ ৪৯

27. ঐ পৃঃ ৫১-৫২

28. ঐ পৃঃ ৫৩

29. ঐ পৃঃ ৫৪

30. ঐ পৃঃ ৬৬-৬৭

31. ঐ পৃঃ ৬৭

বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তা

Complete Works of Vivekananda Vol, III P.301–302.

33. কর্মযোগ ২১ সং, পৃঃ ২-৩
34. জ্ঞানযোগ ১৭শ সং, পৃঃ ৪১৫-৫১৬
35. *Complete works of Vivekananda Vol. III P. 246*
36. ঐ, পৃঃ ২৪৭
37. রাজযোগ ১৪শ সং, পৃঃ ১১
38 ঐ পৃঃ ২৫৪
39. স্বামি-শিষ্য সংবাদ ১১ সং পূর্ব খণ্ড পৃঃ ৬৭
40. দেববাণী ষষ্ঠ সং, পৃঃ ১৬১
41. রাজযোগ ১৪শ সং, পৃঃ ২৪০
42. *Complete Works of Vivekananda Vol. III* পৃঃ ১৭৭
43. ভারতে বিবেকানন্দ, ১৩শ সং, পৃঃ ৪১৬
44. স্বামি-শিষ্য সংবাদ পূর্বকাণ্ড ১১শ সং, পৃঃ ৭৩
45 স্বামি-শিষ্য সংবাদ উত্তর কাণ্ড ১০ম সং, পৃঃ ১০৯-১১০
46. স্বামি-শিষ্য সংবাদ পূর্বকাণ্ড ১১শ সং, পৃঃ ৭২-৭৩
47 *Complete Works of Vivekananda Vol. III* পৃঃ ২৫৬
48. পত্রাবলী প্রথম ভাগ ৮ম সং, পৃঃ ১১০-১১১
49. ঐ পৃঃ ১১২-১১৩
50. *Complete Works of Vivekananda Vol. III, P. 290.*

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও 'ডন সোসাইটি'

51. The Dawn Feb. 1898, P. 353-356 দ্রঃ
52 ডন্ ম্যাগাজিন জুলাই, ১৯০৫—ডন সোসাইটির কাজকর্মের বিবরণ দ্রঃ।
53. বিনয় সরকারের বৈঠকে ১ম সং, কলিকাতা, ১৯৪২, পৃঃ ২৫২-২৬৩।
53a. ডন প্রত্রিকায় প্রকাশিত ভারত-বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ ঃ—

i) The Hindu Women as a warrior and as a ruler : Researches into Antient History—*By Thakur Kahan Chandraji Varma, Lahore (June, 1901)*

ii) Methods of training of youths in Antient India—*By Prof.*

Pramathanath Tarkabhusan (July, Aug, Nov -Dec 1901 ; Feb-April, 1902)

iii) Aryan Migration into Bengal—*By Ramaprasad Chanda (March, 1904)*

iv) Sanskrit Learning in India—*By Mahamahopadhyaya Haraprasad Sastri (May, 1904)*

v) Educational Institutions in Antient India. (*Sept-Oct, 1906*)

vi) A Hindu widow as ruler and administrator—*By Rabindra Narayan Ghosh (Feb-March, 1908)*

vii) The Part played by Indian Ascetics and Men of religion in Indian Politics : A short Historical Review—*By Rabindra Narayana Ghosh* (April, 1908)

viii) Seven Centuries of Free India (300 B.C—400 A.D.) mainly adapted from lecture by Prof. C.F. Andrews of the Delhi College (Oct, 1908)

ix) India as the heart of the Old World—*By Radha Kumud Mukherjee (* March, April, 1909)

x) Maritine Activity and Enterprise in Antient India : Intercourse and trade by Sea with China—*By Haran Chandra Chakladar* (May-Aug. 1910 ; Feb-May, Aug-Sept, 1911 ; Feb, March, 1912—68 Pages)

xi) Social Movement Among the Lower Hindu Castes and the Aboriginal Tribes (Jan, Feb, 1906)

54. The Dawn February, 1898 (Haridas & Uma Mukherjee—*Origins of the National Education Movemen*—P. 6-7 দ্রঃ)

55. The Dawn Magazine, July 1912, Part III P. 77-78.

রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম

56. প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪৫

57. প্রবাসী, আশ্বিন ১৩৪৫ পৃঃ ৮৫৫-৮৫৬

58. অজিত কুমার চক্রবর্তী—ব্রহ্মবিদ্যালয়, ৭ই পৌষ, ১৩৫৮
পৃঃ ১০, ১১, ১২, ১৪, ১৫

59. সত্যরঞ্জন বসু—ত্রিপুরায় রবীন্দ্র সংস্কৃতি, পৃঃ ২৯

60. Arthur Mayhew—*The Education of India (Second Edition)* P. 214.

61. ঐ পৃঃ ২১৯

জাতীয় শিক্ষা পর্ষৎ

62. Sir Gooroodas Centenary Commemoration Vol. (Calcutta University) P. 91.

63. যোগেশ চন্দ্র বাগল—মুক্তির সন্ধানে ভারত পৃঃ ২১১ দ্রঃ

64. Haridas and Uma Mukherjee—*Origins of the National Education Movement—Jadavpur University* P.36-37.

64. a. কার্লাইল পরওয়ানা থেকে ওয়েজ ও মিন্‌স্‌ কমিটির গঠন পর্যন্ত জাতীয়-শিক্ষা আন্দোলনের ইতিবৃত্ত—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত 'ভাণ্ডার' পত্রিকা (অগ্রহায়ণ ১৩১২, ১ম ভাগ, ৮ম সংখ্যা) থেকে নেওয়া হয়েছে।

65. ওয়েজ ও মিন্‌স্‌ কমিটির রিপোর্ট এবং জাতীয় শিক্ষাপর্ষদের ৯২ জন নামের জন্য এন, সি, ই (N. C. E) ক্যালেণ্ডার ১৯০৬-১৯০৮ অ্যাপেনডিক্স 'এ', পৃঃ ১৭-২৪ দ্রঃ

66. Sir Gooroodas Centenary Commemoration Vol. (Calcutta University) P. 93.

67. ঐ পৃঃ ১০০—১০১

68. N. C. E's Calender For 1906-1908, P. 165-183.

আশুতোষ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

69. N. K. Sinha—Asutosh Mookerjee P. 48

70. ঐ পৃঃ ৪৯

71. দীনেশ চন্দ্র সেন—আশুতোষ স্মৃতিকথা

72. N. K. Sinha—Asutosh Mookerjee P. 149-150.

বাঙালী মুসলমানদের শিক্ষাচিন্তা

73. N. K. Sinha—*History of Bengal* (1757-1905) P. 460.

74. Kazi Abdul Wadud—*The Musalmans of Bengal. Studies in Bengal Renaissance N. C. E Jadavpur* P. 474 দ্রঃ

75. *Report by the Bengal Provincial Committee with evidence taken before the Committee.*
Appendix Volume to Indian Education Commission. (History of Bengal (1757-1905) N. K. Sinha P.462 দ্রঃ।

76. Abdul Latif Khan—*A short account of my humble efforts to Promote education, specially among Mahamedans, Calcutta,* 1885, P. 52

[বাঙালী মুসলমানের শিক্ষান্দোলন ও বাংলা-সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধ—কাজী আব্দুল মান্নান, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ১৮৬৮ শ্রাবণ-আশ্বিন পৃঃ ২৫ দ্রঃ]

77. Abdul Latif Khan—*A short account of my humble efforts etc.* P. 54.-56.
[বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ১৩৬৮ শ্রাবণ-আশ্বিন সন্ম উল্লিখিত প্রবন্ধ পৃঃ ২৬ দ্রঃ]

ইংরেজী শিক্ষার প্রসার (কলেজ পর্যায়)

78. রাজনারায়ণ বসু—হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিবৃত্ত [অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত] পৃঃ ৫

79. Hundred years of Calcutta University—P. 104.

80. ঐ পৃঃ ১২৮–১৩৯

81. K. Zachariah—*History of Hoogly College* P. 97

82. N. K. Sinha—*History of Bengal* P. 450

সংস্কৃত চর্চা

83. ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১-৩
84. ঐ পৃঃ ৫১-৫২
85. ঐ পৃঃ ৮৩
86. গোপিকা মোহন ভট্টাচার্য—কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪১
87. ঐ পৃঃ ৬৮
88. ঐ পৃঃ ৯৭

আইন চর্চা

89. Hundred years of Calcutta University—P. 222.
90/91. ঐ পৃঃ ৪৩৮-৪৩৭
92. N. K. Sinha—*History of Bengal*—P. 462.
93. Hundred years of Calcutta University—P. 222.

চিকিৎসাশাস্ত্র চর্চা

94. Hundred years of Calcutta University—P. 36.
95. ঐ পৃঃ ৩৭-৩৮
96. যোগেশ চন্দ্র বাগল—স্ত্রী শিক্ষার কথা পৃঃ ৩৮-৪১

বিজ্ঞান চর্চা

97. Presidency College Register compiled by Suresh Chandra Mazumdar and Gokul Nath Dhar. Cal. 1927, P. 8
98. Hundred years of Calcutta University—P. 95-96.
99. The Indian Association for the Cultivation of Science Calcutta, 1876-1948 P. 1.

99a. রমেশচন্দ্র মজুমদার—বাংলা দেশের ইতিহাস (তৃতীয় খণ্ড)

100. P. C. Roy—*Life and Experiences of a Bengali Chemist* Vol. I P. 152.

101. Indian Association for the Cultivation of Science, Calcutta—1876-1948, P-2.

101. a. ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেসন অব সায়েন্স সম্পর্কে তথ্যাদি উক্ত অ্যাসোসিয়েশন প্রকাশিত রিপোর্ট (১৮৭৬-১৯৪৮) থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

102. নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত (৫ম সং, পৃঃ ৪০৭)

103. নকুড় বিশ্বাস—অক্ষয় চরিত ; পৃঃ ৩২

104. বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য—বঙ্গ সাহিত্যে বিজ্ঞান, পৃঃ ৮১

105. চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদ্যাসাগর পৃঃ ১৬৯

সামগ্রিক শিক্ষাচিন্তার প্রতিনিধি রবীন্দ্রনাথ

106. রবীন্দ্রনাথ—'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধ—সাধনা পত্রিকা ১২৯৯, পৌষ।

107. রবীন্দ্রনাথ—'তপোবন' প্রবন্ধ—শিক্ষা ১৩৫৭ সং পৃঃ ১২৯।

108. প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়—'বুনিয়াদি শিক্ষাও শিক্ষাসত্র' প্রবন্ধ 'শিক্ষাব্রতী' পত্রিকা, বৈশাখ-জৈষ্ঠ, ১৩৬১ পৃঃ ৫০

109. বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—রবীন্দ্রকথা পৃঃ ৪৫

110. রবীন্দ্র রচনাবলী—বিশ্বভারতী সং, পৃঃ ৪/৩৭৯

111. ঐ—পৃঃ ৪/২৮৭

112. রবীন্দ্রনাথ—'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ'—শিক্ষা পৃঃ ২০-২৫

113. D. P. Mukherjee—*Diversities P. 229*

114. রবীন্দ্রনাথ—'রাশিয়ার চিঠি'—১৩৩৮ সং, পৃঃ ৩

115. ঐ পৃঃ ৬৪

গ্রন্থপঞ্জী

অজিত চক্রবর্তী—ব্রহ্মবিদ্যালয়, রাজা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।

অরবিন্দ পোদ্দার—বংকিম মানস।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—জাতীয় সাহিত্য।

উদ্বোধন প্রকাশিত—স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা।

গোপিকামোহন ভট্টাচার্য—কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস—২য় খণ্ড

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বিদ্যাসাগর। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১লা আশ্বিন, ১৭৬৫ শক

দীনেশচন্দ্র সেন—আশুতোষ স্মৃতিকথা।

দেবীপদ ভট্টাচার্য—রেভাঃ লালবিহারী দে ও চন্দ্রমুখীর উপাখ্যান; বাংলা চরিত সাহিত্য।

উক্ত গ্রন্থকার সম্পাদিত—হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সী কলেজের ইতিবৃত্ত—রাজনারায়ন বসু।

নকুড় বিশ্বাস—অক্ষয়চরিত।

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত।

প্রমদারঞ্জন ঘোষ—শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম।

প্রমথনাথ বিশী—রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন, উক্ত গ্রন্থকার সম্পাদিত ভূদেব রচনা সম্ভার।

প্রিয়নাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী বংকিমচন্দ্র—ধর্মতত্ত্ব প্রথমভাগ। অনুশীলন। উক্ত গ্রন্থকার সম্পাদিত বঙ্গদর্শন পত্রিকা, বৈশাখ ১২৭৩, অগ্রহায়ণ ১২৮৫।

বাংলা একাডেমি পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন—১৩৬৮ বিনয় ঘোষ—(১) বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ ৩ খণ্ড, (২) বিদ্রোহী ডিরোজিও, (৩) সাময়িক পত্রে বাঙলার সমাজ চিত্র

স্বামী বিবেকানন্দ—রাজযোগ, জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ

ব্রজেন্দ্র বন্দোপাধ্যায়—(১) সংবাদপত্রে সেকালের কথা, (২) কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস। উক্ত গ্রন্থকার সম্পাদিত সাহিত্য সাধক চরিতমালা, সকল খণ্ড

ভবতোষ দত্ত—চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র

মুকুন্দ মুখোপাধ্যায়—ভূদেব চরিত

যোগেশচন্দ্র বাগল—'বাংলার জনশিক্ষা' 'বাংলার নব্য সংস্কৃতি,' 'বিদ্যাসাগর পরিচয়' 'স্ত্রীশিক্ষার কথা' 'মুক্তির সন্ধানে ভারত।'

রবীন্দ্রনাথ—'শিক্ষা', আশ্রমের রূপ ও বিকাশ', 'ভারত পথিক রামমোহন রায়,' 'চারিত্র পূজা।' রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'ভাণ্ডার' পত্রিকা, অগ্রহায়ণ ১৩৮২

রমেশ চন্দ্র মজুমদার—বাংলাদেশের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড

রাজনারায়ণ বসু—আত্মচরিত

রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্ত বাগীশ সম্পাদিত রাজা রামমোহন রায় প্রণীত গ্রন্থাবলী

রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ প্রকাশিত বিবেকানন্দ স্মারক গ্রন্থ

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রবাসী' শ্রাবণ, ১৩৫৭

শিবনাথ শাস্ত্রী—(১) আত্মচরিত, (২) রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ

শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন—বিদ্যাসাগর জীবনচরিত ও ভ্রমনিরাশ

সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবন

সত্যরঞ্জন বসু—ত্রিপুরায় রবীন্দ্রস্মৃতি

সন্তোষ প্রতিহার—স্যার আশুতোষ ও জাতীয় সাহিত্য, বাংলার জাগৃতি ও বিবেকানন্দ

সুধীরঞ্জন দাস—আমাদের শান্তিনিকেতন

সুনীলচন্দ্র সরকার—রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন ও সাধনা

Adam's Report—1835, 1837.

A. N. Basu- (1) Indian Education in Parliamentary papers.
(2) Education in modern India.
(3) Reports on the state of Education in Bengal 1835 and 1838.

Anderson and Whitehead—Christian Education in India

Arthur ray hew—The Education of India

Bethune school and college centenary volume

Calcutta University Commission Report vol. I

Cully—English Education and origins of Indian nationalism

D.P. Mukherjee—Diversities

Gautam Chattopadhyayo—Awakening in Bengal in early nineteenth century

Gooroodas Banerjee Century volume (Calcutta University)

(Profs) Haridas and Uma Mukherjee—(1) A phase of the Swadeshi Movement (National Education 1905-1910)

(2) Origins of the National Educational Movement (Jadavpur University)

Hundred years of the University of Calcutta (Calcutta University)

(Report of) Indian Association for the Cultivation of Science from 1876-1948

(Report of) Indian Education Commission.

Jogesh chandra Bagal—Women's education in Eastern India

J. M. Sen—History of Elementary Education in India

K. Zacharia—History of the Hooghly college

National council of Education Calendar (1906-1908)

N. Law—Promotion of learning in India by early European settlers

N. K. Sinha—(1) History of Bengal (1757-1905)

(2) Ashutosh Mukherjee

Nemai Sadhan Bose—The Indian awakening and Bengal

Narulla and Naik—History of education in India

P. C. Mitra—(1) Life of Colesworthy Grant

(2) A biographical sketch of David Hare

Prafulla chandra Ray—Life and experiences of a Bengali chemist

Proceedings and transactions of the Bethune Society (Nov 1859-April 1869)

Rev. Long—Vernacular Education for Bengal

(Calcutta Review No. XLIII, vol. XXII)
Sotish Ch. Mukherjee (edited by)—The Dawn. Feb, Sept. 1898, April, May, June, 1902.
S.P. Mukherjee—Representative Indians
Studies in Bengal Renaissance (edited by Atul gupta)
Suresh Majumdar and Gokul Dhar—Presidency college Register
Sunil Ch. Sarkar—The educational philosophy of Tagore
S.N. Banerjee—A nation in making
S.N. Mukherjee—History of education in India (3rd edition)
Swami Vivekananda—Complete Works vol. 3